সায়ন্তনী পূততুন্ড

তিন রঙের তিন

boierpathshala.blogspot.com

তিন রঙের তিন

boierpathshala.blogspot.com

তিন রঙের তিন

সায়ন্তনী পূততুন্ড

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড

boierpathshala.blogspot.com

TIN RONGER TIN

By : Sayantani Putatunda

(Collection of three Novel)

Code : 72 T 26

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.

21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009

© লেখক

ISBN. 978-81-944603-8-1

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই
বইয়ের কোনো অংশের কোনো ধরনের প্রতিলিপি
অথবা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত
অমান্য করা হলে উপযুক্ত আইনি
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৪২৬, জানুয়ারি ২০২০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার ও রূপা মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার
কর্তৃক এ. টি. দেব প্রেস
থেকে মুদ্রিত।

boierpathshala.blogspot.com

প্রচ্ছদ : রুদ্রনীল ঘোষ

boierpathshala.blogspot.com

উৎসর্গ

আমার অত্যন্ত প্রাণের মানুষ পরলোকগতা

মৈত্রেয়ীদির

চরণ কমলে।

boierpathshala.blogspot.com

সূচিপত্র

আরও দাও প্রাণ

ছদ্মবেশী ফুল

জীবন্ত প্রস্তর

boierpathshala.blogspot.com

আরও দাও প্রাণ

জলের সাথে আমার ছায়া বলছে আমার কথা
জল বোঝে না কোনটা কথা, কোনটা প্রগলভতা!
ছপছপিয়ে আতুর বিরাম আসল এখন কাছে,
ছলছলিয়ে ভাসিয়ে নিল খাতার শেষের পাতা।
জল জানে না কোনটা কথা, কোনটা প্রগলভতা!

বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বন্ধ কাচের জানলার ও প্রান্তে ঝাপসা প্রেক্ষাপট। বর্ষাস্নাত প্রকৃতি আস্তে আস্তে যুবতি হচ্ছে। জলের স্বচ্ছ ফোঁটা পাতায় পাতায় দ্যুতি ছড়িয়ে হাসছিল। প্রচণ্ড গরমের ক্লান্তিকর ঘামের দাগ নিশ্চিহ্ন করতেই এই ধারাস্নানের উদ্যোগ! যেন সারাদিনের কাজকর্ম সেরে গৃহিণী সান্ধ্যস্নান করছেন। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে ঝরে জলবিন্দু।

গহন ক্লান্ত দৃষ্টিতে বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়েছিলেন। বৃষ্টি নয়। দ্রষ্টব্য বিষয় নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি। কাচের জানলায় তাঁর নিজের মুখেরই প্রতিবিম্ব পড়ছিল। সেই প্রতিবিম্বের ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল সরলরেখা টেনে টেনে চলে যাচ্ছে। তিনি আপনমনেই গুনছিলেন, কটা সরলরেখা দাগ ফেলে গেল তাঁর মুখে!

তার মধ্যেই কানের কাছে কে যেন উচ্ছ্বাসিত হয়ে কবিতার কয়েকটা লাইন আউড়ে গেল। সে বেচারারও দোষ নেই। ছোকরা উঠতি কবি। বেশ কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিনে তার লেখা বেরিয়েছে। একেই অত্যুৎসাহী তরুণ কবি, তার ওপরে এমন সুন্দর বর্ষণমুখর পরিবেশ। সবমিলিয়ে রোমান্টিসিজমের চূড়ান্ত। ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি। উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে গেল কবিতার কয়েকটা লাইন—'জলের সঙ্গে আমার ছায়া বলছে আমার কথা। জল বোঝে না কোনটা কথা কোনটা প্রগলভতা...!'

পনেরো...ষোলো...সতেরো...আঠারো...। গহন তখনও একমনে জলের সরলরেখার সংখ্যা গুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই অঙ্কের মধ্যে দ্রাম করে আছড়ে পড়ল কাব্য! কবিতার গুঁতোয় খেই হারিয়ে ফেলেন তিনি। গভীর চোখদুটো জানালার দিক থেকে ফিরল আবৃত্তিকারের দিকে। অবিমিশ্র বিরক্তি ভেসে উঠছে চোখদুটোয়।

আবৃত্তিকার সেই চাউনি দেখেই থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেল। গহন মুখে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর চোখদুটো আদ্যন্ত ভাষাময়! সেই চোখই যেন বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—'চুপ করো।'

উঠতি কবি কাব্যে ক্ষান্ত দিল। তার পিছনে একটা ছোটোখাটো ভিড়ও বসেছিল। সদ্য গোঁফ-দাড়ি গজানো কবি, কিংবা পোড় খাওয়া, জুতোর শুকতলা খইয়ে ফেলা কবি, অথবা লিটল ম্যাগাজিনে দুর্বোধ্য প্রেমের দুর্বোধ্যতর কবিতা লেখা কবি—সব নমুনাই পাওয়া যাবে সেই ভিড়ে। সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে ওরা এসে আড্ডা জমায় গহনের বাড়িতে। গহন ওদের আসতে বলেন না। তবু ওরা আসে। ওদের সবাইকে চেনেনও না। কিন্তু ওরা সবাই তাঁকে চেনে। নিজেদের চেনাতেও চায়। এককথায় ওরা 'ভক্তবৃন্দ'।

boierpathshala.blogspot.com

অথচ গহনের কাছে ওরা 'ভিড়'। যখন দল বেঁধে আসে তখন মনে হয় 'কী জ্বালাতন!' যখন কলকণ্ঠে তাঁর কবিতার প্রশংসা করে আর ক্ষণজন্মা কলমটা এখন থেমে গেছে বলে আক্ষেপে মাথা নাড়ায়, কেন লিখছেন না সে বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করে, তখন ভাবেন—কতক্ষণে 'যাবে!' আর যখন বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করে সদলবলে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নেয় তখনই তাঁর আত্মা কানে কানে বলে ওঠে 'বাঁচা গেল।'

তবে এই সবকটা বাক্যই থাকে মনের ভেতরে। মনের গণ্ডি পেরিয়ে কখনও মুখে আসে না। ভক্তবৃন্দরা ভিড় জমিয়ে প্রশংসাবাক্যে ভরিয়ে দিতে শুরু করলেও তাঁর মুখ নির্লিপ্তই থাকে। যেন ওরা গহনের কথা নয়, কোনো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের কথা বলছে! আস্তে আস্তে সেই প্রশংসা যখন 'অতিশয়োক্তির' রাস্তা ধরে 'স্তুতি' হয়ে 'চাটুকারিতায়' পৌঁছায় তখনও গহন মুখে কিছু বলেন না। বরং নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে মাথার ওপরে ঘুরন্ত পাখাটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। যেন এ যাবৎ যত নারীদের নিয়ে তুমুল প্রেমের কবিতা লিখেছেন—সেই নিশিগন্ধা, শ্রেয়সী, প্রিয়ম্বদাদের কেউ মাথার চুল ধরে ফ্যানের ব্লেডের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে! অনুরাগীরাও অগত্যা সেই ফ্যানের দিকেই তাকিয়ে থাকে। তাদের অনুমান যখন এই 'প্রাজ্ঞ', 'আদ্যোপান্ত ইনটেলেকচুয়াল' বিখ্যাত কবিটি মাথার ওপরের তিন ব্লেডওয়ালা পাখাটার প্রতি এত মনোযোগ দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই ওটার মধ্যেও কোনো বিশেষ কাব্যিক অনুপ্রেরণা আছে। বলা যায় না—কোনোদিন হয়তো আবার তাঁর থেমে যাওয়া কলম থেকে বেরিয়ে আসবে যুগান্তকারী কোনো কবিতা, যার নাম 'প্রাত্যহিক পাখার গুজরান!'

মোদ্দা কথা হল, কাব্যিক রূপকের বাইরের বাস্তব ঘটনা—যাকে ফ্যাক্ট বলে, সেটাই কেউ বুঝে উঠতে পারে না। কবি গহন দত্তগুপ্ত যে ওদের তাড়াতে পারলে বাঁচেন এই সত্যিটা কাব্যময় কল্পনায় ধরা পড়ে না। অগত্যা প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ কবি ও তাঁর ভক্ত—উভয়পক্ষই ফ্যানের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে থাকে। অবশেষে একসময় তারা নিজেরাই অস্বস্তি বোধ করে। কবির ভাবতন্ময়তাকে ভেঙে দেওয়া উচিত নয়—একথা বিবেচনা করে সদলবলে গাত্রোত্থান করে। গহন শান্তভাবে ওদের বিদায়পর্ব দেখেন, এবং বলাই বাহুল্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

এই গোটা ঘটনায় কিন্তু কবির নিজস্ব সংলাপ বিশেষ থাকে না। এমনিতেই তিনি অন্তর্মুখীন মানুষ! 'হ্যাঁ', 'হুঁ', 'না', 'উহুঁ'র বেশি কিছু বলতে চান না। যা বলার তা তাঁর অনুরাগীরাই বলেন।

কিন্তু আজ নিয়মের ব্যতিক্রম হল। তাঁর প্রতিচ্ছবির ওপরে জলের সরলরেখার সংখ্যা গোনায় ব্যাঘাত ঘটায়, আক্ষরিক অর্থেই রেগে গেলেন গহন। তাঁর চোখে বিরক্তির পাশাপাশি এবার রাগও ফুটে উঠেছে। যে বেচারা উচ্ছ্বাসিত হয়ে কবিতাটা আবৃত্তি করছিল, সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ল তার ওপরেই।

শান্ত অথচ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন—'কে লিখেছে এ কবিতাটা? তুমি?'

আবৃত্তিকার ঢোঁক গেলে। আশপাশের ভিড়টাও স্তম্ভিত হয়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করছে। কী বলবে যেন ভেবে পাচ্ছে না।

গহন অবশ্য বলার অপেক্ষাও করেননি। সংযত অথচ উষ্মামিশ্রিত গলায় বলেন—'অর্থহীন যত প্রলাপ। কেন যে এসব লেখো!'

কথাগুলো ঠিক কাব্যিক শোনাল না! ভিড়টা সচকিত হয়ে ওঠে। এতক্ষণের ভাবজগৎ থেকে একধাক্কায় তাদের বাস্তবে ফিরিয়ে এনেছেন কবি স্বয়ং। এবার বুঝতে অসুবিধা হল

boierpathshala.blogspot.com

না যে গহন বিরক্ত হয়েছেন।

—'কবিতা ছাড়া তোমাদের কি আর কোনো বক্তব্য নেই?' অশান্ত কণ্ঠস্বরে চাপা রাগ ঝরে পড়ল। বোধহয় সেই রূঢ়তার আঁচ তিনি স্বয়ংই উপলব্ধি করেন। আস্তে আস্তে পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। মানুষের কাছে কবি গহন দত্তগুপ্ত 'জেন্টলম্যান'। বহুদিনের ইমেজটাকে একদিনেই ভেঙে ফেলার ইচ্ছে নেই।

তিনি এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বললেন—'আমি দুঃখিত, কিছু মনে কোরো না। আজ আমায় একটু বেরোতে হবে। ইফ ইউ প্লিজ অ্যালাউ মি...।'

—'নিশ্চয়ই...দাদা...নিশ্চয়ই...।'

মুহূর্তের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কাচের জানালার দিকে দৃকপাতও না করে উঠে গেলেন বেডরুমের দিকে। এই মুহূর্তেই বিরক্তিটা ঝেড়ে ফেলা দরকার। নয়তো সারাদিন আপনমনেই খুঁতখুঁত করে বেড়াবেন। যাকে-তাকে খিঁচিয়ে উঠবেন। সেটা কাম্য নয়।

বেডরুমে তখন গহনের সহধর্মিণী স্মৃতিকণা বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখছিলেন। এই মহিলা অতীতে রীতিমতো সুন্দরী ছিলেন। এখন সেই সৌন্দর্যের সিংহভাগই কেড়ে নিয়েছে দুরারোগ্য ক্যানসার! গত দু-বছর ধরেই রোগটার সঙ্গে লড়তে লড়তে একে একে বিসর্জন দিয়েছেন যাবতীয় সৌন্দর্য। শুধু কাঠামোটাই বাকি আছে।

নারীর সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য তার মাথার ঘন চুল। কেমোথেরাপির সৌজন্যে এখন তা-ও নেই। তবু কণার মুখখানা ভারী মায়াবী! যৌবন, সৌন্দর্য, সুস্থতা—সব গেছে। কিন্তু অন্তরের মায়া, মমতা, স্নেহ কেড়ে নিতে পারেনি দুর্দান্ত রোগটা। সেই মায়াবী চোখদুটোই বৃষ্টির দৃশ্যপট থেকে সরে গিয়ে ন্যস্ত হল স্বামীর ওপর। তাঁর প্রেমিক পুরুষ! চিরকালই বড়ো মুখচোরা, লাজুক প্রকৃতির। এখনও এমন লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে বেডরুমে ঢুকছেন, যেন সদ্যপরিণীতা স্ত্রীর কাছে সবাইকে লুকিয়ে-চুরিয়ে আসছেন। কেউ দেখে ফেললেই কেলেঙ্কারির একশেষ!

কণা গহনের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হেসে বলতে শুরু করলেন, 'জলের সাথে আমার ছায়া, বলছে আমার কথা/জল বোঝে না কোনটা কথা, কোনটা প্রগলভতা...।'

গহন এগিয়ে এসে বিছানার ওপর বসতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই থমকে গেছেন। স্ত্রী আরও কিছু বলার আগেই অ্যাবাউট টার্ন মেরে বাইরের দিকে পা বাড়ালেন।

কণা এমন পরিস্থিতির জন্য আগেভাগেই প্রস্তুত ছিলেন। শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে খপ করে চেপে ধরেন স্বামীর হাত—'পালাচ্ছ কোথায়?'

রাগতস্বরে উত্তর এল—'যেখানে প্যানপ্যানে বৃষ্টি আর এই অপদার্থ কবির অপদার্থতর কবিতাটা নেই।'

কণা মনে মনে হাসছেন। যদিও মুখে নিপাট গাম্ভীর্য—'কবি অপদার্থ— এইটুকু তথ্যেই খুশি? বাকি তথ্যগুলো জেনে যাবে না?'

গহন ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাসা ভাসা চোখজোড়া স্ত্রীর চোখের ওপরে রেখেছেন। তাঁর দৃষ্টি সপ্রশ্ন।

—'কবিতার নাম 'জলসই'। কাব্যগ্রন্থের নাম 'শিশিরের শব্দ'। প্রকাশিত হয়েছে ২ জুন ২০০৬-এ। প্রায় হট কেকের মতোই বিক্রি হয়েছে। এখনও মাঝেমধ্যে বেস্ট সেলারের

boierpathshala.blogspot.com

লিস্টে দেখতে পাই। লিখেছিলেন এক সুদর্শন রোমান্টিক কবি। ঘটনাচক্রে তাঁর নামও গহন দত্তগুপ্ত। এবং আরও কাকতালীয় ব্যাপার যে তিনিও আমারই স্বামী।' কণা ফিক করে হেসে ফেলেছেন— 'আবৃত্তিকার বেচারা খামোকাই ধমক খেল।'

গহন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর অনুতপ্তভঙ্গিতে স্ত্রীর হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিলেন।

—'আই অ্যাডমিট কণা।' বিছানায় বসে পড়ে বললেন তিনি—'অন্যায় হয়েছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল, এই জাতীয় অর্থহীন, অপদার্থ, কবিতা একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউই লিখতে পারে না।'

কণা বড়ো সস্নেহে সগর্বে তাকান স্বামীর দিকে। গহন সদ্য সদ্যই সাতচল্লিশ পেরিয়েছেন। কিন্তু এখনও মানুষটাকে চল্লিশ বলে অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়। গায়ের রং এতটাই কালো যে বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিলেন 'গহন'। কালো হলেও মুখখানা ভারী লাবণ্যময়। সবচেয়ে সুন্দর তাঁর চোখদুটো।

দৃষ্টির গভীরতাতেও 'গহন' সার্থকনামা।

তাঁদের কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। গোড়ার দিকে তা নিয়ে আপসোস থাকলেও এখন আর দুঃখ করেন না কণা। স্বামী আর সন্তান এই দুই সত্তাই একসঙ্গে গহনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। তাই যখন স্বামীর দিকে তাকান তখন সেই চাউনিতে স্ত্রীর প্রেম আর মায়ের বাৎসল্য—দুই-ই মিশে যায়।

বেডরুমের খোলা জানালা দিয়ে উত্তাল হাওয়ার ঝাপটায় বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছিল কণার চোখে। বিন্দু বিন্দু জল মহা আহ্লাদে গড়াগড়ি দিচ্ছে তাঁর কপালে, গলায়, গালে। তিনি বৃষ্টির খামখেয়ালিপনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন। তাঁর ভালোই লাগছিল। কিন্তু গহনের ভালো লাগল না। তিনি সপাটে জানলা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কণা ব্যথিত হলেন—'এ কী! জানলা বন্ধ করলে যে!' সশব্দে জানালা বন্ধ করতে করতে বললেন গহন—'আই হেট রেন...আই জাস্ট হেট ইট...।'

'সে কী! কবির বৃষ্টি পছন্দ নয়!' তিনি বিস্মিত—'বরং কবিরাই তো বৃষ্টি বেশি পছন্দ করেন। কবিগুরুও করতেন...।'

—'কবিগুরু পছন্দ করতেন বলে আমাকেও করতে হবে?' গহনের কণ্ঠস্বর এখনও মোলায়েম। এটাই তাঁর টোন। এর বেশি রূঢ় বা উঁচুস্বরে তিনি কথা বলেন না। কিন্তু তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে প্রবল বিরক্তি—'কবিগুরু তো একহাত লম্বা দাড়িও রাখতেন, জোববাও পরতেন। তাই বলে কি আমিও ওইরকম দাড়ি রেখে জোববাধারী হয়ে বসে থাকব? তা ছাড়া গুরুপত্নীর সর্দি-কাশি-জ্বর হলে তিনি দাদুরি, ময়ূর, ঝিল্লিকে ছেড়ে—প্যারাসিটামল, থার্মোমিটার, আর ভিক্স ভেপোরাব নিয়ে চর্চা করতেন কিনা জানা নেই। কিন্তু আমাকে করতে হয়।'

—'হুঁ', কণা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'ভুলেই গিয়েছিলাম যে আধখানা ফুসফুস নিয়ে বেঁচে আছি।'

গহন তাঁর দিকে তাকিয়েছেন। এবার তাঁর দৃষ্টিতেও অপরিসীম বেদনা— 'আমি কি তাই বলেছি?'

—'না তুমি বলোনি!' তিনি ম্লান হাসলেন—'আ ফ্যাক্ট, কান্ট বি ডিনায়েড। আমার থিম সং হওয়া উচিত 'সমুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণী'...।'

boierpathshala.blogspot.com

—'চোপ!' কবির চোখে-মুখে রাগ ফুটে উঠেছে—তুমি ক্যানসার পেশেন্ট নও। ক্যানসার কিয়োরড। এ নিয়ে আর-একটাও বাজে কথা বলবে না। যতসব ডেইলি সোপের নায়িকা মার্কা ডায়লগ।'

'হুম।' কণা গহনকে আরও রাগিয়ে দিতে চাইছিলেন। রেগে গেলে কবিবরকে ভারী চমৎকার লাগে। তিনিও মজা পান।

—'দিস ইজ নট দ্য হোল ট্রুথ।' গোবেচারার মতো স্বরে বললেন—'আমার রোগের ঠ্যালায়—তোমার নিশিগন্ধা, শ্রেয়সীরা সবাই পালিয়ে গেছে। দিনরাত বউয়ের সেবা করছ। তাই সরস্বতী অবহেলিত।'

—'ডোন্ট বি সিলি।' তিনি সত্যিই রেগে গেছেন—'কে বলেছে তোমার জন্য আমি লেখা ছেড়েছি? আমার লাস্ট বই—২০০৬-এ প্রকাশিত। তারপর থেকে আর-একটি কবিতাও লিখিনি। তোমার রোগ ধরা পড়েছে ২০০৯-এ। আমার লেখা ছেড়ে দেওয়ার তিন বছর পর! একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে যে, তোমার অসুস্থতার সঙ্গে আমার লেখা ছাড়ার কোনো সম্পর্ক নেই।'

—'তাহলে কীসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে? কোনো উদ্ভিন্নযৌবনার সঙ্গে পরকীয়ায় ব্যর্থ হয়েছ?'

রাগতে গিয়েও এবার ফিক করে হেসে ফেলেছেন গহন। হাসতে হাসতেই বললেন —'ইউ আর সিম্পলি ইম্পসিবল কণা। গান শুনবে? বলো কী চালাব?'

—'শীলা কি জওয়ানি! আছে?'

প্রখ্যাত কবি তির্যক দৃষ্টিতে সহধর্মিণীর দিকে তাকিয়েছেন।

কণা নির্লিপ্ত মুখে জানালেন—'তোমার কথামতো আমি ক্যানসার কিয়োরড। তাই এখন ডেইলি সোপের নায়িকার মতো ডায়লগ দেওয়া অ্যালাউড নয়। অন্তত আইটেম নাম্বারের সঙ্গে নাচতে তো পারিই।'

—'না। তাও পারো না।' তিনি হাসছেন—'তাতে হাড় ভাঙার প্রবল সম্ভাবনা। বরং আমার পছন্দের গান শোনো।'

—'বেশ।'

ডি. ভি. ডি প্লেয়ারে বেজে উঠল রবীন্দ্রসংগীত। কণা চোখ বুজলেন। তাঁর প্রিয় গানটা চালিয়েছেন গহন। বর্ষার প্রগলভ মুখরতাকে ছাপিয়ে গমগম করে উঠল কবিগুরুর গান।

তিনি স্বামীর বুকে মাথা রেখেছেন। যে প্রশ্নটা দিনরাত আজকাল তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়, যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিজেকেই বারবার কাঠগড়ায় তুলেছেন, সেটাই ক্রমাগত মনের মধ্যে ফিরে আসছিল। গহনের বুকে মুখ গুঁজে প্রশ্নটা স্তিমিত কণ্ঠে করে ফেলেন কণা—

—'একটা কথা বলবে? উঁ?'

গহন অন্যমনস্কভাবে বলেন—'কী?'

—'তুমি আর কবিতা লেখো না কেন?' অদ্ভুত স্বচ্ছ চোখজোড়া তুলে অতিপ্রিয় মানুষটার দিকে তাকিয়েছেন তিনি। কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল বেদনা—'গহন, তোমার তো ক্যানসার হয়নি! তবে?'

boierpathshala.blogspot.com

গহন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আলগোছে স্ত্রীর মাথাটা বুকে চেপে ধরেছেন। এ কথার কোনো জবাব হয় না। ক্যানসারের চেয়েও যে গভীর অসুখে আক্রান্ত তিনি, সে কথা কণাকে কী করে বোঝাবেন!

তাঁর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, মিউজিক সিস্টেমে তখনও বাজছে উচ্ছ্বাসিত সুর—

—'প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে, মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ...।'

'আবার জীবন পেলে দেখাতাম কাশ ভাঙা ঢেউ
বেরং দেয়ালে চাপা পড়ে গেছে জীবনের সোঁতা
আবার কখনও যদি হয়ে আসি আমি আর কেউ
তোমায় দেখাব ফের পরিশেষে বড় হয়ে ওঠা।'

চশমার শোরুমের মালিক তন্ময় হয়ে কবিতার লাইন আওড়াচ্ছিল। তার সামনের ক্রেতাটির তখন করুণ দশা। চোখের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের আধখানা তার হাতের মুঠোয়, বাকি আধখানা লোকটার উপুড় করা তালুতে আটকে আছে। একান্ত ইচ্ছে গোটা প্রেসক্রিপশনটাই হাতিয়ে নিয়ে এখান থেকে চম্পট দেওয়ার। কিন্তু কাগজটা ছিঁড়ে যাওয়ার ভয়ে বেশি টানাটানিও করা যাচ্ছে না। অগত্যা ক্রেতাটি বাধ্য হয়েই মিউমিউ করে বলে—'দাদা...আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার চশমাটা ভীষণ দরকার। আ-র্জে-ন্ট।'

'আর্জেন্ট' শব্দটার দীর্ঘায়িত উচ্চারণও শোরুমের মালিকের ভাবান্তর ঘটায় না। বরং উলটে সে ক্রেতাটিকে এক ধমক দিয়ে বলে—'ধুর মশাই, চশমা পরে হবে, আগে কবিতা শুনুন। গহন দত্তগুপ্তের কবিতা পড়েছেন কখনও?'

—'কিন্তু আমার চশমা.....।'

—'চশমার নিকুচি করেছে।' লোকটি ভয়াবহ রেগে গিয়েছে—'কবিতা পড়েন না, শোনাতে চাইলে শোনেন না। জানেন, এই কবিতাটা কোন ছন্দে লেখা? মিশ্রকলাবৃত্ত। সবচেয়ে সুরেলা আর মিষ্টি ছন্দ। জীবনানন্দ এই ছন্দে গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা লিখে গেছেন। জানেন এসব? জানেন না। জানার ইচ্ছেও নেই। খালি তখন থেকে 'চশমা...চশমা' করে লাফাচ্ছেন। কী হবে মশাই চশমা দিয়ে, যদি কবিতাই না পড়লেন!'

কবিতার সঙ্গে চশমার যে কী সম্পর্ক, বলাই বাহুল্য ক্রেতাটির মাথায় ঢুকল না। সে অসহায় দৃষ্টিতে শোরুমের অন্যান্য কর্মচারীদের দিকে তাকায়। হয়তো করুণ সাহায্য প্রার্থনাও ছিল সে দৃষ্টিতে। কিন্তু আবেদন রাখবে কোথায়? কর্মচারীরাও তস্য অসহায়ভাবে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

ক্রেতাটির জানার কথা নয় যে, এই নাটক এখানে প্রথমবার অভিনীত হচ্ছে না। শোরুমের মালিক এখানে নিজে উপস্থিত না থাকলে সবকিছুই শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যেতে পারত। এমনকি তার চশমাটাও সঠিক পাওয়ারের লেন্সে সেজেগুজে দৃষ্টিশক্তিকে আরও সবল করে তুলত নিঃসন্দেহে। কিন্তু মালিক উপস্থিত থাকলেই বিপদ। কবি হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যে লোকটা সাধারণ চশমার দোকানি হয়েই থেকে গেল, তার বেদনা বোঝার জন্য ব্যস্ত মহানগরীতে বিশেষ কেউ নেই। আর সেটাই হয়েছে যত নষ্টের গোড়া। সুযোগ পেলেই সে চশমার বদলে কবিতা বিতরণ করতে বসে। ক্রেতারা আজকাল তাকে দেখলেই পালিয়ে যায়। কারণ এ চত্বরের সবাই জেনে ফেলেছে যে এ শোরুমে

boierpathshala.blogspot.com

চশমার অর্ডার দিতে গেলেই প্রথমে শুনতে হবে সাগ্রহ প্রশ্ন—'চশমার কথা পরে বলছি, আগে বলুন কবিতা-টবিতা পড়া হয়? কার কার কবিতা পড়েছেন?'

সদ্য আগত ক্রেতাটি এতসব জানত না। বাধ্য হয়েই সে প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে —'স্যার, চশমা লাগবে না। প্লিজ আমায় ছেড়ে দিন।'

—'বেশ, চশমা থাক।' বিক্রেতা তাকে প্রেসক্রিপশনটা ফেরত না দিয়েই বলে—'কিন্তু কবিতা না শুনিয়ে আপনাকে ছাড়ছি না।'

অগত্যা বেচারাকে নিমের পাঁচন গেলার মতো মুখ করে কবিতা শুনতে হল। শুধু কবিতাই নয়, তার পিছন পিছন এল মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত, দলবৃত্তের থিসিস। নানারকম বৃত্তের ঠ্যালায় যখন সে প্রায় চারকোনা হতে চলছে, ঠিক তখনই ঈশ্বর দয়াপরবশ হয়ে দেবদূত পাঠিয়ে দিলেন। শোরুমের কাচের দরজা ঠেলে এক দারুণ সুদর্শন পুরুষ ঢুকলেন। তাকে দেখেই কাব্যবিশারদ হইহই করে উঠেছে—'কী কাণ্ড! একশো বছর বাঁচবি দেখছি। এই মাত্রই তোর কথা হচ্ছিল।'

ক্রেতাটি একঝলক তার রক্ষাকর্তার দিকে দেখল। পরক্ষণেই তার নজর গেল প্রেসক্রিপশনটার দিকে। এতক্ষণ ওটা বিক্রেতার হাতের তলায় চাপা পড়েছিল। এখন অসতর্কভাবেই লোকটা হাত তুলে নিয়েছে। এই সুযোগ। এবং সে সম্পূর্ণ সদব্যবহার করল। ক্ষিপ্রগতিতে প্রেসক্রিপশনটা তুলে নিয়ে এমন দৌড় মারল যে-অলিম্পিকের দৌড়বীরও লজ্জা পাবে।

গহন সকৌতুকে লোকটির ড্রামাটিক টেম্পোয় প্রস্থানপর্ব দেখলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন—'এ মাসে এই নিয়ে কটাকে ভাগালি?'

—'যাঃ, পালিয়ে গেল!' কাব্যবিশারদ আমসির মতো মুখ করেছে—'এই নিয়ে সাড়ে পাঁচ'।

—'সাড়ে পাঁচ!'

—'এদের মধ্যে একটা হাফও ছিল তো! আই মিন বাচ্চা।'

গহন সবিস্ময়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছেন—'শুঁটকি, তুই আজকাল—বাচ্চাদেরও ছাড়ছিস না!'

—'বাচ্চা আবার কী!' শুঁটকির চেহারাটা সত্যিই শুঁটকি মাছের মতো। শুকিয়ে প্রায় নারকেলের দড়ি হয়ে গেছে। শিরা বের করা শীর্ণ হাত নাড়িয়ে সে বলে—'ওটা বাচ্চা নয়, চৌবাচ্চা। চোখের পাওয়ার কত জানিস? মাইনাস ফাইভ! দুনিয়ার সবকিছু জানে। ইংরেজি কবিতা গড়গড় করে বলে। রা-ওয়ানের হিরোইনের নাম থেকে শুরু করে ফেসবুক, টুইটার অবধি হেন জিনিস নেই যা জানে না।

—'তাতে কী!' তিনি আস্তে আস্তে বলেন—'আজকালকার বাচ্চারা অনেক অ্যাডভান্স। ওরা অনেক কিছুই জানে। তাতে অন্যায়টা কী হয়েছে?'

—'অন্যায় কিছু হয়নি', শুঁটকি এবার ভেটকি মাছের মতো ভাবলেশহীন মুখ করেছে —'সব জানে বলেই জানতে চেয়েছিলাম 'প্রশ্ন' কবিতাটা কার লেখা? আমার ধারণা ছিল সেটাও জানবে।'

গহনের ঠোঁটে একটা স্মিত হাসি ভেসে উঠল—'উত্তর কি পেলি?'

boierpathshala.blogspot.com

সে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে গহনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর শুকনো মুখে উত্তর দেয়—'চেতন ভগৎ।'

তিনি হো হো করে হেসে উঠেছেন। দোকানের কর্মচারীরাও মুচকি মুচকি হাসছে।

—'তুই হাসছিস!' শুঁটকি উত্তেজিত—'বাঙালির বাচ্চা হয়ে রবি ঠাকুরের নাম জানে না। এটা তোর খুব মজার জিনিস মনে হচ্ছে?'

তিনি হাসতে হাসতেই বলেন—'না, মজার কেন হবে? তারপর নিশ্চয়ই তুই রবি ঠাকুরের নাম জানাতে বসলি।'

—'হ্যাঁ বসলাম।' তার মুখে বিরক্তির ছাপ—'জানিয়েও দিতে পারতাম, যদি না ওর মা এসে ওকে টেনে নিয়ে চলে যেত।'

গহন আর-একবার উচ্চস্বরে হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শুঁটকির করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে চেপে গেলেন।

—'এরা জীবনে কখনও শঙ্খ, শক্তি, সুনীল পড়বে? কখনও জানবে যে জীবনানন্দ বলে একটা লোক নিঃসঙ্গতার তাড়নায় কী সব কবিতা লিখে গেছে!' তার কণ্ঠস্বরে হতাশার প্রাবল্য—'শুধু একটা জিনিসই জানতে পারে। যখন কলকাতায় ট্রাম আর থাকবে না, জাদুঘরে ট্রামের মডেল দেখিয়ে ইতিহাস বলা হবে, তখন এক লাইনে জীবনানন্দের সম্পর্কে একটাই তথ্য জানবে এরা। ওই নামে একটা বিশ্বট্যালা কবি ছিল। লোকটা চাপা পড়ার জন্য ট্রেন, বাস, ট্যাক্সি, মেট্রো—কিছুই খুঁজে পায়নি। অগত্যা ওই ঢিকঢিকে ট্রামের তলাতেই তাকে চাপা পড়তে হল! বাঙালির পরবর্তী প্রজন্মের এই অবস্থাই হবে গহন, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

শুঁটকির দু-চোখে অপরিসীম বিষণ্ণতা। গহন দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকেন। শুঁটকি বোধহয় খুব একটা ভুল বলেনি। বিশ্বায়নের দাপট আর ইংরেজি মিডিয়ামের দৌলতে হয়তো এমনই একটা ভয়াবহ ভবিষ্যৎ আসতে চলেছে। এখনই তরুণ প্রজন্ম বাংলা সাহিত্য এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। সাহিত্য বলতে রাউলিং, চেতন ভগৎ, বা ঝুম্পা লাহিড়ি অবধিই বোঝে। তারপর আর কিছু নেই।

—'ছাড় ওসব কথা।' শুঁটকি বলল—'যত ভাবব ততই ভয় করবে। তোর খবর বল। এবার কিছু লেখার কথা ভাবছিস?'

—'নাঃ।'

—'কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তরে কী বলবেন গহন ভেবে পেলেন না। এই প্রশ্নটা শুনতে শুনতে তিনি ক্লান্ত। কেন লিখছেন না, কবে আবার লিখবেন, আদৌ আর লিখবেন কিনা—এসব প্রশ্ন রোজই চতুর্দিক থেকে ফণা তোলে। কোনোমতে ভুজুং ভাজুং দিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান।

কিন্তু শুঁটকির সামনে সেসব যুক্তি ধোপে টিকবে না। সে তাঁর অনেকদিনের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে স্কুলে, কলেজে পড়েছেন। একসঙ্গে গাঁজা খেয়েছেন। এবং মধ্যরাত্রের কলকাতাকে নেশাজড়িত উচ্চকণ্ঠে কবিতা শোনাতে শোনাতে বাড়ি ফিরেছেন। শুঁটকি তাঁকে হয়তো তাঁর নিজের থেকেও ভালো চেনে। ওর কাছে মিথ্যে বলার উপায় নেই। তবু একটু ইতস্তত করে বললেন—'আসলে বয়েস হচ্ছে তো। এখন আর শিং ভেঙে বাছুর হয়ে গদগদ প্রেমের কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে না।'

boierpathshala.blogspot.com

শুঁটকি তাঁর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়—'তুই শালা চিরকেলে এসকেপিস্ট। সমস্যার সামনে পড়লে পিঠ দেখিয়ে পালাস। আমায় ওসব গপ্প দিস না। এমন কিছু বয়েস হয়নি তোর। এই তো সুবিমল বিশ্বাসকে দেখ। প্রায় আশি বছর হতে চলল বুড়োর। এখনও প্রেমিকার কাঁচুলিতে জমা ঘাম নিয়ে চর্চা করছে। বয়স দেখাস না আমায়। তা ছাড়া প্রেমের কবিতাই লিখতে হবে—এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? অন্য কিছু নিয়ে লেখ।'

গহন চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। শুঁটকিও তাঁর চোখের দিকে নিষ্পলকে দেখছে। একমিনিট সে চুপ করে গহনকে জরিপ করল। তারপর বলল—'অ, তুই তো আবার রোম্যান্টিক কবিতা ছাড়া লিখবি না, টিপিক্যাল এসকেপিস্ট! চল।'

—'কোথায়?'

—'পেটে দু-পাত্তর না পড়লে তোর মুখ খোলাতে পারব না। আর আমিও সহজে ছাড়ছি না।'

—'শুঁটকি....' গহন নিরুপায় ভাবেই বলেন—'আজ থাক.....।'

—'কিচ্ছু থাকবে না।' শুঁটকি প্রায় গর্জন করে উঠেছে,—'ভালোয় ভালোয় যাবি? না সবার সামনে নর্মদা থেকে নর্দমা হব।'

এই কথাটার অর্থ খুব ভালোই বোঝেন গহন। অর্থাৎ শুঁটকি এবার ভালো ভালো শব্দ ছেড়ে শ-কার, ব-কার, ম-কারের প্যাঁটরা খুলবে। ও একবার মুখ খুললে ম্যানহোলও লজ্জা পায়। তিনি ঝুঁকি নিলেন না। লক্ষ্মী ছেলের মতো শুঁটকির পিছন পিছন পা বাড়ালেন।

—'আয়।' শোরুমের বাইরে একটু দূরত্বেই শুঁটকির স্টিল কালারের জেন দাঁড়িয়ে আছে। গহনের চোখে পড়ল একটি বছর বারো-তেরোর বাচ্চা ছেলে গাড়িটার পাশেই অপেক্ষারত। ছেলেটাকে দেখলে ভিখিরি বলেই মনে হয়। পরনে একটা শতচ্ছিন্ন নোংরা শার্ট, এবং তার চেয়েও নোংরা একটা হাফপ্যান্ট। মাথার চুল রাস্তার ধুলোয় প্রায় সাদা, চোখে একগাদা পিঁচুটি নিয়ে পরম আগ্রহে তাকিয়ে আছে শুঁটকির দিকেই।

গহন বুঝতে পারলেন না যে বাচ্চাটা এত আগ্রহভরে এদিকেই দেখছে কেন। শুঁটকি বুড়ো বা অথর্ব লোক ছাড়া আর কাউকে ভিক্ষে দেয় না। বাচ্চাদের তো একেবারেই নয়। অথচ ছেলেটার দৃষ্টি স্পষ্ট জানান দিচ্ছে যে শুঁটকিকে সে চেনে। এবং তার আগ্রহ নিতান্তই অযৌক্তিক নয়।

ব্যাপারটা অবশ্য একটু পরেই স্পষ্ট হল। শুঁটকি ড্রাইভিং সিটে বসতেই সে জানলার কাছে ঘনিয়ে এসেছে। গহন কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন। ছেলেটা জানলার কাছে এসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—'বাবু, হয়ে গেছে।'

শুঁটকি তার দিকে তাকিয়েছে—'পুরোটা?'

—'হ্যাঁ।'

—'বল দেখি।'

ছেলেটা একটু যেন থমকাল। তারপরই যেন মঞ্চে উঠে আবৃত্তি করছে, এমন ভঙ্গিতে হাতজোড় করে বলল—'নমস্কার, কবিগুরু রবীন্দোনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার'—কহিলা হবু, শুনগো গবুরায়,/কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র/মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়/ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র।'

boierpathshala.blogspot.com

গহন সবিস্ময়ে দেখছিলেন তাকে। যাকে ভিখিরি ভেবেছিলেন সে রীতিমতো গড়গড়িয়ে 'জুতা আবিষ্কার' মুখস্থ বলে যাচ্ছে। কিছু অমার্জিত উচ্চারণ ছাড়া বাদবাকিটা একদম ঠিকঠাক। কোথাও কোনো ভুলচুক নেই। এমনকি যেখানে যেখানে যতির ব্যবহার প্রয়োজন, সেখানে সেখানেই থামছে। এ কী কাণ্ড!

'সেদিন হতে চলিল জুতাপরা/বাঁচিল গবু রক্ষা পেল ধরা.....।' ছেলেটা একনিশ্বাসে কবিতাটা শেষ করে ফেলল। শেষ লাইনটা বলে সে সাগ্রহে শুঁটকির দিকে তাকায়।

—'ভেরি গুড!' শুঁটকি তার মাথায় হাত রেখে আদর করে—'খুব ভালো হয়েছে। শুধু উচ্চারণটা আর-একটু ঠিক করতে হবে। রবীন্দোনাথ ঠাকুর নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বল র-বী-ন্দ্র-না-থ....।

বেশ কিছুক্ষণ উচ্চারণের তালিম চলল। গহন অবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন। একটা ভিখিরি ছেলে রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছে! গোটা ব্যাপারটাই তাঁর অবিশ্বাস্য ঠেকছিল! মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছেন।

—'ঠিক আছে', তালিম শেষ করে শুঁটকি পকেট থেকে নোট বের করে এগিয়ে দেয় ছেলেটার দিকে। গহন আড়চোখে দেখলেন—সেটা পঞ্চাশ টাকার নোট!

—'নে', সে স্মিত হেসে বলে—'এটা দিয়ে মাংস-ভাত খাবি। খবরদার, ফেভিকল, ডেনড্রাইটের চক্করে পড়বি না। যদি বুঝতে পারি যে ওসব কিনে খাচ্ছিস....।'

—'না বাবু।' ছেলেটি একশো আশি ডিগ্রি মাথা নাড়ল—'ওসব খাইনে কো।'

—'ভালো। এখন যা।' শুঁটকি গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে—'আবার কাল-পরশু নাগাদ আসিস। নতুন কবিতা দেব।' ছেলেটা মাথা নেড়ে চলে গেল। গহন স্তম্ভিত হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন। এবার মৃদু অথচ বিস্মিত স্বরে বলেন—'শুঁটকি! এসব কী হচ্ছে!'

শুঁটকি অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিয়েছে—'আমার নবতম আবিষ্কার। ছেলেটার নাম গোপাল। বাপ-মা আদর করে ওই নামই দিয়েছিল। আমার শোরুমের উলটোদিকের ফুটপাথে থাকে। আয়লা ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে বাপ-মা দুটোই ফৌত হয়ে গেছে। এখন ছেলেটা ফুটপাথে ভিক্ষা করে।'

—'সে তো বুঝলাম। কিন্তু 'জুতা আবিষ্কার'.....!'

—'ওটা আমিই ওকে শিখিয়েছি।' সে নির্লিপ্ত গলায় বলে—'ছেলেটার মেমোরিটা খুব শার্প। যাকে বলে শ্রুতিধর। বুঝলি, একবার আমার শোরুমে ভিক্ষে চাইতে ঢুকেছিল। তখন আমি এক ব্যাটাকে 'রূপসী বাংলা' আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলাম। লোকটা দু-মিনিট পরেই অবশ্য পালিয়ে বাঁচল। আর এ ছোঁড়া আমাকে একবারে চেপে ধরল। তিন দিন ধরে নাকি খায়নি। টাকা দিতেই হবে। জানিসই তো, বাচ্চাদের আমি ভিক্ষে দিই না।' শুঁটকির মুখে মুচকি হাসি—'কিন্তু হতভাগা একবারে নাছোড়বান্দা। তাই ভাগানোর জন্য বলেছিলাম, একটু আগেই বলা কবিতার একটা লাইনও যদি ঠিকঠাক বলতে পারে, তবে দশটাকা দেব।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলেন গহন।

—'তারপর আর কী?' সে হাসতে হাসতে বলে—'সবাইকে অবাক করে দিয়ে ব্যাটা একেবারে চারটে লাইন ঠিকঠাক বলে দিল। একবার শুনেই মোটামুটি মাথায় তুলে নিয়েছে। খুশি হয়ে চল্লিশ টাকা দিয়ে দিলাম। তারপর থেকেই চলেছে এই ট্রেনিং। রোজ

boierpathshala.blogspot.com

সকালে এসে একটা করে কবিতা শোনে। পরদিন মনে করে আমাকে শোনায়। কবিতা ছোটো হলে একবার শুনেই মনে রাখতে পারে। বড়ো হলে তিন-চারবার শোনাতে হয়।'

গহন গোটা বৃত্তান্ত শুনে কী বলবেন ভেবে পেলেন না। শুধু অবাক হয়ে বড়ো বড়ো চোখে শুঁটকিকে দেখছিলেন। লোকটাকে তাঁর মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য ঠেকে। একি তার খামখেয়ালিপনা, না অদ্ভুত শখ!

—'এ ছেলে ভালো ঘরে জন্মালে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হত'। শুঁটকি বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়ে —'ভাগ্যের দোষ! যাক গে। তুই তোর কথা বল। কবিতা লেখাটা ছাড়লি কেন?'

আবার সেই এক প্রসঙ্গ। ভবি ভোলবার নয়। গহন বিব্রত বোধ করেন। এই প্রশ্নটা সামনে এলেই কেমন যেন অসহায় মনে হয়। ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা টের পান। একটা ক্ষোভের মেঘ জমাট বাঁধে বুকে।

—'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' সে স্টিয়ারিঙে আলতো করে একটা চাপ মারে—'তুই সেই কেউ কেউ-এর একজন। অথচ এমন কেঁউ কেঁউ করছিস কেন বুঝতে পারছি না।'

—'কী হবে কবিতা লিখে?'

—'কবিতা লিখে কিছু হয় নাকি?' শুঁটকি জোরে হেসে উঠেছে—'হয় শুধু হয়ের অণ্ড, আই মিন—ঘোড়ার ডিম! কিছু হওয়ার জন্য তুই কবিতা লিখিস বুঝি! বাজে কথা ছেড়ে সত্যি কথাটা বল। আজ আর পালাস না প্লিজ।'

—'ঠিক তা নয়।' গহন আস্তে আস্তে বলেন—'আসলে ঠিক বুঝতে পারি না....।'

—'কী?'

তিনি ব্যথিত ক্লান্ত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকিয়েছেন—'আমি কি আদৌ কবিতা লিখি শুঁটকি?'

—'হো-য়া-ট!'

শুঁটকি বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে সজোরে ব্রেক কষল। ড্যাশবোর্ডের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট ছিটকে পড়েছে গহনের কোলে। ঝাঁকুনির চোটে লকারটাও খুলে গেছে। তার ভেতরে পানীয়ের বোতলও চোখে পড়ে। শুঁটকি সবসময়ই এ জিনিসটা স্টকে রাখে। মদ খাওয়ার জন্য বারে যাওয়া সে পছন্দ করে না। তা ছাড়া বিকেলের পর থেকে তার যতটা মদ লাগে, তা সাপ্লাই দিতে কলকাতার যে-কোনো বার ফেল পড়বে। মিছরির পানা খাওয়ার মতো সে মদ খায়। এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছে দুই বন্ধুর মধ্যে। শুঁটকির লিভারে আজকাল ব্যথা হয়। তবু সে ডাক্তার দেখাবে না। মদ খাওয়াও ছাড়বে না। গহন কিছু বললেই বলে—'ডাক্তার আর সুরা দুটোকে একসঙ্গে রাখা যায় না। তাই ডাক্তারকেই স্যাক্রিফাইস করতে হল।'

আজ অবশ্য বিকেল অবধি অপেক্ষা করতে হল না। গাড়ি থামিয়েই উত্তেজিত ভঙ্গিতে পানীয়ের বোতল খুলে গলায় ঢেলে দিয়েছে। উগ্র ঝাঁঝালো একটা গন্ধ গহনের নাকে ঝাপটা মারল। বেশ খানিকটা তরল গলায় ঢেলে যেন একটু শান্ত হল সে।

—'তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস! প্রায় ত্রিশ বছর ধরে কবিতা লিখে, প্রতিষ্ঠা—খ্যাতির এভারেস্টে উঠে, হাফ-ডজন পুরস্কার পেয়ে—আজ জিজ্ঞাসা করছিস যে তুই

boierpathshala.blogspot.com

আদৌ কবিতা লিখিস কি না! এটা কি নতুন ধরনের কোনো রসিকতা! লেটেস্ট আমদানি করেছিস?'

গহন ক্লান্তভাবে গাড়ির সিটে শরীর এলিয়ে দিয়েছেন। এই জন্যই অন্তরের গোপনতম কথাটা কাউকে বলতে চান না। কারণ গোটা ঘটনাটাই সবার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকবে। কী করে বলবেন যে সত্যিই এই আত্ম-জিজ্ঞাসা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অদ্ভুত লাগলেও এ কথাটা আদ্যোপান্ত সত্যি। তিন দশক ধরে কবিতা লেখার পর আজ গহন দত্তগুপ্ত ভাবছেন—তিনি কি আদৌ কবিতা লিখেছেন? সত্যিই কি তাঁর কবিতারা, কবিতা হয়ে উঠেছে!

—'তুই বিশ্বাস না করলে আমার কিছু করার নেই।' গহন আস্তে আস্তে বলেন—'কিন্তু এটাই ফ্যাক্ট। সত্যিই বুঝতে পারছি না যে, আদৌ আমি কবিতা লিখি কি না!'

—'বাঃ!' শুঁটকি বোতলে আরও কয়েকটা চুমুক দেয়—'আশ্চর্য আবিষ্কার! এই আবিষ্কারের জন্য তোকে একজোড়া নোবেল দেওয়া উচিত। এনকোর... এনকোর!'

—'ইয়ার্কি নয়। আমি সিরিয়াসলি বলছি। তুই যদি শুনতে না চাস, তাহলে বলতে ইন্টারেস্টেড নই।'

সে তখনই কথাটার কোনো প্রত্যুত্তর না দিয়ে অনিমেষে তাকিয়ে আছে গহনের দিকে। মুখ গম্ভীর। শান্ত ভঙ্গিতে দু-এক মিনিট দেখল গহনকে। যেন বুঝতে চাইছে যে, তিনি কতটা সিরিয়াস। তারপর আস্তে আস্তে বলল— 'বল, শুনছি।'

গহনের বোধহয় সত্যিই কোনো মনোযোগী শ্রোতার প্রয়োজন ছিল। তিনি মনে মনেই অনুভব করেছিলেন ক্রমাগতই মনের খোলা জানালাগুলো বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের ভেতরে এই অসহ্য চাপ যে একা একা বেশিদিন বওয়া যাবে না তাও বুঝতে পেরেছিলেন। বহুদিনের বন্ধুত্ব আজ তাঁকে হালকা হওয়ার সুযোগ এনে দিল।

তাঁর চোখ দুটো বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে। আস্তে আস্তে বললেন—'জানি না, প্রবলেমটা তুই কতদূর বুঝবি। কিন্তু আমি ক্রমাগত বিভ্রান্ত হচ্ছি।'

—'কেন?'

তিনি অন্যমনস্ক—'তুই তো জানিস, একসময় রীতিমতো লড়াই করেই আমাকে আজকের জায়গায় পৌঁছোতে হয়েছে। প্রতিভাবান কবি সে সময়ে কম ছিল না। তার ওপর সমালোচনার লাল চোখ! অনেক প্রতিকূলতা ঠেলে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ সবের মানে কী!'

—'যাচ্চলে! মানে?'

—'মানে, আজ আমি যেখানে এসেছি সেখানে কোনো লড়াই নেই। কোনো সমালোচনা নেই। সর্বোপরি কোনো চ্যালেঞ্জ নেই।' গহন বলতে বলতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন —'অষ্টপ্রহর কানের কাছে একদল ভক্ত আমার গুণকীর্তন করছে। যা-ই লিখি সেটাই নাকি মাস্টারপিস! একই লাইন পাঁচবার লিখে, শেষে 'এখানেই শেষ হোক' লিখে তিনটে ডট মেরে দিলাম। সেটাই নাকি শতাব্দীর সেরা কবিতা! ওই তিনটে ফুটকির ব্যঞ্জনা নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠল। অথচ কেউ বুঝলই না যে ওই ডটগুলো আর কিছুই নয়। কবি আর কী লিখবেন ভেবে পাননি, তাই ডট বসিয়ে দিয়েছেন। রাবিশ!'

এতদিনের পুষে রাখা রাগটা এবার বিস্ফোরণ হয়ে বেরিয়ে এল। শুঁটকির মুখে একটা স্মিত অথচ হাসি ফুটে ওঠে। সেদিকে না তাকিয়েই গহন বলতে থাকেন—''বড়ো'

boierpathshala.blogspot.com

'বড়ো' পত্রিকারা লেখা পাওয়ার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে। আমার ওঁচা লেখাগুলো পর্যন্ত ধরে ধরে ছাপে। মিডিয়া, স্তাবক, সমালোচক—সকলে মিলে আমার কবিতাগুলোকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা আর আমাকে প্রায় ভগবান বানিয়ে ছেড়েছে। যখন আমার কবিতাই শ্রেষ্ঠ, আমি ঈশ্বরত্ব পেয়েই গিয়েছি তখন লিখব কেন? নতুন করে কিছু তো প্রমাণ করার নেই! কোথাও যাওয়ার নেই! নিজের লেখাকেই অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জ নেই। কারণ সবই তো মাস্টারপিস, তাকে কি টপকানো যায়?'

শুঁটকি মন দিয়ে গহনের কথা শুনছিল। তিনি নেহাত মিথ্যে বলছেন না। বাংলা সাহিত্যের বাজারটাই আজকাল এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড়ো বড়ো পত্রিকা, মিডিয়ার প্রচার, ভক্তবৃন্দ কবি-লেখকদের গায়ে গ্রেডেশনের ট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে। উনি 'এ' গ্রেডের লেখক বা কবি। তাই ওঁর সব লেখা চমৎকার হতেই হবে! ইনি 'বি' গ্রেডের। এঁর ফিফটি পার্সেন্ট লেখা ভালো, ফিফটি পার্সেন্ট মোটামুটি। ভক্তবৃন্দ তৈরি হয়েই থাকে 'বাঃ...বাঃ' বলার জন্য। এই বাহবার পিছনে কতটা যে আন্তরিক প্রশংসা, আর কতটা চাটুকারিতা তা বোঝা মুশকিল। পুরস্কারের তালিকায়, মিডিয়ার ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে, প্রচারে, বিজ্ঞাপনে, বড়ো বড়ো পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতার চটকদারিতে স্রষ্টা যত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন, তাঁর সৃষ্টি ততই গুরুত্ব হারায়। এ যেন হলমার্কের স্ট্যাম্প! যে সোনার গায়ে লাগানো আছে সেটাই খাঁটি! স্ট্যাম্পটাই শেষ কথা—সোনা নয়!

—'লিখতে হলে খিদে চাই। প্রেরণা চাই।' গহন হতাশভাবে মাথা নাড়লেন— 'আমি দুটোই হারিয়ে ফেলেছি। আমার পক্ষে আর লেখা সম্ভব নয়।'

শুঁটকি অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে কী যেন ভাবছে। তার চোখে কী যেন একটা ভাবনার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অস্থির আঙুলগুলো স্টিয়ারিঙে তবলা বাজাচ্ছে।

—'তোর বাড়িতে নেট আছে গহন?'

গহন নির্জীবের মতো চোখ বুজে ছিলেন। এই অপ্রাসঙ্গিক কথার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে গেলেন—'নেট!'

—'হ্যাঁ। ইনটারনেট। আছে?'

—'ইনটারনেট!' তিনি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন শুঁটকির দিকে। যেন প্রশ্নটার অর্থ বুঝতে পারছেন না—'হ্যাঁ...আছে। মানে... আমার তেমন দরকার পড়ে না। কিন্তু কণা বাড়িতে বসে বসে বোর হচ্ছিল বলে.....।'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলে—'ইনটারনেট এনেছিস। বেশ করেছিস। কণা ইউজ করছে, এবার তুইও করবি।'

গহন তার কথার মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। এমনিতেই তিনি কম্পিউটার, ইনটারনেট—এসব এড়িয়েই চলেন। উন্নততর প্রযুক্তির প্রতি বিতৃষ্ণায় নয়। আসলে ওই জিনিসটার সঙ্গে ঠিক সড়গড় হয়ে উঠতে পারেননি।

শুঁটকি তাঁর হতভম্ব ভাব লক্ষই করেনি। সে তখন সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর থেকে রাংতা বের করে এনে কী যেন খসখস করে লিখছে।

—'ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলবি?' বাধ্য হয়ে তিনি প্রশ্নটা করেই ফেলেন।

লিখতে লিখতেই সে উত্তর দেয়—'খোলসা করার কিছু নেই। তুই নিজেই একটু আগে বললি যে, মাথায় কিছু আসছে না বলে যেখানে-সেখানে একগুচ্ছ ডট বসাচ্ছিস। তোর ডট বেশি হয়েছে। তাই ডট কম করার চেষ্টা করছি।'

boierpathshala.blogspot.com

—'মানে?'

—'মানে এই।' কাগজটা এগিয়ে দিয়েছে সে। তিনি দেখলেন রাংতার পিছনের দিকে লেখা আছে—'ডব্লু্য ডব্লু ডব্লুডট কবিতা ডট কম।'

—'কবিতা ডট কম!' তাঁর চোখ প্রায় ব্রহ্মতালুতে উঠেছে—'আজকাল কবিতারও ডট কম বেরিয়েছে!'

শুঁটকি এবার মৌজসে সিগারেট ধরায়—'তুই এখনও সত্যযুগে পড়ে আছিস! পুথিতে কাব্যি করার দিন আর নেই বাচ্চা! এখন লোকে ইন্টারনেটে কাব্যচর্চা করছে। ওয়েবজিন, ব্লগ, কম্যুনিটি, গ্রুপ—এমনকি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে গেলে দেখবি লোকে নিজের অ্যালবামে কবিতা সেঁটে রেখেছে।'

গহন চোখ গোল গোল করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করেন, যদিও পুরো ব্যাপারটাই তাঁর মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তবু কোনোমতে বললেন—

—'এটাও কি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট?'

—'নাঃ', সে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলে—'এটা শুধু কবিতার একটা ওয়েবসাইট। ভারত-বাংলাদেশের অনেক কবি—অকবি, অ্যামেচার কবি এখানে কবিতা পোস্ট করে। কোনো সেন্সর-টেন্সর নেই। বাছাবাছির বালাই নেই। যে কেউ এখানে কবিতা দিতে পারে। এর অনেকগুলো সুবিধাও আছে।'

—'যেমন?'

—'যেহেতু এটা অনলাইন কবিতার সাইট সেহেতু রেসপন্স অনেক তাড়াতাড়ি পাবি।' সে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল—'প্রিন্টেড ম্যাগাজিনে তুই একটা কবিতা লিখবি, দু-মাস পরে সেটা পাবলিশড হবে। তারও একমাস পরে পাঠকের চিঠি আসবে—তবে তুই জানতে পারবি কবিতাটা কেমন লেগেছে। এখানে সে-সব ঝামেলা নেই। যে মুহূর্তে কবিতাটা পোস্ট করছিস, ঠিক সেই মুহূর্তেই হয়তো দশ-পনেরোটা লোক—অনলাইন হয়ে বসে আছে। কম্পিউটারের পর্দায় এক মিনিটের মধ্যেই কবিতাটা পড়ে ফেলবে। দু-মিনিটের মধ্যেই রি-অ্যাকশন পেয়ে যাবি। একদম ইনস্ট্যান্ট রি-অ্যাকশন।'

গহন এক মুহূর্ত ভাবলেন—'হুঁ।'

—'দ্বিতীয়ত এখানে তোর পরিচয় কেউ জানতে চাইবে না। যে-কোনো ছদ্মনামে তুই কবিতা পোস্ট করতে পারিস। মানেটা বুঝতে পারছিস?' শুঁটকি রহস্যমাখা হাসি হাসে —'এখানে তোর কবিতার পাশে গহন দত্তগুপ্ত—এ ওয়ান কবির নেমপ্লেটটা থাকবে না। বড়ো বড়ো পত্রিকার রেফারেন্সও থাকবে না। তোর আইডেন্টিটি ক্যারি করবে শুধু তোর কবিতা। কবিতাটা কেমন হল সে সম্পর্কে একদম খাঁটি আর আনবায়াসড রেসপন্স পাবি।'

তিনি শুঁটকির কথা শুনে সংশয়ান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। এরকম আবার হয় নাকি! এমন কথা আগে কখনও শোনেননি।

—'অত ভুরু কোঁচকানোর কিছু হয়নি। তোকে ঠিকানা দিয়ে দিলাম। অ্যাপ্লাই করে দ্যাখ। কয়েক মিনিটেই জবাব পেয়ে যাবি—যে সত্যিই তোর কবিতা, কবিতা হচ্ছে কিনা।'

গহন তখনও সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর মনে একটা অদ্ভুত সন্দেহও ঘনিয়ে আসছিল।

boierpathshala.blogspot.com

—'শুঁটকি, তুই এই সাইটটার খোঁজ পেলি কী করে?'

সে হাসল। মাঝেমধ্যেই সে এরকম অদ্ভুত একটা হাসি হাসে। হাসিটাকে গহনের, হাসি কম, কান্না বেশি বলে মনে হয়।

—'সে প্রসঙ্গ থাক।' শুঁটকি হাসতে হাসতে বলে—'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। আমি শেষমেশ চশমার দোকানি হয়েছি। কিন্তু স্বপ্নটা মরেনি, জানিস। বেশিদিন বাঁচব না জানি। কিন্তু মরার আগে একবার কবি হতে চাই আমি...শুধু একবারের জন্য কবি হতে...।' গহনের বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

তোমার খোঁপা এলো হলেই বাদলা নামে
মেললে দু-চোখ লজ্জাহত সূর্য পালায়,
মনের কথা লিখছি রোজই মেঘের খামে
বদ্ধ আখর গুমরে মরে বন্দিশালায়।
বুকের ভিতর আঁকছি নদী কল্পজালে,
তোমার মতোই অলীক বুঝি আমার চাওয়া
যতই ভাবি পৌঁছে যাব পা বাড়ালে
অনেক চলার শেষেও তোমায় যায় না পাওয়া!

উশ্রী অবিকল বনলতা সেনের মতো চোখ তুলে তাকিয়ে বলল—'এটা আমাকে নিয়ে লিখেছ?'

—'হ্যাঁ...তোমাকে নিয়ে। শুধু তোমাকেই নিয়ে উশ্রী।'

উশ্রীর চুল আজ খোলা। রেশমের মতো একঢাল ঘন চুল ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ছে। মন্দারের খুব ইচ্ছে করছিল ওই ঝাঁপিয়ে পড়া মেঘের প্রপাতের নীচে শুয়ে থাকতে। নরম, মসৃণ, সুগন্ধি কালো ছায়ায় মুখ ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিতে। এমন চুল নিয়ে খেলা করতে না জানি কেমন লাগবে!

কালো কুচকুচে ধনুকের মতো ভুরু বাঁকিয়ে বলল উশ্রী—'কেন? আমাকে নিয়ে কেন?'

মন্দার উশ্রীর মুখোমুখি ঘন হয়ে দাঁড়াল। দু-হাতে তার মোম রঙের সুডৌল মুখ স্পর্শ করে। গাঢ় স্বরে বলে—'আমি তোমায় খুব ভালো...'

'ভালোবাসি' শব্দটাই বোধহয় বলতে চেয়েছিল সে। হয়তো বলতেও পারত। কিন্তু তার আগেই গালে সপাটে একটা বিরাশি সিক্কার চড়! পেল্লায় হাতের এক মোক্ষম চড়ে তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। চোখের সামনে সরষেফুলের দিগন্তবিস্তৃত খেত! সে তখনও ভেবে পায়নি যে উশ্রী তাকে এমন প্রলয়ংকর থাপ্পড় মারল কী করে! অমন নরম-সরম পুতুলের মতো মেয়ের এমন বাঘের থাবার মতো হাত! উশ্রী কি রোজ ডাম্বেল ভাঁজে!

সে কোনোমতে মাথা ঝাঁকিয়ে ধাতস্থ হওয়ায় চেষ্টা করে। কানের ভেতর ঢুকে যেন এক ডজন চড়ুই পাখি ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। চোখ ঝাপসা! তার মধ্যেই কোনোমতে উশ্রীর দিকে সবিস্ময়ে তাকায় মন্দার। কিন্তু উশ্রী কোথায়! তার জায়গায় লম্বা-চওড়া কালো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে! কয়লা লোকটার চেয়ে কালো, না লোকটা কয়লার চেয়ে কালো—তা নিয়ে ডিবেট হতে পারে। ভুরু দুটো ঠিক যেন একজোড়া শুঁয়োপোকা।

boierpathshala.blogspot.com

সবচেয়ে ভয়ংকর চোখদুটো! মহাভারতের কংসের বোধহয় এমন চোখ ছিল। সাজপোশাকও পৌরাণিক সিরিয়ালের ভিলেনের মতো! মাথায় মুকুট, কানে দুল, কবচ, গলায় নীল পাথরের হার!—যেন এইমাত্র রামানন্দ সাগরের সিরিয়াল থেকে নেমে এল!

—'হা-রা-ম-জা-দা!' লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলে—'বামুনের ছেলে হয়ে উলটো-পালটা মন্ত্র পড়ে! সংস্কৃতের 'স'-ও জানে না। ভুল-ভাল উচ্চারণ করে জীবন অতিষ্ঠ করে ছেড়েছে! আর প্রেম করার সময়ে একেবারে মদন! মাথায় একশো কুড়ি ডাঙস না মেরেছি.....!'

বলতে-না-বলতেই আর এক পেল্লায় থাপ্পড়! মন্দারের মাথা তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ঘুরে গেল।

সে চেঁচিয়ে ওঠে—'বাঁচাও...বাঁচাও...'

'কী হল! অমন ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

কানের কাছে প্রায় কয়েকশো ডেসিবেলের একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল মন্দার। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে কণ্ঠস্বরের মালিককে দেখে আঁতকে উঠেছে! এ কী! এ তো সেই লোকটা! কুচকুচে কালো! ভাঁটার মতো চোখ। শুঁয়োপোকা ভুরু! শুধু 'জয় হনুমান' মার্কা পোশাকটা ছেড়ে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এসেছে।

সে অস্ফুটে বিড়বিড় করে বলে—'সর্বনাশ! শনিদেব!'

—'কী বিড়বিড় করে বকছিস!' লোকটা রেগে গিয়ে বলে—'ন'টা বাজে। স্নানে যাবি না!'

মন্দার এতক্ষণে ধাতস্থ হয়। নাঃ, লোকটা স্বপ্ন থেকে নেমে আসেনি। বরং ভীষণ রকম বাস্তব। ভদ্রলোক অন্য কেউ নন—স্বয়ং তার বাবা! দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একমাত্র পিতৃদেব!

ব্যাজার মুখে বিছানা ছাড়ল সে। মনমেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর একটা রোমান্টিক স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তার মধ্যেও টপকে পড়তে হল পালোয়ানটাকে! লোকটা কিছুতেই তার পিছন ছাড়বে না। স্বপ্নে মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে প্রেম করুক কি উশ্রীর সঙ্গে —ঠিক কোনো-না-কোনো ভাবে এসে বাগড়া দেবেই! আগে তবু দাঁত খিঁচিয়েই ক্ষান্ত হত। এখন দুমদাম হাত চালাচ্ছে।

টয়লেটের দিকে যেতে যেতেই রান্নাঘরের ফ্যাঁচফোঁচ শব্দ পেল সে। হাতা-খুন্তিগুলো আজ একটু বেশিই শব্দ করছে। বাটি-গ্লাসগুলোও ক্রমাগত ঝনঝন আওয়াজ দিচ্ছে। মন্দার বুঝতে পারে, পরিস্থিতি আজ গরম! রান্নাঘরে এত শব্দকল্পদ্রুমের অর্থ একটাই! মা বলতে চাইছেন—'আমি রেগে আছি'।

উশ্রী কিন্তু কখনও রাগ করে না। সে ভারী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। ডাইরেক্টর তাকে বকাবকি করলেও শান্ত হয়ে সব কথা শোনে। সবসময়ই প্রোডাকশনের লোকদের সঙ্গে খুনসুটি করছে। একটা মিষ্টি রহস্যময় হাসি তার ঠোঁটে সবসময়ই লেগে থাকে।

ভাবতেই মন্দারের মুখেও মুচকি হাসি ভেসে উঠল। উশ্রী এ বাড়ির বউ হয়ে এলে রান্নাঘরের হুড়ুম-দুড়ুম কমবে।

—'কী ব্যাপার রে?'

boierpathshala.blogspot.com

তার ছোটো বোন টিকলি ডাইনিং টেবিলে বসে কর্নফ্লেক্স খাচ্ছিল। দাদাকে দেখে টিপ্পনী কাটল—'কাল রাত্রে ইসবগুল খেয়েছিস নাকি!'

মন্দার তার দিকে চোখ গোলগোল করে তাকিয়েছে—'ইসবগুল! মিন্স!'

—'না! দিব্যি 'মোনালিসা'-স্মাইল দিতে দিতে টয়লেটে যাচ্ছিস কিনা!' টিকলি ফিচ ফিচ করে হাসল—'রোজ সকালে তোর মুখে 'উঃ কী চাপ!' গোছের এক্সপ্রেশন থাকে। আজ 'আঃ কী আরাম' মার্কা হাসি দিচ্ছিস। তাই জিজ্ঞেস করছি—লুবরির বন্দোবস্ত করেছিস কি না।'

সে কিছুক্ষণ বোনের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। টিকলি হায়ার সেকেন্ডারিতে লজিক নেওয়ার পর থেকেই হঠাৎই যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে শুরু করেছে! এমনকি দাদার ওপর 'দিদিগিরি' করতেও ছাড়ছে না।

—'শ্রীরামকৃষ্ণের সামনের দাঁতের পাটিতে ফাঁক ছিল, মায়েরও আছে। তাহলে মা, রামকৃষ্ণ নয় কেন?' মন্দার হাসল—'থিঙ্ক ইট.....'

টিকলি ঠোঁট ফুলিয়েছে, কর্নফ্লেক্সের বাটি সরিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতেই মন্দার শুনতে পেল সে মায়ের কাছে নাকি সুরে নালিশ জানাচ্ছে—'দ্যাঁখো মাঁ, দাঁদাভাই কিঁ বলেছেঁ। বলেঁ কিনাঁ তোঁমার দাঁতেও ফাঁক আঁছে... রাঁমকৃষ্ণের দাঁতেও.....।'

দড়াম করে টয়লেটের দরজাটা বন্ধ করে দিল মন্দার। টিকলির নালিশের প্রত্যুত্তর শুনতে চায় না। কমোডের ওপর চেপে বসে সে আজকের স্বপ্নটার কথাই ভাবছিল। উশ্রীকে আজ কী অপূর্ব লাগছিল! ওকে খুব চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল তার। হয়তো একটা-দুটো চুমু খেয়েও ফেলতে পারত। কিন্তু ওই লোকটা সব ভেস্তে দিল!

ভাবতেই তার রাগ হয়ে গেল। কী কুক্ষণে গ্যাস খেয়ে পইতে নিতে গিয়েছিল! বামুনের ছেলে হওয়ার এই শাস্তি! সবার ধাক্কা-টাক্কা খেয়ে এই দামড়া বয়েসে যদিও-বা পইতে নিল, তাতেও শান্তি নেই। পইতে নিলে নাকি একটা পুজো করতেই হয়। অন্তত একবার পুরুতের আসনে বসে 'অং বং চং' করাটা মাস্ট! এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কোনোমতে 'চাঁদ সদাগর' হয়ে পুজোটাও নির্বিঘ্নে করে ফেলতে পারত সে। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না! শেষ পর্যন্ত শনিদেব! কেন? হাতের সামনেই তো দিব্যি ভোলেভালা মহাদেব ছিলেন! ঠাকুমার কাছে শুনেছে তিনি নাকি গাঁজা-ভাং খেয়ে ভোম হয়ে বসে থাকেন। একটা-দুটো ভুলভাল মন্ত্র পড়লেও বিশেষ পাত্তা-টাত্তা দিতেন না। আর যিনি আগেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে আছেন, সেখানে 'মহেশ্বর' ভুলক্রমে 'মহাষাঁড়' হয়ে গেলেও এমনকি ক্ষতি হত।

কিন্তু না, মন্দারকে বিশেষ করে বাঁশ দেওয়ার জন্যই সবাই মিলে শনিদেবকেই খুঁজে পেল! পুজো দেওয়ার সময় কি আর জানত যে এই দেবতা কানখাড়া করে সব শুনছেন! আর তাকে কুম্ভীপাক দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন! যেদিন থেকে শনিপুজো করেছে, সেদিন থেকেই নিজের কপালে শনি নিয়ে ঘুরছে সে! যা-ই করতে যায় তাতেই 'আছোলা বাঁশ!' মনের আনন্দে একটা মেগা সিরিয়ালে স্ক্রিপ্ট লিখছিল। মেইন স্ক্রিপ্ট-রাইটার দেবুদা বেশ ভালো মানুষ ছিলেন। সামান্য ভুল-ত্রুটি হলেও মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু কপালে সে সুখ সইল না! দুম করে স্ক্রিপ্ট-রাইটার চেঞ্জ হয়ে গেল! ভালোমানুষ দেবুদার জায়গায় এলেন অজয় পান্ডা ওরফে পান্ডাদা! সে আর একরকম মূর্তিমান শনি! যেন কালো ষাঁড়ের মতো চেহারা, তেমনি তার হাঁকডাক। পায়ে আর্থ্রাইটিস—তাই হাঁটার সময় ডানদিকে-

boierpathshala.blogspot.com

বাঁদিকে সমান অ্যাঙ্গেলে বেঁকে হাঁটে। ডাইনে-বাঁয়ে ক্রমাগত হেলে হাঁটার জন্য অনেকেই তাকে পেছনে 'পান্ডা'র বদলে 'পেন্ডুলাম' বলে। কিন্তু কী মেজাজ? পান থেকে চুন খসলেই রদ্দা বাগিয়ে তেড়ে আসে!

অ্যাসিস্ট্যান্ট স্ক্রিপ্ট-রাইটারের কাজ করলেও মন্দার আসলে মনেপ্রাণে কবি। নেহাত বাবার ঠ্যালা খেয়ে কাজটা নিয়েছে। আর ওই কবি কবি ভাবই হয়েছে যত নষ্টের গোড়া! মেগা সিরিয়ালের সংলাপও মাঝে মধ্যে কাব্যিক হয়ে পড়ে। পেন্ডুলাম খেপে গিয়ে খিস্তি দেয়—'এসব কী ন্যাকা ন্যাকা সংলাপ! কবি হবি নাকি! কাব্যি করতে চাইলে—দাড়ি রেখে আগে আঁতেল হ। তারপর ঝোলা কাঁধে নিয়ে নন্দনে বসে থাক। সিরিয়াল মারাচ্ছিস কেন বে?'

মাথায় রক্ত চড়ে গেলেও কোনোমতে মেজাজ ধরে রাখে মন্দার। পান্ডা, তথা পেন্ডুলামের কথার যে কোনো মা-বাপ নেই তা ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানে।

—'হুঁ, কবি হবে!' পেন্ডুলাম একখানা বাংলা দৈনিকের পাতা টেনে এনেছিল। তার ওপর ভাল্লুকের মতো একখানা থাবা রেখে বলে—'কবিতা লেখা কী এমন শক্ত! খবরের কাগজের একটা পেজ খোল। তারপর হাতের পাতা দিয়ে চাপা দে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে যে সব অক্ষর উঁকিঝুঁকি মারবে, সেগুলোকে লিখে দিলেই হয়ে গেল কবিতা! যত দুর্বোধ্য তত অনবদ্য।' বলেই সে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে অশ্লীলভাবে হেসে উঠল। মন্দার প্রথমে রেগে গেলেও পরে তাকে মনে মনে ক্ষমা করে দেয়! অশিক্ষিত লোকজন! কবিতার মাহাত্ম্য কে বুঝবে! কী করে বুঝবে যে মন্দার পাতি কবি নয়। তার কবিতা 'সৌরভ', 'বিশ্ববঙ্গ', 'জলচ্ছবি'র মতো লিটল ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। কবিতা ডট কমের লোকজনও তার কবিতা পড়ে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে!

কবিতা ডট কমের কথা মনে পড়তেই তার কপালে ভাঁজ পড়ল। সেখানেও আজকাল শনির দৃষ্টি পড়েছে। 'কুবলাশ্ব' ছদ্মনামের একটা লোক তাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। যাই লেখে, লোকটা তার মধ্যে খুঁত ধরবেই। তার পোস্ট করা একটি কবিতার লাইন ছিল—'প্লিহার বেদনাতেও তোমার প্রেমের ব্যথা কমে না।' কুবলাশ্ব সেটা পড়ে মতামত দিল—'সবই তো বুঝলাম! কিন্তু প্লিহার ব্যথা উঠলে তো লোকে মা-বাপের নামই ভুলে যায়। অথচ আপনার দেখছি প্রেমিকার নামও মনে থাকে! আশ্চর্য!'

বিলো দ্য বেল্ট পাঞ্চ খেয়ে সে মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব বজায় রেখেই টাইপ করে—'এসব রোমান্টিসিজিমের ব্যাপার। যে-কোনো ব্যথাই আদতে রোমান্টিক।'

কুবলাশ্ব সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়—'প্লিহা, মানে পিলের ব্যথায় আবার রোমান্টিসিজম আছে নাকি! আমার এক পিসেমশাই তো প্রায়ই পিলের ব্যথায় ভোগেন। কই, তাঁকে তো বিন্দুমাত্রও রোমান্টিক বলে মনে হয় না। বরং সবসময়ই খিটমিট করেন। আপনার কাছে সব ব্যথাই রোমান্টিক বুঝি! দাঁতের ব্যথায় ভুগেছেন কখনও?'

সে আর বলতে! আক্কেল দাঁত ওঠার সময়ই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে 'আক্কেল গুড়ুম' হওয়া কাকে বলে।

অগত্যা, কুবলাশ্বকে আর মুখের মতো জবাব দেওয়া যায়নি। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করেছে মন্দার, আর মনে মনে ভেবেছে 'এইসা দিন নেহি রহেঙ্গা'। তারও দিন আসবে।

boierpathshala.blogspot.com

কমোডের ওপর চেপে বসে এই সবই ভাবছিল সে। হঠাৎ বাইরে থেকে বাবার উত্তেজিত চিৎকার—

—'ওঃ ভগবান, তুই এখনও টয়লেটে!'

—'বাবা.....!' সে বাবার উত্তেজনাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না—'ভগবান টয়লেটে নেই। আমি আছি।'

—'কতক্ষণ লাগবে তোর?' বাবা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন—'একেই নিম্নচাপ, আর্জেন্ট কেস। তার ওপর গ্র্যাভিটেশনের দুরন্ত ডাক! পারছি না।

—'অন্য টয়লেটটায় যাও না।'

—'ওটাতে টিকলি ঢুকেছে।' বাবার গলা ফুল ভলিউমে—'তাড়াতাড়ি কর।'

বাধ্য হয়েই পরের কাজগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলল মন্দার। পাঁচ মিনিট পরে যখন সে তৈরি হয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে বাবা মেঝের ওপর চেপে বসে পড়েছেন। সম্ভবত মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই চলছে।

—'যাও।'

বাবা তার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র অমিতাভ বচ্চন! এবং তিনি পাঁচ কোটি টাকা পেয়ে গেছেন।

রান্নাঘরের ঢং ঢং-ঠং ঠং এখন অনেকটাই কম। তার মানে এখন মায়ের রাগ কমের দিকে। সম্ভবত সকালেই কর্তা-গিন্নির মধ্যে একচোট রোঁয়া ফোলানো হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ এবেলা দুজনের বাক্যালাপ বন্ধ। বাবাকে দূরদর্শী লোক বলতে হবে। তিনি আগেভাগেই কিচেনের দেয়ালে নীরব একটা ব্ল্যাকবোর্ড সেঁটে রেখেছেন। রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতেই মন্দার দেখল ব্ল্যাকবোর্ডের ওপরও খড়ির দাগে বাবা-মায়ের ঝগড়া চলেই যাচ্ছে।

প্রশ্ন—কোন শার্টটা পরে যাব?

উত্তর—যেটা খুশি।

প্রশ্ন—ব্লু রঙের টাইট খুঁজে পাচ্ছি না।

উত্তর—বেডরুমের নীচের কাবার্ডে সাইডে ভাঁজ করে রাখা আছে।

প্রশ্ন—আমার শর্টস কোথায়?

উত্তর—আমি পরে বসে আছি।

শেষ উত্তরটা পড়ে কোনোমতে হাসি চাপল সে। মা তখনও একমনে হাতাখুন্তি নাড়িয়ে চলেছেন। মুখে-গলায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ব্লাউজের পিছনটা ঘামে ভিজে জবজবে। পিছনে না ফিরেই বললেন—'পাঁচ মিনিট, ডিমের ঝোলটা নামিয়েই খেতে দিচ্ছি।'

—'ঠিক আছে।'

আর কথা না বাড়িয়ে নিজের ঘরে চলে এল মন্দার। তাড়াতাড়ি ল্যাপটপটা অন করল। মা যতক্ষণে খেতে ডাকবেন, ততক্ষণে 'কবিতা ডট কমের' একটা চক্কর মেরে নেবে। রোজ সকালে, বিকেলে, সময় পেলেই অনলাইন হয়ে 'কবিতা ডট কমের' কবিতাগুলো পড়ে ফেলা তার নেশা। নতুন কে কী লিখল, তার নিজের কবিতায় কটা কমেন্ট পড়ল—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

boierpathshala.blogspot.com

ল্যাপটপটা অন হতেই স্ক্রিনে উশ্রীর ছবি ভেসে উঠেছে। দেখেই মন ভালো হয়ে গেল। একমাথা ঘন চুল এলিয়ে কেমন ছেলেমানুষের মতো হাসছে। উশ্রীর স্থির হাসির প্রত্যুত্তরে মন্দারও হাসল। তারপর অভ্যস্ত হাতে ব্রাউজার খুলে 'কবিতা ডট কমে' চলে গেল।

কবিতা ডট কমে আজ সকাল থেকে কবিতার ভিড়। প্রথম পাতায় একের-পর-এক কবিতা। তার নিজের কবিতাটা সম্ভবত দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাতায় চলে গেছে। 'অগ্রদূত', 'যাযাবর', 'আকাশনীল', 'জোনাকি' প্রত্যেকেই লিখেছে। একটাই শুধু নতুন নাম,—'একা মেঘ'।

কবিতাপাড়ায় নতুন কবির আমদানি হয়েছে! সে নিতান্তই কৌতূহলবশত কবিতার নামের ওপর ক্লিক করল। এটাই এখনও পর্যন্ত লাস্ট পোস্ট। কোনো কমেন্ট পড়েনি। মাত্র এক মিনিট আগেই কবিতাটা জমা পড়েছে।

মন্দার পেজটা খুলে কবিতার থ্রেডে চোখ রাখল। ক্লিক সংখ্যা এক। অর্থাৎ সেই-এ কবিতার প্রথম পাঠক। কবিতার নাম—'নোনা রোদ'।

বালির রেতে দফন প্রাচীন শামুক

অন্ধকার ও সমুদ্র ডাক নিয়ে।

ঢেউ চলে যায় একলা দ্বীপান্তরে—

পুরোনো স্মৃতির টিলায় মাখা রোদ

নোনা ধরা জলে আরশিটা মেলে ধরে

আর পিছু টানে জংলি হাঁসের ডাক।

উড়ে যাক

উড়ে যাক

উড়ে যাক.....।

কবিতাটা পড়ে তার ফের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। শনিদেবের থাপ্পড় খেয়েও এমন অনুভূতি হয়নি। সে প্রথমে লাইন-বাই-লাইন পড়ল। তারপর গোটা কবিতাটা! একেবারে অর্থহীন নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে কি! 'বালির রেত' আবার কীরকম শব্দ! বালি মানেই তো রেত! না অন্য কিছু? শব্দের চাতুরী মানেই কি কবিতা! অত সহজ!

মন্দার নিজের ছদ্মনামে মন্তব্য পোস্ট করল—'কবিতা না অ্যাটম বোমা ঠিক বুঝলাম না! 'উড়ে যাক...উড়ে যাক... বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত মাথার ওপর দিয়ে উড়েই গেল। উড়িয়েও দিল। এসব কী বিটকেল ফ্যান্টাসি। ঝুলস্য ঝুল!'

তার একটু রাগই হয়। এরা কী ভাবে! কতগুলো সুন্দর সুন্দর শব্দ পরপর বসিয়ে দিলেই কবিতা হয়ে গেল! এদের জন্যই পেন্ডুলামের মতো পাব্লিকগুলো কবিতার নামে হাসে। একবার এই কবিতা ডট কমেই 'কালকেতু' নামের এক কবি লিখেছিল—'শূকরের মাথা যেন এক ঝুড়ি লুচি!' কুবলাশ্ব তাকে এমন ঝেড়ে কাপড় পরিয়েছিল যে পালাবার পথ পায়নি। তারপর থেকে তাকে আর এ পাড়ার ত্রিসীমানায়ও দেখা যায় না।

মন্দার নিজেই কুবলাশ্ব-র ওপর চটে থাকলেও মনে মনে স্বীকার করল যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার মতো পাঠকেরও প্রয়োজন আছে! এরা খোঁচা না মারলে এইসব শূন্যকুম্ভরা নড়েচড়ে বসবে না। কবিতা লিখতে গেলে যে, কিছু পড়তেও হয় তা

boierpathshala.blogspot.com

বোঝানোর জন্যই কুবলাশ্ব-র মতো তেএঁটে লোক দরকার। আস্ত থিসিস না থাকলেও কিছু কিছু কবির কবিতা তো পড়তেই হবে।

মন্দারের ফেভারিট কবি অবশ্যই একমেবাদ্বিতীয়ম গহন দত্তগুপ্ত! কীসব অমানুষিক কবিতা লিখেছে লোকটা! পড়লেই গায়ে কাঁটা দেয়। বুকের ভেতরটা কেমন করে।

ভাবতেই আবার মন খারাপ হয়ে গেল। গহন দত্তগুপ্তের কবিতাকে এত ভালোবাসে বলেই না স্বয়ং কবির বৈঠকে সটান হাজির হয়েছিল। এমনিতে ভদ্রলোক ভারী শান্তশিষ্ট। কথা বলার চেয়ে ফ্যানের দিকেই তাকিয়ে থাকেন বেশি। নীচুস্বরে ছাড়া কথা বলেন না, বকা তো দূর! অথচ সেই মানুষটিও মন্দারকে এক মোক্ষম দাবড়ানি দিয়ে বসলেন। দোষের মধ্যে সে বৃষ্টিস্নাত দিনে কবির লেখা 'জলসই' কবিতাটা উচ্ছ্বাসিত হয়ে আবৃত্তি করে ফেলেছিল। তাতেই ভদ্রলোক এমন খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, যেন মন্দার তাঁর লেখা কবিতা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে!

নাঃ, গহন দত্তগুপ্ত-র দোষ নয়। দোষ তার নিজের কপালের। কী কুক্ষণেই যে শনিপুজোটা করতে গিয়েছিল!

ঝুলস্য ঝুল!

গহন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর কবিতাকে 'ঝুলস্য ঝুল' বলেছে কেউ! গহন দত্তগুপ্ত-র কবিতাকে....।

হঠাৎ করে রক্তচাপ বেড়ে গেল। মাথাটা দপ করে গরম হয়ে গেছে। এ যাবৎ জীবন অনেক কঠিন সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। অনেক কঠোর বাক্যবাণ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে কেউ এভাবে নস্যাৎ করে দেয়নি। অথচ কোথাকার কে এই 'রামহনু' ছদ্মনামধারী ব্যক্তি, একেবারে সপাটে বলে দিল—'কবিতা না অ্যাটম বোমা ঠিক বুঝলাম না। উড়ে যাক...উড়ে যাক...বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত মাথার ওপর দিয়ে উড়েই গেল। উড়িয়েও দিল। এসব কী বিটকেল ফ্যান্টাসি। ঝুলস্য ঝুল।'

অক্ষরগুলো যেন তাঁর চোখে লংকার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়েছে। সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না এমন দুর্নাম তাঁর অতিবড়ো শত্রুও দেবে না। কিন্তু এই ভাষায় সমালোচনা রীতিমতো অপমানজনক! একজন প্রবীণ, প্রতিষ্ঠিত কবির পক্ষে হজম করা কঠিন। এর চেয়েও অপমানজনক পরের কমেন্টটা। জনৈক 'কুবলাশ্ব' লিখেছে—'দাদা, এমন কবিতা লেখার চেয়ে তেলেভাজা খেয়ে অ্যাসিড বাঁধিয়ে বসে থাকুন না! তাতে অন্তত আমরা রক্ষা পাই।'

গহন উইন্ডোটা ক্লোজ করে রীতিমতো সশব্দেই মাউসটাকে সরিয়ে রেখেছেন। বজ্রাহতের মতো চেয়ারেই বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ইচ্ছে করছিল শোকেসে সাজানো স্মারকগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে। যত বই আজ পর্যন্ত লিখেছেন সব আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে পারলেই হয়তো স্বস্তি পান তিনি।

আরও কতক্ষণ ওভাবেই বসে থাকতেন কে জানে। কিন্তু পিছন থেকে সুললিত কণ্ঠে ডাক এল—'কবিবর'.....।

গহনের রাগ তখনও পড়েনি। বিষবাক্যের জ্বালায় তখনও চিড়বিড় করে জ্বলছিলেন। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কণার দিকে তাকালেন।

boierpathshala.blogspot.com

—'এ কী!' কণার মায়াবী চোখদুটোয় চাপা কৌতুক—'এখনও বসন্তকাল আসেনি। আমিও তপোভঙ্গ করতে আসেনি। তাহলে এই তেজোদীপ্ত অগ্নিদৃষ্টির কারণ?'

মৃদু অথচ রাগতস্বরে বললেন তিনি—'ওই নামে আমায় ডাকবে না।'

—'কেন?' কণার শীর্ণমুখ হাসিতে ঝলমল করে ওঠে—'তুমি কবিও বটে। এবং আমার বরও নিঃসন্দেহে। তাহলে 'কবিবর' শব্দটা কি দোষ করেছে?'

একটু থেমে আবার দুষ্টু দুষ্টু হেসে যোগ করলেন—'নাকি একা আমারই বর কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে!'

—'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।' গহনের মেজাজও খানিকটা ঠান্ডা হয়ে আসে। অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলেন—'তবে কবি কিনা তাতে সন্দেহ আছে।'

—'যাক, তবে তোমার ওপর আমার অনন্ত মৌরসি।' তিনি কণ্ঠস্বরে ছদ্ম অভিমান মাখিয়েছেন—'তাহলে এই অসময়ে বিছানা ছেড়ে তোমায় কষ্ট করে ডাকতে এলাম কেন, সে কথা জানতে চাইছ না যে!'

এতক্ষণে খেয়াল হল তাঁর। এখন কণার বিশ্রামের সময়। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য একটু গড়িয়ে নেন তিনি। খুব প্রয়োজন না পড়লে বিছানা ছেড়ে এ সময়ে সচরাচর ওঠেন না। অথচ আজ নিয়মভঙ্গ হয়েছে।

গহনের চোখে সপ্রশ্ন কৌতূহল। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই কণা জবাব দিয়ে দিলেন —'ঘুঁটু এসেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। অসিতদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

শেষ বাক্যটা বলার সময় তাঁর মুখে আন্তরিক উদবেগের ছাপ পড়ল। গহন তাঁর দিকে অপলকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর চিন্তিত, মন্থর স্বরে বললেন—'তুমি যাও, আমি দু-মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

কণা আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন। গহন চেয়ারে বসে কী যেন চিন্তা করছেন। অসিতদার কথা মনে পড়তেই চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। বুকে স্মৃতির উঁকিঝুঁকি। অসিতদা, তথা অসিতবরণ চৌধুরী একসময়ে তাঁদের হিরো ছিলেন। চেহারাটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ বলতে যা বোঝায় তাঁর গায়ের রংটা ঠিক তাই। লম্বা একহারা চেহারা। সাদা ধবধবে পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি, ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো চুল, ক্লিন শেভ করা নীলচে গাল, সবসময়ই পান খেয়ে ঠোঁট দুটো লাল করে বসে থাকতেন। শিরায় জমিদারি রক্ত ছিল। তার ওপর কট্টর কমিউনিস্ট। অসম্ভব আদর্শবাদী তাই হয়তো চিরকালই অদ্ভুত, খামখেয়ালি সাহিত্যের ওপর প্রতিষ্ঠানের প্রভাব মানতেই চাইতেন না। রীতিমতো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন, যে বড়ো বড়ো নামকরা পত্রিকায় কিছুতেই লিখবেন না। এ প্রসঙ্গে অনুযোগ করলেই বলতেন—'কেন, ওরা ছাড়া দেশে কোনো পত্রিকা নেই নাকি? আমি বুর্জোয়াদের জন্য কবিতা লিখি না। সাহিত্য করলেই কয়েকটা মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে? অসম্ভব! পারব না....।'

গহন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তেজ আর জেদ—দুটোই ছিল অসিতদার। নিজের সর্বস্ব দিয়ে জন্ম দিলেন এক নতুন পত্রিকার। জন্ম নিল 'নকশীকথা'। সমস্ত তরুণ উদীয়মান কবি সেখানে লিখতে শুরু করল। তাদের মধ্যে গহন ছিলেন অন্যতম। অসিতদা তাঁকে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। বলতেন, 'আমার অর্জুন'। বেশি ভালোবাসতেন বলেই বোধহয় বেশি ঘৃণাও করতে পেরেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো সাহিত্য পত্রিকা —'স্বদেশে'-র শারদীয়া সংখ্যায় যখন গহনের দীর্ঘ কবিতা ছাপা হল তখন অসিতদার

boierpathshala.blogspot.com

ফরসা মুখ রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করতে করতে বলেছিলেন —'শেষ পর্যন্ত তুইও প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিস! তোর মধ্যে লোভ আছে! লোভী! বিশ্বাসঘাতক! বেরিয়ে যা...এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা। তোর মুখ আর কোনোদিন দেখতে চাই না। বেরিয়ে যা...।' তাঁর তর্জনী নিষ্ঠুরভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল দরজাটা। মাথা নীচু করে সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে এসেছিলেন গহন।

'নকশীকথা'র দরজা তাঁর জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অসিতদার ওপর নিবিড় অভিমানে তাঁকে আর কোনোদিন মুখ দেখাননি তিনি। অথচ এই অসিতদাই গহনের বিয়ের সময় বাবার জায়গা নিয়েছিলেন। কণাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—'কবির বউ হয়েছ মা, স্বামীর ভালোবাসা ছাড়া আর সবকিছুই ঘরে বাড়ন্ত থাকবে। শাঁখা, সিঁদুর আর জলজ্যান্ত পতিদেব ছাড়া অন্য কোনো অলংকার পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। কষ্ট করতে পারবে তো?'

ভাবতেই বুক খাঁ খাঁ করে উঠল। সেই মানুষই কী নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। 'নকশীকথায়' আর ফিরে যাননি গহন। কিন্তু খবর রেখেছিলেন। প্রায় দশ বছর ধরে উদয়াস্ত খেটে, ম্যাগাজিনটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন অসিতদা। তারপর আচমকাই 'নকশীকথা' থেকে সরে দাঁড়ালেন। প্রথম প্রথম ছোটোখাটো কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা নিয়মিত ভাবেই ছাপা হত। তারপর আস্তে আস্তে কবে যে বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়ে গেলেন তার খবর আর কেউ রাখে না।

চোখে বাষ্প জমে এসেছিল। আলগোছে চোখ মুছে নিলেন। তারপর উঠে গেলেন বসার ঘরের দিকে। ঘুঁটু ওরফে অধীর তরফদার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিল। নকশীকথার আমল থেকেই দুজনের আলাপ। দুজনেই প্রথমে অসিতদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলতে শুরু করেছিল। ঘুঁটু ডাকনামটা অসিতদারই দেওয়া। গহনকে তাড়িয়েছিলেন অসিতদা। আর ঘুঁটু নিজেই সরে গিয়েছিল।

বর্তমানে সে একটা বিরাট সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরি করে। কবিতা বিভাগটা দেখে। মোটা টাকা মাইনে পায়। সেই গ্রামের গোবেচারা ঘুঁটুকে এখন আর চেনাই যায় না! এখন সে দস্তুরমতো সম্মানীয় শ্রীযুক্ত অধীর তরফদার।

ঘুঁটু এই ক-বছরে বহরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অতিরিক্ত মেদবাহুল্য আর উত্তেজনার যুগপৎ আক্রমণে সে ঘামছিল। গহনকে দেখে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে হাঁসফাঁস করে বলল—'শুনেছিস?'

গহন শান্তভাবেই তার মুখোমুখি চেয়ারটাতে বসে পড়েন—'কী হয়েছে?'

—'সেরিব্রাল', ঘুঁটুর ডাবল চিন নড়ে ওঠে—'গত বৃহস্পতিবার রাত্রে বাথরুমে যেতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে আই.সি.ইউ-তে অ্যাডমিট করতে হয়েছিল। শরীরের ডানদিকটা একদম পড়ে গেছে বুঝলি! তবে ডাক্তাররা বলেছে প্যারালিসিস হওয়া একদিক দিয়ে ভালোই। প্রাণের আশঙ্কা নেই। এখন অবশ্য জেনারেল বেড়ে দিয়েছে...।'

ঘুঁটু আরও কত কি বকবক করে বলে গেল কে জানে। গহন কিছুই শুনেছিলেন না। তিনি ভাবছিলেন অসিতদার ডানহাতটা অসাড় হয়ে গেছে। আর কবিতা লেখা হবে না তাঁর।

—'দাজি কাল তোর কথা খুব বলছিলেন।' সে একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলে—'একবার দেখতে যাবি?'

boierpathshala.blogspot.com

তার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেলেন গহন। এতদিন বাদে অসিতদার মুখোমুখি হতে পারবেন কি! যে পথ দিয়ে তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন, গহন সে পথে কোথায়? আজ তিনি অসিতদার চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন। সে উচ্চতা থেকে মানুষটাকে দেখাও যায় না।

অথচ সেই মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন আজকের প্রতিষ্ঠিত কবি! এ কি ভয়, না লজ্জা! আদর্শচ্যুত হওয়ার লজ্জা কি প্রতিষ্ঠার চেয়েও বড়ো!

—'দ্যাখ', ঘুঁটু তাঁর কাঁধে হাত রেখেছে—'আমিও জানি দাজি তোর সঙ্গে অন্যায় করেছেন। একটা সামান্য ব্যাপারে তোকে অপমান করেছিলেন। কিন্তু এখন ওসব মনে রাখার সময় নয়...।'

সত্যিই কি অসিতদা অন্যায় করেছিলেন! ন্যায়-অন্যায়, মান-অপমান মনে পুষে রাখার লোক নন গহন। তবু কোথায় যেন একটা কুণ্ঠা, একটা আত্মগ্লানি তাঁকে চেপে ধরে।

তাঁর আত্মনিমগ্ন চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে যেন হতাশ হয়ে পড়ল ঘুঁটু। কাতরস্বরে বলে —'একবার যাবি না গহন?'

বুকের ভেতরে কুচ করে কী যেন একটা বিঁধল। একটা সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ ব্যথা টের পেলেন। ঘুঁটুর দিকে তাকাতে গিয়েই চোখ পড়ল আয়নায়। দামি কাচে কণার প্রতিচ্ছবি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছেন তিনি। দু-চোখে জলভরা মেঘ নিয়ে তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকেই। যেন জানতে চাইছেন, 'আর কত পালাবে?'

গহন একমুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন। জোরালো একটা শ্বাস টেনে বললেন—'চল।'

'এখন চারদিকটা কেমন যেন কালো কালো ঠেকে!
যেদিকেই হাতড়াই, খালি অশরীরী ছায়া টেনে ধরে নির্বাক,
একটা কালো নদী খোলস পালটেছে—
কালোকে মাঝেমধ্যে লাল দেখি।
নদীটা হাত ফসকে মিলিয়ে গিয়েছিল
ডালিম গাছের পাতার ফাঁকে—পাখির ঠোঁটে টুপ করে
ঝরে পড়ে দুটো—একটা দানা চুনি চুনি।
এখন চতুর্দিকে শুধু ভাঙাভাঙির শব্দ,
কাচ ভাঙছে। তার পিছনে ঝাপসা ঝাপসা মুখ
বেঁকেচুরে ভেঙে যাচ্ছে। প্লেট টেকটনিক
তত্ত্বই আসলে সত্যি। আমাদের পায়ের তলায়,
মাটি ভেঙে টুকরো টুকরো প্লেট হয়ে যায়।
তারপর ধাক্কাধাক্কি ভাঙাভাঙি।
ভেঙে যায়...ভেঙে যায়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে।
তারপরও আমাদের বুড়ো বটগাছটা

boierpathshala.blogspot.com

কালো ভূতের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

শিমশিম করে দুলে ওঠে প্রাচীন শিরা।

ব্রহ্মদত্যির ভয় দেখাতে চাওয়া

লাল-লাল চোখ নিরস্ত হয়ে মিশে যায়

মাটিতে। গভীর শিকড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো ঘামের মতো মাটি আঁকড়ে,

গ্রাম আঁকড়ে, দেশ আঁকড়ে, বিশ্ব আঁকড়ে

দাঁড়িয়ে থাকা চারকোল ছবি দেখতে চাই।

অন্ধকার কি নেমেছে বসুন্ধরা?'

হাসপাতালের বেডে একটা কঙ্কাল শুয়েছিল।

অসিতদা নয়, অসিতদার কঙ্কাল। অত লম্বা মানুষটা যেন কুঁকড়ে ছোটো হয়ে গেছেন। এখন দেখলে আর কেউ বলবে না, যে-কোনোদিন তাঁর নায়কের মতো চেহারাও ছিল। কোথায় সেই পুরুষালি সৌন্দর্য! তার বদলে যেন কেউ একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক ফসিলকে শুইয়ে রেখেছে। ডান হাতটা নিঃসাড় হয়ে আছে বুক ঘেঁষে। মুখের একদিক বেঁকে গেছে। বাঁ হাতটা বেডের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা! অক্সিজেনের নল, স্যালাইনের বোতল, ক্যাথিটার,—আরও কত উপসর্গ ছুঁচ ফুটিয়ে রয়েছে গোটা শরীরে!

গহন স্তম্ভিতের মতো একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন অসিতদার মুখের দিকে। সদাব্যস্ত নার্স এদিক-ওদিক ঘুরে তদারকি করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'ওঁর হাত বেঁধে রেখেছেন কেন?'

নার্স বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়—'কী করব? সুযোগ পেলেই অক্সিজেন, স্যালাইন, চ্যানেলগুলো ধরে টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছেন। তাই বাধ্য হয়েই হাত বেঁধে রেখেছি।'

অসিতদার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। শব্দগুলো স্পষ্ট নয়—ক্রমাগতই জড়িয়ে যাচ্ছে—তার মধ্যেই কোনোমতে বললেন—'গহন, আমি শিউলির গন্ধ নিতে চাই। এখানে শুধু মেডিসিনের উৎকট গন্ধ!'

শিউলি! এই গরমের মরশুমে শিউলি কোথায়! গহনের স্পষ্ট মনে পড়ে, অসিতদার বাড়ির সামনে একটা শিউলি গাছ ছিল। শরৎকাল এলেই বাড়ির সামনের পথ, উঠোন অবধি সাদা হয়ে থাকত। রোজ ভোরে অসিতদা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে একটা বাটির মধ্যে জলে ভিজিয়ে রাখতেন। সেই মিষ্টি গন্ধটা আজও যেন টের পান তিনি। গলার কাছে অদ্ভুত ব্যথাবোধ জমাট বেঁধেছিল। অসিতদার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছিলেন না। অপরাধবোধ তাঁকে একটু একটু করে গ্রাস করছিল।

—'আমি আপনাকে শিউলি ফুল এনে দেব দাজি।'

শীর্ণ মুখটায় শিথিল হাসি ফুটল। একটু চুপ করে থেকে যেন দম নিয়ে নিলেন। তারপর ফের অস্পষ্ট জড়ানো কণ্ঠস্বরে বলেন—'তোর কাছে কাগজ- কলম আছে?'

গহনের কাছে সবসময়ই একটা রাইটিং প্যাড থাকে, তিনি ব্যাগ থেকে সেটাকে বের করে এনেছেন। নার্সটি তীক্ষ্ণচোখে গোটা ব্যাপারটাই দেখছিল। এবার খনখনে গলায় বলে —'বেশি কথা বলবেন না। ডাক্তারবাবুর বারণ আছে।'

boierpathshala.blogspot.com

অসিতদা হাসলেন। মুখটা বেঁকে যাওয়ায় হাসিটাও বাঁকা ঠেকল। গহন কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি। অসিতদা চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবেন। তারপর আস্তে আস্তে স্খলিত উচ্চারণে একের-পর-এক লাইন বলে গেলেন। গহন যেন বাধ্য ছাত্রের মতো ক্লাস নোট নিচ্ছেন। মাথা নীচু করে লিখে গেলেন, পঙক্তির পর পঙক্তি।

—'অন্ধকার কি নেমেছে বসুন্ধরা!' শেষ লাইনটা অতিকষ্টে বলে চুপ করে গেলেন তিনি। পাঁজর-সর্বস্ব বুকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে। মানুষটাকে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। শরীরটা হাসপাতালের ময়লা চাদরের সঙ্গে একবারে মিশে গেছে।

গহন চুপ করে তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে। অসিতদা একসময়ে লিটল ম্যাগাজিনে দাপিয়ে বেড়াতেন। কবিতা-অন্ত-প্রাণ এই প্রচারবিমুখ কবি অনেক প্রতিষ্ঠিত নামী কবির চেয়েও ভালো লিখতেন। আত্মাভিমানী মানুষটার আজ আর কবিতা লেখার উপায় নেই! লিখতে চাইলেও অন্য কারুর শরণাপন্ন হতে হবে।

—'কবিতাটা তুই বড়ো ভালো লিখতিস গহন।' শ্বাস টানতে টানতে বললেন তিনি —'তবে আমি তোর থেকেও ভালো লিখতাম।'

সেই অহংকার! এ অহমিকা গহনের পরিচিত। তিনি অসিতদার চোখে এই প্রথম চোখ রেখেছেন। গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখদুটোয় এক অমানুষিক দীপ্তি!

—'কিন্তু তুই ঠিক রাস্তাটা ধরেছিলি। আই ওয়াজ রং!'

তিনি বিস্মিত হলেন! এ কী কথা বলছেন অসিতদা! এমন কথা কখনও তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। নির্বাক, বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখছেন তাঁকে।

—'অনেকক্ষণ কথা বলছেন দাজি। এবার একটু রেস্ট...।'

—'ভাবছিস বুড়োকে ভীমরতিতে ধরেছে!' খুব কষ্ট করে বাঁকা হাসিটা হাসলেন অসিতদা। একটু দম নিয়ে ফের বলেন—'সারাজীবন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে জেহাদ করে এলাম। প্রতিষ্ঠানের পোষা কবি বলে তোকে তাড়ালাম, নকশীকথার পিছনে সবকিছু ব্যয় করেছি আমি। অথচ...।'

—'দাজি, এখন ওসব কথা থাক...।'

—'নাঃ, বলতে দে।' হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন তিনি—'কনফেশনের দরকার আছে। হয়তো সময় পাব না...।'

কী বলবেন গহন! অসহায় দৃষ্টিতে শীর্ণকায় মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছেন। সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত রোগীর এত কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু অসিতদাকে সে কথা কে বোঝাবে!

—'নকশীকথা আমার সন্তানের মতো ছিল। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। ভেবেছিলাম খুব প্রতিবাদ করছি। বুর্জোয়াগুলোকে দেখিয়ে দেব সাহিত্যের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীই শেষ কথা নয়। কিন্তু...।' রুগণ মানুষটার চোখদুটো জলে ভরে এসেছে—'কয়েকবছর পরে বুঝলাম আসলে আমিও আর-একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করেছি! প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কখন যেন আর-একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ফেলেছি। আমারই হাতে তৈরি হয়েছে আরও একটা বুর্জোয়া গোষ্ঠী—সেই লবি-অ্যান্টিলবির ঘৃণিত গল্প! যা আন্তরিক ভাবে চিরকাল ঘৃণা করে এসেছি—আমিও সেই গোষ্ঠীবাদেরই জনক।'

boierpathshala.blogspot.com

গহন নির্বাক শ্রোতা। এত যন্ত্রণা অসিতদার মধ্যে ছিল! যে লোকটা কোনোদিন কোনো পরিস্থিতিতেই হার মানেনি, আজ সে কী বলছে! তার একান্ত পরাজয়ের গ্লানিময় ইতিহাস এতদিন নৈঃশব্দ্যের পিছনেই লুকিয়ে ছিল। আজ বুকফাটা হাহাকার হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

—'আজ তুই কোথায়, আর আমি...।' অসিতদা যেন ভেতরে ভেতরে কাঁদছেন —'আমাকে কেউ চিনল না গহন...কেউ জানল না আমার কথা...আমি হারিয়ে গেলাম... হারিয়েই গেলাম...।'

অসিতদার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই পিতামহ ভীষ্মের কথা মনে পড়ে গেল গহনের। নিজেরই প্রতিজ্ঞার ফাঁদে জড়িয়ে পড়া পৌরাণিক বীরটিও কি গোপনে গোপনে এমনই কেঁদেছিলেন? অন্তিম মুহূর্তে তাঁর মনেও কি আপসোস কামড় বসায়নি?

বাদবাকি সময়টা নীরবেই কাটল। অসিতদা অবসন্নের মতো বিছানায় পড়ে রইলেন। এরপর আর একটা কথাও বলেননি। গহনও ভারাক্রান্ত মনে, সজল চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। অপরাধবোধটা দ্বিগুণ বেড়েছে। সবচেয়ে বিড়ম্বনা, এ বেদনার কোনো নিদান নেই। সান্ত্বনা, ভরসা, স্তোকবাক্য—কোনোটাতেই এ যন্ত্রণা কমানো সম্ভব নয়।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হতেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। একরকম পালিয়েই এলেন। তাঁর দেহও যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। কোনোমতে সামনের একটা কাঠের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েন। মনে কোনো অনুভূতিই আর দাগ কাটছে না। দুঃখ, কষ্ট, রাগ, অভিমান—কিছুই না! শুধু খাঁ খাঁ শূন্যতা।

ঘুঁটু এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছিল। এবার গহনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। তার কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ততার প্রলেপ।

—'দাজি এখন আউট অফ ডেঞ্জার। ডাক্তাররা বলছে—আপাতত কয়েকটা দিন খুব সাবধানে...।' বলতে বলতেই থেমে গেল সে। গহনের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে আশঙ্কিত গলায় বলল—'গহন! কী হয়েছে!'

গহন তখন ভাবছিলেন, অসিতদাও ইচ্ছামৃত্যুর বর পেলেন না কেন!

'আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।

অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।

সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!

ক্ষান্ত বর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,

জাম আর জামরুলের পাতায়।

যা নাকি অল্প-একটু হাসির মতন লেগে থাকে।'

—'অমলদা...।'

শুঁটকি আপনমনেই এককোণে বসে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। এমনিতে সে বারে আসতে চায় না। কিন্তু আজ দায়ে পড়ে আসতে হয়েছে। জিনিসটা স্টকে রাখতে ভুলে গিয়েছিল সে। আজকাল প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা মনে থাকছে না। কে জানে অ্যালঝাইমার হল কিনা!

boierpathshala.blogspot.com

অ্যালঝাইমারকে ভয় পায় না শুঁটকি। বরং যে মানুষ সবকিছু ভুলে যেতে পারে তার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। স্মৃতি মানেই শুধু মৃত্যু, বেদনা, আঘাত! আজ পর্যন্ত স্মৃতির অন্য মানে জানতে পারল না সে!

শুধু একটাই দুঃখ। অ্যালঝাইমার হলে রুমার জন্য কবি হওয়ার স্বপ্নটাও ভুলে যাবে। সারাজীবন ধরে ওই একটা স্বপ্নই তো দেখছে। একদিন সে-ও কবি হবে। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। কিন্তু শুঁটকি কবি হয়েই ছাড়বে।

—'ও অমলদা।'

পিছনের ডাকটা এবার জোরালো হয়েছে। শুঁটকির হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে তার পিতৃপ্রদত্ত নামটাও অমলকান্তি। শীর্ণ, কাঁকলাসের মতো চেহারার জন্য শুঁটকি নামটা এমনই বহুল প্রচলিত, যে নিজের খানদানি নামটাই ভুলে গিয়েছিল। আজ মনে পড়তেই বেদম হাসি পেয়ে গেল তার। জীবনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বেছে বেছে এই নামটাই রাখতে হয়েছিল বাবা-মাকে!

—'কোন শালা রে?'

ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছনের লোকটাকে দেখার চেষ্টা করে শুঁটকি। লোকটা এবার তার মুখোমুখি চেয়ারটাতে এসে বসেছে।

—'খামোখা মুখ খারাপ করছ কেন? আমি স্বর্ণাভ।'

বিরক্তিতে নিজের অজান্তেই মুখ বিকৃত হয়ে আসে তার—'তুই এখানে কি করছিস? এখনও নোবেল দেওয়ার জন্য তোকে ডাকেনি?'

স্বর্ণাভ গুপ্ত এখনকার উঠতি তরুণ কবিদের অন্যতম। কী যে মাথামুন্ডু কবিতা লেখে তা শুধু ও-ই জানে। অথচ হাম্বাগ দি গ্রেট। কথায় কথায় বোদলেয়ঁ, চমস্কি, এলিয়ট ভ্যালেরি আওড়ায়। বাংলা কবিতার নাম শুনলেই নাক সিঁটকানো এদের স্বভাব। শুঁটকির ভীষণ বিরক্ত লাগে। যদি এত বড়ো সাহেবই হয়েছিস তো চানা-মটর চিবিয়ে ফরাসি বা ইংরেজিতে কবিতা লিখিস না কেন? কলম ধরলেই তো সেই 'দীনা হীনা পিঁচুটি নয়না' বঙ্গভাষার কথাই মনে পড়ে! যতসব হারামজাদার দল!

শুঁটকির বক্রোক্তিকে পাত্তা না দিয়েই স্বর্ণাভ বলে—'তুমি এখানে যে! এ পাড়ায় তো তোমাকে দেখাই যায় না। ভুল করে চলে এসেছ বুঝি?'

—'ঠিকই বলেছিস।' সে উঠে দাঁড়ায়—'সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে। চলি।'

—'আরে...।' স্বর্ণাভ তার হাত টেনে ধরেছে—'এখনই কোথায় যাচ্ছ? সবে তো কলির সন্ধে। বোসো, আরও পাঁচ-ছ পেগ মেরে যাও। আমার ট্রিট।'

—'পাঁচ-ছ পেগ!' শুঁটকি হেসে ফেলল—'ধুস, ওতে কি হবে? পাঁচ-ছ পেগে আমার ব্রেকফাস্টও কমপ্লিট হয় না!'

—'ঠিক আছে, যত খেতে চাও, খাও।' সে হাসছে—'বিল আমি দেব।'

শুঁটকি ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখে—'কেসটা কী বল তো! কখনও তো একটা বরফের গোলাও খাওয়াসনি! আজ একেবারে মাল! সত্যি সত্যিই নোবেল পেয়েছিস নাকি!'

স্বর্ণাভ কোলগেট হাসি হাসল—'নোবেল পাইনি বটে, তবে বেলতলায় যাচ্ছি, আই মিন, ছাঁদনাতলায় দাঁড়াচ্ছি'।

boierpathshala.blogspot.com

সে সরুচোখ করে ছেলেটাকে দেখছে। জগতে এমন মেয়েও আছে যে এই ফ্রেঞ্চলিশ গাধাটাকে বিয়ে করবে! এমনিতেই তো আঁতেলের শিরোমণি। তার ওপর চেহারারও কী বাহার! মেয়েদের মতো পনিটেল রেখেছে। মুখ ভরতি উলুবনে চোখ-নাক সবই ঢেকে গেছে। তার ওপর যা দশাসই একখানা পেটমোটা বপু! মেয়ের বাপ জগতে আর মানুষ খুঁজে পায়নি! শেষ পর্যন্ত এই গোরিলাটাকেই পেল!

—'কী ভাবছ?'

—'এই মুহূর্তে একটা কবিতা মাথায় সুড়সুড় করছে।' শুঁটকি খলখল করে হেসে উঠেছে—'হি প্রিয়তম,/যদি হাতে দিলে তোমার ছবি/হৃদয়ে দিলে প্রেম/তোমার ওই হতকুচ্ছিত দাড়ি কেন/ছাড়িয়ে গেল ফ্রেম!'

—'এটা কার কবিতা?'

—'তোর বউয়ের!' হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে পড়ে—'এখনও লেখেনি। তবে তোকে বিয়ে করার পর শিয়োর লিখবে।'

—'ধুস।' স্বর্ণাভ বলে—'তোমাকে বলাটাই ভুল হয়েছে। ফ্রাস্টু লোকদের সুখবর শোনাতেই নেই।'

—'ঠিক বলেছিস। ফ্রাস্টু লোকদের ফরাসি আর ইংরেজি কবিতা শোনাতে হয়।' শুঁটকি চোখ টিপল—'আছে নাকি স্টকে?'

ব্যস! স্বর্ণাভকে আর পায় কে! সে প্রথমে ফরাসি সাহিত্য নিয়ে একচোট বক্তৃতা দিতে শুরু করল। শুঁটকি খুব বাধ্য ছাত্রের মতো তাকিয়ে আছে ঠিকই। কিন্তু আদৌ লেকচার শুনছে না। তার লক্ষ্য বিনা পয়সায় আরও কয়েক পেগ মদ খাওয়া। এমন সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে?

ও প্রান্তে শিক্ষক তখন ফরাসি ছেড়ে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা চালাচ্ছেন। যথারীতি ঝুম্পা লাহিড়ি, ভি. এস. নৈপল, অরুন্ধতী রায়, অরবিন্দ আদিগা—সমস্ত ঝলমলে নামগুলো উঠে আসতে শুরু করেছে। সে চিরকালই প্রমাণ করতে চায় যে তার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি খুব কমই আছে। দুনিয়ার সব লেখক ও তাঁদের সমস্ত সৃষ্টি তার ঠোঁটস্থ।

—'আচ্ছা, তুই ভর্না শ-এর লেখা পড়েছিস?' আচমকা প্রশ্ন করল শুঁটকি—'শুনেছি ভদ্রমহিলা দারুণ লেখেন। একটুর জন্য বেচারির বুকারটা ফসকে গেল।'

—'ঠিকই শুনেছ। অসাধারণ লেখিকা। আমি ওঁর অনেকগুলো লেখা পড়েছি', স্বর্ণাভ আবার বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। সব পুরস্কারই যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে দেওয়া হয় না, বরং এর পিছনে অন্য কোনো কেমিস্ট্রি কাজ করে, তার রীতিমতো ইতিহাস, স্ট্যাটিসটিক্স, রাজনীতি সহ যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ দিয়েও ফেলল।

শুঁটকি ভাবলেশহীনভাবে গ্লাস শেষ করল। এটাই তার শেষ পেগ। আর এই কচকচি ভালো লাগছে না। কী কুক্ষণে যে বারে এসেছিল! এই লোকটার পাল্লায় পড়তে হবে জানলে বোধ হয় কষ্ট করেও নির্জলা থাকতে পারত!

গ্লাসটা ঠক করে টেবিলের ওপর রেখে দাঁড়াল সে। স্বর্ণাভর কাঁধে হাত রেখে নেশাজড়িত আন্তরিক গলায় বলে—'থ্যাঙ্কস ভাই। তোর কাছ থেকে অনেক তথ্য পেলাম। বলতে পারিস ঋদ্ধ হলাম। অনেস্টলি, স্পিকিং, ভর্না শ নামে কোনো মহিলা লেখালেখি করেন তা দশ মিনিট আগেও জানতাম না, বুকারের গপ্পো তো দূর! এটা জাস্ট

boierpathshala.blogspot.com

আমার বানানো একটা নাম। স্বর্ণাভ-র উলটো সংস্করণ। স্বর্ণাভ থেকে ভর্না শ। ভেবেছিলাম বোধহয় ওখানেই থামবি। কিন্তু তুই তো দেখছি মহিলার অনেকগুলো লেখাও পড়ে ফেলেছিস! কি আর বলব। ইউ আর রিয়েলি জিনিয়াস! এ ছেলে বাঁচলে হয়।'

কথাগুলো বলেই স্তম্ভিত স্বর্ণাভকে পিছনে ফেলে হনহন করে করে এগিয়ে গেল শুঁটকি। দরজার দিকে এগোতে এগোতেই শুনতে পেল স্বর্ণাভ বিড়বিড় করে বলছে —'শালা ঢ্যামনা।'

ফিচ করে হেসে ফেলল সে। লোকে রেগে গেলে তাকে 'ঢ্যামনা'ই কেন বলে কে জানে। নেশা নেশাও হয়েছিল তার। সেইজন্যই বোধহয় হাসিটা থামতেই চাইছে না। আপনমনেই ফিচফিচ করে হাসতে হাসতে শুঁটকি বারের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

—'স্যার।' দারোয়ান তাকে স্যালুট ঠুকতে সে পকেট থেকে একটা নোট বের করে তাকে দেয়। তার সন্ধানী চোখ তখন নিজের গাড়িটা খুঁজছে। সারি সারি গাড়ির মধ্যে স্টিল কালারের জেনটা কোথায়! এখানেই পার্ক করেছিল? না অন্য কোথাও? নাকি বেশি নেশা হয়ে গেছে, তাই নিজের গাড়িটাকেই খুঁজে পাচ্ছে না!

তার রকমসকম দেখে দারোয়ানের সন্দেহ হয়। সে একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলে—'স্যার, স্টিল কালারের জেনটা কি আপনার ছিল?'

—'হ্যাঁ আমারই।' কথাটা অন্যমনস্কভাবে বলেই চমকে ওঠে শুঁটকি—'ছিল মানে!'

—'আপনাকেই একটু আগে আমি খুঁজছিলাম স্যার। কিন্তু খুঁজে পাইনি।' দারোয়ান মাথা হেঁট করেছে—'আপনি নো পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করেছিলেন। তাই পুলিশের গাড়ি ওটাকে তুলে নিয়ে গেছে!'

কেউ যেন ধড়াম করে একটা মস্ত গদা তার মাথায় বসিয়ে দিল। কথাটা বুঝতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। কোনোমতে হতবিহ্বলভাবে বলে সে—'তুলে নিয়ে গেছে!'

—'হ্যাঁ...স্যার।'

—'হা-রা-ম-জা-দা!' শুঁটকি অদ্ভুত আক্রোশে ছুটে গেল বাইরের দিকে। মেইন রোডের ওপর দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পুলিশের উদ্দেশে অশ্রাব্য গালিগালাজ দিতে শুরু করল।

—'শালা, বাঞ্চোত...বোকাচোদা...তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোরা আমার গাড়িটাই পেয়েছিলি!...যতসব ভুঁড়িওয়ালা ঘুষখোরের দল...'

আরও কিছুক্ষণ শ-কার, ব-কার, ম-কারের বন্যা বইয়ে শেষ পর্যন্ত শান্ত হল শুঁটকি। গালাগালি দেওয়ার চোটে তার মুখে ফেনা জমে গেছে। আস্তে আস্তে উত্তেজনা প্রশমিত হয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্প করে যে বিশেষ লাভ নেই, দেরিতে হলেও একথা মাথায় ঢুকেছে। এখন সমস্যা একটাই। বাড়ি ফিরবে কী করে!

বাড়ির কথা মনে পড়তেই শুঁটকি নিজেকেই নিজে ভেংচি কাটে। বাড়ি কাকে বলে? ইট কাঠ পাথরের একটা নির্বোধ আশ্রয়। মাথার ওপর একটা ছাত আর চারদিকে মজবুত দেয়াল থাকলেই বাড়ি হল! আহা! বাড়ির কী ছিরি! অমন বাড়িতে ফেরার কী দরকার!

সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, আজ আর বাড়ি ফিরবে না। এখন রাত প্রায় পৌনে বারোটা। যানবাহন পাওয়া যাবে না। ট্যাক্সিগুলোও বসে থাকে রিফিউজ করার জন্যই।

অতএব আজ আর ঘরে ফেরা নয়। কলকাতার রাস্তাতেই ঘুরে বেড়ানো যাক।

boierpathshala.blogspot.com

ভাবতেই মনে বেশ রোমাঞ্চ হল তার। রহস্যে ডুবে থাকা কলকাতার পথঘাট। কল্লোলিনীর একদিকে হয়তো এত রাতেও আলোর উৎসব। এ শহর কখনও ঘুমোয় না। বরং শুঁটকির মনে হয় মটকা মেরে পড়ে থাকে। যখন মধ্যবিত্তের ঘরের আলো নেভে, তখনই অন্য কোথাও রহস্যময় আলো জ্বলে ওঠে। অপ্সরা-কিন্নরীর জমায়েত হয়,—স্বাভাবিক ভাবেই 'দেবতা ঘুমালে তাহাদের দিন, দেবতা জাগিলে তাহাদের রাতি'।

ইচ্ছে করলে গভীর রাতে রহস্যময় দিনটার খোঁজে যেতে পারত। কিন্তু 'অমলকান্তি'দের সবই উলটো। তাই পথের দিকেই পা বাড়াল সে।

মেইন রোড প্রায় শুনশান হয়ে এসেছে। দু-পাশের সারসার ল্যাম্পপোস্টের আলোর ঔজ্জ্বল্যও যেন খানিকটা ম্লান। পিচের রাস্তার ওপর পিছলে পড়ে ক্ষীণ আভা তৈরি করছে। একটা-দুটো ল্যাম্পপোস্ট আবার অন্ধ! আলোর সারির মধ্যে ফোকলা দাঁতের মতো তাদের ব্যঙ্গাত্মক উপস্থিতি।

ফুটপাথের ওপর চাদর বিছিয়ে ভিখিরিরা গভীর ঘুমে কাদা। হলুদ আলোর পিঙ্গল আভায় শায়িত যেন তামাটে মূর্তি। কেউ একা, কেউ বা সপরিবারে। একপাশে দুটো ছোটো ছোটো বাচ্চাকে নিয়ে বাচ্চাদের বাপ ঘুমন্ত। তুলনামূলক বড়োটা পাশে। একেবারে চুন্নুমুন্নুটা বুকে। পাশের শিশুটিকে বড়ো সযত্নে, সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় শুইয়েছে তার বাবা। যদি কোনো মদ্যপের বেসামাল গাড়ি কোনোভাবে ফুটপাথে উঠে পড়ে, তখন তার গাড়ির চাকা বাবার বুকেই আটকে যাবে।

শুঁটকি কখন যেন অজান্তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। নিদ্রিত পরিবারটির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন কান্না পেয়ে গেল। মাথার উপরে ছাত নেই। নেই নরম বিছানার ওম। তবু ঘুম আছে! ছাতওয়ালা, দেওয়াল যুক্ত চৌকানো বাক্সটা নেই। তবু বাড়ি আছে।

সে আরও অনেক কিছুই ভাবতে যাচ্ছিল। তার আগেই বুকপকেটের মোবাইল বেজে উঠেছে। শুঁটকি তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গেল। মোবাইলের শব্দে বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে যেতে পারে। প্রযুক্তির চিৎকারে সহৃদয় ঘুমের সর্বনাশ হোক, তা চায় না।

সেলফোনের ডিসপ্লেতে গহনের নাম!

—'বল।'

কলটা রিসিভ করতেই ও প্রান্তে বিষণ্ণ স্বর—'বিরক্ত করলাম না তো!'

—'ফ্যাট শালা!' শুঁটকি ঝাঁপিয়ে ওঠে—'প্রেমিকাকে ফোন করছিস নাকি! ওসব কার্টসি মেয়েদের দেখাস।'

গহন হেসে ফেলেন—'আর পালটালি না বাচ্চা'!

—'আমি পলিটিশিয়ান না গিরগিটি!' শুঁটকির পায়ের কাছে একটা কোল্ডড্রিংকের খালি বোতল পড়েছিল। সেটাতে একটা শট মেরে বলল সে—'তা ছাড়া তুই বা পালটেছিস কই? শালা যথারীতি এসকেপিস্ট। কঠিন বাস্তবের সামনে পড়লেই ন্যাজ তুলে চোঁ চা দৌড়! একদিকে লম্বা লম্বা দার্শনিক ডায়লগ ঝাড়ছিস 'সমালোচনা নাই, হ্যানো চাই, ত্যানো চাই, নইলে লিখতে পারছি না...।' অথচ উদমা ঝাড় খেলেই কুঁইকুঁই করতে করতে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন।

টেলিফোনের ও প্রান্তে গহন কতটা চমকে উঠলেন তা বোঝা গেল না। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে নিখাদ বিস্ময়—'তুই জানলি কী করে?'

boierpathshala.blogspot.com

—'মধ্যরাত্রে এমন 'বা-জে করুণ সুরে' মার্কা ভলিউম শুনলে জানার বাকি কি থাকে?' সে ভারী মজার খেলা পেয়েছে। গহনের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বোতলটা নিয়ে ফুটবল খেলছে। ফাঁকা বোতল কিক খেয়ে গড়গড় করে এগিয়ে গেল। পিছন পিছন এলোমেলো পায়ে শুঁটকি।

—'কুঁই কুঁই করছি না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন গহন—'কিন্তু এটা তো ঠিক, যে আমি কবিতা লিখতে পারছি না।'

—'কে বলল?' সে একটা লম্বা কিক মেরে বোতলটাকে সাইড করে— 'কেউ তো বলেনি যে ওটা কবিতা হয়নি। যদি বলতও তাহলেই বা কী হত? কোনটা কোনটা কবিতা নয়—তা ডিসাইড করার ধক সুপ্রিম কোর্টেরও নেই।'

—'তবু...।'

—'দ্যাখ গহন। তবু, যদির এখানে কোনো সিন নেই।' শুঁটকি বলল... 'কবিতা তুই লিখিস কি লিখিস না—সেটা এখানে বড়ো কোনো ইস্যু নয়। আসলে তোর কবিতাটা কাউকে স্পর্শ করতে পারেনি। ইনফ্যাক্ট কারুর ভালো লাগেনি। সেটাই তারা অনেস্টলি বলেছে। তোর যদি খারাপ লাগে, তবে ওটার পাশে 'গহন দত্তগুপ্ত' ট্যাগ লাগিয়ে মাঠে নামিয়ে দে। ঝুড়ি ঝুড়ি ভূরি ভূরি প্রশংসা পাবি।' সে হাসে—'তবে সেটা কবির নামের মাহাত্ম্য। কবিতার নয়।'

—'যারা আমার কবিতার সমালোচনা করছে তাদের কি আদৌ সে যোগ্যতা আছে শুঁটকি?' গহন উত্তেজিত—'এককথায় যে একটা কবিতাকে 'ঝুলস্য ঝুল' বলে দেয়—সে কতটা পড়াশোনা করেছে, আদৌ করেছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে কি কবিতার সমালোচনা করার যোগ্য?'

—'হয়তো যোগ্য, হয়তো নয়। তাতে কি এল গেল?' বলতে বলতেই সে খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

—'হাসছিস কেন?'

—'তোর ইগো দেখে।' হাসতে হাসতেই বলল শুঁটকি—'এত ইগো থাকলে ইগো ধুয়ে খা। 'সমালোচনা চাই—সমালোচনা চাই' বলে দেয়ালা করছিস কেন?'

—'শুঁটকি!'

—'শুনতে যতই খারাপ লাগুক, কথাটা সত্যি।' বোতলটাকে ট্যাকল করতে করতে সে বলে—'যাঁরা বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ এবং যোগ্যতম মানুষ—তাঁরা আদৌ কবিতার বই কিনে পড়েন না। এইসব অযোগ্য, নির্বোধ লোকগুলোই কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে ভিড় করে তোর কবিতার বই কেনে। এই লোকগুলোর জন্যই তোর ঘরে মোটা রয়্যালটি আসে। বই বেস্ট সেলার্সের লিস্টে জায়গা পায়। যাদের তুই সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় ভাবিস, সেই লোকগুলোই আসলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। কবিতার টেকনিক্যাল চুলচেরা বিশ্লেষণ করে হাড়, মাংস, কঙ্কাল ঘেঁটে ঘেঁটে আঁতলেমি করার ক্ষমতা হয়তো তাদের নেই। কিন্তু অনুভব তারাই বেশি করে। টেকনিক্যাল নয়, কবিতার নিটোল সার্বিক আবেদনটাই তাদের কাছে বড়ো কথা।'

ও প্রান্তে গহন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তাঁর নীরবতার কারণ বুঝতে পারল শুঁটকি। মুচকি হেসে বলে—'তোর ধারণা ঠিক। আমিও আছি ওই আকাট মুখ্যু লোকগুলোর দলে। তোর কবিতাটাও পড়েছি। মাইরি বলছি, 'ঝুলস্য ঝুল' একদম পারফেক্ট বিশ্লেষণ।'

boierpathshala.blogspot.com

কবির কণ্ঠস্বর সন্দিগ্ধ—'কী নামে আছিস?'

—'সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।'

তিনি বিরক্তিতিক্ত কণ্ঠস্বরে বলেন—'আর এখানে কবিতা দিতে ইচ্ছে করছে না। কে—কোথাকার একটা 'রামহনু' ফের এসে লিখে দিয়ে যাবে 'ঝুলস্য ঝুল কবিতা'।

—'কেন লিখবে? 'রামহনু'র তোর সঙ্গে কোনো পার্সোনাল ক্ষার নেই। তাহলে সে খামোখা কথায় কথায় বাজে মন্তব্য করবে কেন? ভালো লিখলে ভালো কমেন্টই দেবে। অবশ্য সত্যিই যদি তুই 'ঝুলস্য ঝুল' লিখিস তাহলে আর কী করা!'

বোতলটাকে একটু দূরপাল্লার শট মারতেই সেটা ড্রেনে গিয়ে পড়ল। হতাশ হল শুঁটকি। যাঃ...এমন মজাদার খেলাটা ভেস্তে গেল!

—'তুই কচি খোকাটি নোস। সমালোচনা, চ্যালেঞ্জ চেয়েছিলি, পেয়েছিস। যদি চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার সাহস না থাকে তাহলে বৃথা কান্নাকাটি কেন?'

—'কীসের চ্যালেঞ্জ?'

—''নো ওয়ান' থেকে 'বেস্ট ওয়ান' হওয়ার চ্যালেঞ্জ। 'ঝুলস্য ঝুল' থেকে 'কুলস্য কুল' হওয়ার চ্যালেঞ্জ। যেটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে করেছিস, সেই লড়াইটাই একটা ছোটো জায়গায় করতে হবে।' সে হাসল—'মাস্টার্সে ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট পাওয়ার পর যদি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে ভয় করে, তবে তুই কোথাকার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট? আর কেনই-বা তুই গহন দত্তগুপ্ত? গঙ্গু তেলি আর তোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'

বলতে বলতে এবার হঠাৎই বিরক্ত হয়ে বলল সে—'শোন, আমি এখন রাস্তায় হাঁটছি। জব্বর হিসি পেয়েছে। আর চাপতে পারছি না। ছাড়ছি।'

লাইনটা কেটে গেল। শুঁটকি একটু এদিক-ওদিক দেখে নেয়। আশপাশে কেউ নেই। রাস্তার পাশে একটা গাছের তলায় হালকা হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল সে। লোকে দেখলে খিস্তি দেবে। পুলিশ দেখলে রুল উঁচিয়ে তাড়া করবে। কিন্তু অন্যায় কি করছে? গাছের গোড়ায় সামান্য ইউরিয়াই তো ঢালছে। তেমন হলে কালকে না হয় এখানে আরও একটা গাছের চারা লাগিয়ে যাবে।

—'অ্যাই শালা!'

পিছনে একটা বাইকের শব্দ। আর পরক্ষণেই একটা চাপা অথচ রূঢ় স্বর শুনে ঘাবড়ে গেল শুঁটকি। পুলিশে ধরল নাকি! এত রাত্রেও ব্যাটারা চরে বেড়াচ্ছে!

সে পিছনে তাকায়। পুলিশ নয়, দুটো ছেলে। মুখ কালোকাপড়ে বাঁধা। একটার হাতে উদ্যত ভোজালি। বিদ্যুতের মতো সামনে এসে তার গলায় ঠেকিয়ে বলল—'একদম চিল্লামিল্লি নয়। লোচা করলেই এই চিকনি তোর গলা কাটবে! দামি জিনিস সঙ্গে যা যা আছে সব দে।'

ও! পুলিশ নয়! বরং উলটোটাই। যাক তাহলে ভয়ের কিছু নেই। শুঁটকি বিনাবাক্যব্যয়ে ওয়ালেটটা এগিয়ে দিল। দ্বিতীয় ছেলেটা এবার এগিয়ে এসে সেটা কেড়ে নিয়েছে। আস্তে আস্তে হাতের ঘড়ি, সোনার আংটি, সোনার চেন, দামি মোবাইল সবই শান্তভাবে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিল সে। ছেলেদুটো বোধহয় এরকম ঝামেলাহীন শান্তিময় সহযোগিতা অপর পক্ষের কাছ থেকে আশা করেনি। যে ভোজালি ধরেছিল সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অস্ত্রটা নামিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় ছেলেটাও অবাক!

boierpathshala.blogspot.com

সমস্ত দামি দামি জিনিস হস্তান্তরিত করে এবার হঠাৎই শার্ট খুলতে শুরু করেছে সে।

—'আবে-শালা...কী করছিস...?'

ছেলেদুটো হতভম্ব! শুঁটকি শান্তভাবেই বলে—'কেন? তোমরাই তো বললে দামি জিনিস সঙ্গে যা যা আছে সব দিতে।'

বলতে বলতেই প্যান্টও খুলে ফেলেছে—'সব দামি জিনিস তো দিতে পারব না। যেটুকু দিতে পারি দিলাম। নাও।'

ছেলেদুটো তখনও স্তম্ভিত। তাদের অবস্থা দেখে করুণা হল তার। সে আকাশের দিকে তাকিয়েছে—'যে স্বপ্নটা আমি একদিন রেখে যাব ভাবছি সেটাই সবচেয়ে দামি...সেটা তো দিতে পারব না ভাই। তার চেয়ে বরং আমার জুতোদুটো, গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যারটাও...।'

—'সানকি মাল!...পুরো সানকি!'

বলতে বলতেই প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মেরেছে ছেলেদুটো। বাইকে স্টার্ট দিতে দিতেই দেখল, পাগল লোকটা ইতিমধ্যেই জুতো আর গেঞ্জিও খুলে ফেলেছে!

—'...শালা ফুলটু স্ক্রু ঢিলা...।'

বাইকটা হুশ করে বেরিয়ে গেল। এমন করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল যেন একটা ভয়াবহ ডাইনোসর তাদের তাড়া করেছে।

ফুটপাথবাসী দুটি বাচ্চার বাপ সেদিন মধ্যরাত্রে আচমকা ঠ্যালা খেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে বসল। বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে দেখল একটা কালো সিড়িঙ্গে চেহারার লোক শুধু একটা আন্ডারওয়্যার পরে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে বিলিতি মদের গন্ধ। সদ্য ঘুমভাঙা অবস্থায় এটা স্বপ্ন না বাস্তব বোঝার আগেই সে শুনতে পেল একটা কুণ্ঠিত স্বর। লোকটা সংকুচিতভাবে বলছে—

—'তোমাদের পাশে একটু শোওয়ার জায়গা হবে ভাই?'

'কবিতা ডট কম' আজ সকাল থেকেই সরগরম! এককথায় বলতে গেলে রীতিমতো বাওয়াল শুরু হয়েছে এখানে! ঘটনাটা আর কিছুই নয়। মগনলাল নামের এক কবি ভয়াবহ একটা কবিতা পোস্ট করেছেন। আর সেটা—নিয়েই শুরু হয়েছে টানাহ্যাঁচড়া।

কবিতাটা অনেকটা এইরকম—

পাহাড়ের মাথা থেকে

জংলি বাইসনের নিতম্ব বারান্দায়—মস্তিষ্কে বরফ প্রলেপ!

জরায়ু যখন হেঁটে বেড়ায়, তখন

নগ্নতার একশো কুড়ি ডেসিবেলকে ঘৃণা করি।

যে যৌনরমণী ঘুমন্ত পুরুষের দণ্ডটি নেড়েচেড়ে

দেখেছিল, শান্তিনিকেতনে তার ভিতরের উষ্ণতারস পাইনি।

এখন শুধুই আঙুলে টিপে মারি অসহ্য উকুন!

আর দিনগত পাপক্ষয়।

boierpathshala.blogspot.com

এখানেই বিতর্ক ও চাপানউতোরের শুরু।

থ্রেডের প্রথম কমেন্টটাই 'ফাস্টু কবি'র। সে লিখেছে—'দাদা, আপনি মগনলাল না নগনলাল? কবিতাটা যে বুঝেছি তা বলতে পারছি না। কিন্তু কবিতা কাকে বলে তাও বেমালুম ভুলে গেছি।'

ঠিক তারপরেই 'আকাশনীলের' ফোড়ন—'হায় কবিতা কাহারে কয়?/সে কি শুধুই যৌনতাময়?'

'মুমতাজ' বেশ সরল সাদাসিধে মিষ্টি পাঠিকা। সে বেচারি বলেই ফেলেছিল—'কবিতাটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কেউ বুঝিয়ে দেবেন?'

তার উত্তরেই 'কুবলাশ্ব'র বিস্ফোরক ভাবসম্প্রসারণ। সে বিশেষ অন্যায় কিছু করেনি। শুধু 'মুমতাজ'কে কবিতাটা বুঝিয়ে বলেছে।

অনেক ভেবেচিন্তে নিজের মতো করে যা মানে বের করেছে তা অনেকটা এইরকম—

কবি পাহাড়ের মাথায় থাকা একটি সমকামী বাইসনকে নিজের প্রেমিকারূপে কল্পনা করেছেন। সেই সমকামী বাইসনের নিতম্বকে বারান্দা ভেবে তিনি বোধহয় পায়চারি করতে গিয়েছিলেন। সেইজন্য বাইসনটা খেপে গেছে। তাই পাহাড়ি লোকেরা তার মাথায় বরফের প্রলেপ দিয়ে রেখেছে, যাতে মাথা ঠান্ডা থাকে এবং কাউকে গুঁতিয়েও না দিতে পারে।

যেহেতু বাইসনটা সমকামী, সেহেতু তার জরায়ু থাকা-না-থাকা দুই-ই সমান। অগত্যা বিরক্ত হয়ে জরায়ুটা একা-একাই ইভনিং ওয়াকে বেরিয়েছে। বাইসনটা নগ্ন ছিল। স্বাভাবিক! তাকে জামাকাপড় বা মোজা কে পরাবে? সে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে একশো কুড়ি ডেসিবেলে গাঁ গাঁ করে জরায়ুকে ডাকছে। সেই ডাক কবির অসহ্য ঠেকছে।

সেই চিৎকার শুনতে শুনতেই তিনি বাইসনটিকে প্রেমিকার মতো করে কল্পনা করেছেন। যে মেয়েটি কবি ঘুমিয়ে পড়লে তার দাদুর লাঠিটা নেড়েচেড়ে দেখত এবং ভাবত, সেটা দিয়ে বাড়ি মারলে কবির মাথার ভিতরের জিনিসপত্তর বাইরে আসবে কিনা! আর এইরকম গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে বলত—'আমি পেপসি খাব...পেপসি খাব।' একেই কোল্ডড্রিংক তার ওপর বরফের প্রলেপ! তাই তার ভেতরে উষ্ণতারস পাননি কবি। অগত্যা তিনি মাথার উকুন বেছে বেছে মারছেন। অর্থাৎ টাইম পাস করছেন, যার এক্সপ্রেশন শেষ লাইনটা—'আর দিনগত পাপক্ষয়'।

কবিতাটা ভয়ংকর নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার ভাবসম্প্রসারণটা আরও ভয়াবহ। মন্দার অনুভব করল 'কুবলাশ্ব'-কে সে মনে মনে পছন্দ করতে শুরু করেছে। লোকটার এলেম আছে। এই কবিতাটার এমন ভয়ংকর ব্যাখ্যা বোধহয় একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব!

বলাই বাহুল্য মগনলালের সেটা বিশেষ পছন্দ হয়নি। সে এতক্ষণ অন্যান্য পাঠক ও কবিদের মন্তব্য কোনোরকমে দাঁতে দাঁত চেপে হজম করছিল। কিন্তু এবার আর সহ্য হল না। সে চটে গিয়ে দশটা বেজে তিন মিনিটে মন্তব্য করল—'আপনি আমাকে অপমান করছেন।'

কুবলাশ্ব'র উত্তর দশটা বেজে চার মিনিটেই কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে—'আপনি কবিতার অপমান করেছেন।'

—'মানে?'

boierpathshala.blogspot.com

—'এরকম আপাদমস্তক হিজিবিজিকে আপনি কবিতা বলেন?'

—'আমি যা-ই বলি। আমার কবিতার এরকম বিকৃত অর্থ করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? এ তো কবির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ! কবির অপমান!'

কুবলাশ্ব একটা বত্রিশপাটি বার করা স্মাইলি দিল।

—'আমি যদি বিকৃত অর্থ করে থাকি তবে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। মুমতাজ কবিতার অর্থ জানতে চেয়েছেন। আপনি যদি স্বয়ং কবিতাটির অর্থ জানিয়ে দেন তবে বাধিত হই।'

'মগনলাল একটু থতোমতো খেয়ে গিয়ে উত্তর দেয়—'কবিতার কোনো মানে হয় না। কবিতা বোঝার জিনিস নয়, বাজার জিনিস।'

—'সে আবার কী! কবিতা কি হারমোনিয়াম না—পাখোয়াজ, যে বাজবে! তা ছাড়া যখন লিখেছিলেন তখন নিশ্চয়ই কিছু ভেবে লিখেছেন। কী ভেবে লিখেছেন সেটাই অন্তত শুনি। ছাত্রবন্ধু লিখতে বলছি না। শুধু একটু ক্লু হলেই চলবে।'

দিব্যি 'ওয়ান-টু-ওয়ান' তর্ক চলছিল। কিন্তু এর মধ্যে আবার স্বর্ণাভ গুপ্ত এসে টপকে পড়লেন। ইনি স্বনামেই লেখেন।

বুকনির চোটে টেকাই যায় না। সামনা-সামনি কখনও না-দেখলেও স্বভাব- চরিত্র বুঝতে বাকি নেই মন্দারের। কথায় কথায় বাতেলা দেওয়াই তার স্বভাব। কিছু মানুষ আছে যারা 'দেখ আমি কত জানি' গোছের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বেড়ায়। স্বর্ণাভ গুপ্ত তাদের মধ্যে অন্যতম।

তিনি বোধহয় এতক্ষণ গোটা ব্যাপারটাই দেখছিলেন। এবার উড়ে এসে জুড়ে বসে গ্রাম্ভারি মন্তব্য করলেন—'তার আগে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক। কবিতা আসলে কার? কবির না পাঠকের?'

এরকম আলটপকা দার্শনিক মন্তব্যে ব্যোমকে গেল মন্দার। সে এতক্ষণ এই বিতর্কে কোনোভাবেই যোগদান করেনি। শুধু চুপ করে তামাশা দেখছিল। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় সেটাই দ্রষ্টব্য।

কুবলাশ্বও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তার সপাট উত্তর—'কবিতা ততক্ষণ কবির, যতক্ষণ না সেটা পাঠকের দরবারে আসছে। মগনলাল যদি তাঁর কবিতাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে চালাতে চান, তবে খাতায় ভরে রাখলেই পারেন। অনলাইনে পোস্ট করার দরকার কী? যে মুহূর্তে ওটা পোস্ট হয়েছে, সেই মুহূর্তেই পাঠকও কবিতাটার সঙ্গে ইনভলভড হয়ে গেছে। এখন তাদের বক্তব্যও কবিকে শুনতে হবে বই-কি!'

—'কাদের বক্তব্য? কোন পাঠকের? কবিতা অনুভবী ও শিক্ষিত পাঠকের জন্য। যারা কবিতার মানে জানতে চায় এমন লে-ম্যানদের জন্য নয়।'

পুরোপুরি 'বিলো দ্য বেল্ট' আক্রমণ। এতক্ষণ কবিতাটা নিয়েই কথা চলছিল। এবার স্বর্ণাভ গুপ্ত তর্কটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। উনি প্রায়শই এরকম করে থাকেন। আসলে ভদ্রলোক কবিতার চেয়ে লবিবাজিটাই বেশি পছন্দ করেন।

নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। কবিতার অন-লাইন সাইট হলেও এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে এখানে লবিবাজি নামক বস্তুটি অনুপস্থিত! বরং প্রিন্টেড মিডিয়ার থেকে এখানে খামচাখামচি আরও বেশি। প্রকাশ্য জগতে মানুষগুলোকে চোখে দেখা যায়।

boierpathshala.blogspot.com

তাই চক্ষুলজ্জাও থাকে। এখানে সেসব বালাই নেই। ছদ্মনামের আড়ালে তাই চামচাগিরি, লবিবাজি, লেঙ্গি মারামারির প্রবল সুযোগ। যাঁরা প্রিন্টেড মিডিয়ায় বিশেষ কলকে-টলকে পান না, তাঁরাই এখানে বাঘ সেজে বসে থাকেন। আর সেইসব মহান দাদাদের গুণধর ভাই-বোনেরা পদলেহন শিল্পে কামসূত্রকেও টেক্কা দেয়।

আর লবিরও কী রকমফের! প্রবীণ কবি—নবিশ কবি, মহিলা কবি—পুরুষ কবি, শিক্ষিত কবি—অশিক্ষিত কবি। দাড়িওয়ালা কবি—দাড়ি ছাড়া কবি, প্রেমিক কবি—ব্যর্থপ্রেমিক কবি...উফফ! কবির থেকেও বোধহয় লবির সংখ্যা বেশি!

সেক্ষেত্রে মগনলালের হয়ে স্বর্ণাভ গুপ্ত মাঠে নামবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে। মগনলাল স্বর্ণাভ-র খাস চামচা। পরস্পরের পিঠ চুলকানো আর সাবাশি দেওয়াই ওদের কাজ। মন্দার জানে এবার খেলা জমে যাবে। স্বর্ণাভ-র অ্যান্টিলবি আকাশনীলও ঢাল-তরোয়াল নিয়ে মাঠে নামল বলে। থ্রেডে পোস্টের সংখ্যা কয়েকশো ছাড়িয়ে যাবে। দিন গড়িয়ে রাত হয়ে যাবে। তবু মারপিট থামবে না। 'আমি তোর থেকে বড়ো কবি ঢিসুম' 'আমি তোর থেকে বেশি শিক্ষিত কবি গুদুম'...এই চলবে।

মন্দার এতকিছু ভাবতে ভাবতেই দেখল কুবলাশ্ব উত্তর দিয়ে দিয়েছে। পেজটা রিফ্রেশ করতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠল তার জোরালো জবাব—'তাই নাকি? কিন্তু দাদা, কয়েকদিন আগেও তো আপনি এইসব লে-ম্যানদের জন্যই লিখেছেন। প্রশংসাও পেয়েছেন। ইনফ্যাক্ট, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাও আমরা অল্পবিস্তর বুঝতে পারি। তাহলে উক্ত কবিরাও লে-ম্যানদের জন্যই কবিতা লিখেছেন! সেক্ষেত্রে কী প্রমাণিত হয়? হয় মগনলাল তাঁদের থেকেও বড়ো কবি! নয় আস্ত একটি গাম্বাট অপদার্থ!'

পুরো বাউন্সার! কুবলাশ্ব মেয়ে হলে বোধহয় তার প্রেমে পড়ত মন্দার। এই মুহূর্তে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। একদম উপযুক্ত জবাব দিয়েছে ব্যাটা। কিন্তু একা কতক্ষণ যুদ্ধ করবে? কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বর্ণাভ-র লবির লোকেরা হুড়মুড় করে এসে পড়ল বলে। কতজনের সঙ্গে তর্ক করবে কুবলাশ্ব!

সে ভাবছিল কুবলাশ্বকে ব্যাক-আপ দেওয়ার জন্য 'রামহনু' হয়ে মাঠে নেমে পড়বে কিনা। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল।

আর্ট ডাইরেক্টর শাশ্বত মুখখানা পুরো ট্রাকের তলায় চাপা পড়া প্লাস্টিকের ঠোঙার মতো করে এসে বলল—'তুই এখানে বসে খুটখুট করে ল্যাপটপে কবিতা মারাচ্ছিস! ওদিকে হারামি পেন্ডুলাম ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছে।'

মন্দারের চোখের সামনে সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। একটা কালো বাইসন একশো কুড়ি ডেসিবেলে গাঁক গাঁক করে ডাকছে!

সে ল্যাপটপ অফ করে ব্যাগের মধ্যে ভরে রাখল। ওয়্যারলেস কানেকশনের মোডেমটাও যথাস্থানে চলে গেছে। ধীরেসুস্থে ব্যাগ গুছিয়ে বলে—'চ্যাঁচাচ্ছে কেন? পুরো সিন তো কমপ্লিট করে দিয়েছি।'

—'গাঁড় মারা গেছে সিনের!' শাশ্বত বিরক্ত—'গোটা সিন ফের পালটাতে হবে। এক্ষুনি চল। শুয়োরের বাচ্চা কানের মাথা খেয়ে ফেলেছে। ওই তো বালের গপ্পো লেখে! তার কী রোয়াব!'

মন্দার লক্ষ করে দেখেছে, এখানে কেউ খিস্তি না দিয়ে কথা বলতে পারে না। এত খিস্তি দেওয়ার কি আছে! শালীন ভঙ্গিতে কথা বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়!

boierpathshala.blogspot.com

গালাগালি খেয়ে এখানকার লোকেদেরও এমন অভ্যাস হয়েছে যে ভালো কথা ওদের পোষায় না। একবার এক স্পটবয়কে বলেছিল—'ভাই, একটু চা হবে?'

তার পরিপ্রেক্ষিতেই স্পটবয়টির উত্তর—'শান্তিনিকেতনি মাল নাকি!'

—'আমাদের কি লাইফ বল।' শাশ্বত আপশোশের সঙ্গে বলে—'শালা সব ঝাড়খন্ডি মাল। দিনরাত ঝাড় খেয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে মরছি। বাপের বড়ো মিষ্টির দোকান আছে শ্যামবাজারে। মাঝেমধ্যে ভাবি সব ছেড়েছুড়ে মিষ্টির দোকানেই বসি। এই ঢ্যামনাগুলোর খিস্তি খাওয়ার চেয়ে বরং বাপের ঝাড় হজম করা সহজ।'

মন্দার তার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার বাবা আবার ব্যাংকের ম্যানেজার। মিষ্টি দোকানও নেই যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দোকানে বসবে! অগত্যা ঝাড় খাওয়াই তার কপালে আছে।

সেটের ভেতরে পেন্ডুলাম সত্যিই একটা খ্যাপা বাইসনের মতো ভোঁস ভোঁস করে যথারীতি ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকতে বেঁকতে পায়চারি করছিল। দেখে মনে হল ওর নিতম্বে ও মস্তিষ্কে বরফ ঘষা দরকার। তাকে দেখেই এমন লাফিয়ে উঠল যেন পাছায় পিন ফুটেছে।

—'এই যে ক্যালানে কার্তিক!' স্ক্রিপ্ট-এর গোছাটা তার দিকে প্রায় ছুড়ে দিয়েছে পান্ডাদা—এটা কী লিখেছিস শুয়োরের বাচ্চা? মাত্র একটা চুমু খেয়েই সেকেন্ড ভিলেন মরে যাবে। এটা স্ক্রিপ্ট না আমার শ্রাদ্ধ?'

পেন্ডুলামের পাশেই বসেছিলেন সিরিয়ালের ডিরেক্টর আশুদা। তিনি অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা মাথার মানুষ। সামান্য মাথা নেড়ে বললেন—'মরার আগে অন্তত দু-মিনিটের ফুটেজ লাগবে। একটা চুমুতে দশ সেকেন্ডও কাটবে না। স্ক্রিপ্টে আরও একটা-দুটো সেক্সি সিকোয়েন্স নামিয়ে দে। অন্তত অল্পস্বল্প আদর-টাদর, অল্প ফস্টিনস্টি।'

মন্দার আড়চোখে দেখল, সেটে সুইমিং কস্টিউম পরে ভিজে গায়ে টাওয়েল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বপ্নসুন্দরী উশ্রী। সেকেন্ড ভিলেন শুভাশিস সুইমিং পুলের পাশে পায়চারি করছে। সিকোয়েন্সটা বেশ উত্তেজক। সেকেন্ড ভিলেন নায়িকাকে এক্সপ্লয়েট করার প্ল্যান করে তাকে নিজের বাগানবাড়িতে এনেছে। কিন্তু নায়িকা আগেই সে প্ল্যানের কথা জেনে যায়। তাই সুইমিংপুলে নামার আগে কায়দা করে ভিলেনের মদের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। তারপর নায়িকাকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়ে সে মরে যাবে।

এই তো সিন! একেবারে জলের মতো সহজ। কিন্তু সেখানেও ঝামেলা। মরার আগে দু-মিনিটের ফুটেজ চাই!

সে পেন্ডুলামের দিকে তাকায়—'কিন্তু পান্ডাদা দু-মিনিট কোথা দিয়ে আসবে?'

পেন্ডুলাম খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল—'সেটাও আমি বলব পাগলা...।' ফের একটা গালাগালি। মন্দারের কান-মাথা ধ্বক করে গরম হয়ে ওঠে। তবু সে শান্ত গলায় বলে —'আরে, কি বিষ দিয়েছ সেটা তো আগে দেখবে! পটাশিয়াম সায়ানাইডের একটা আস্ত অ্যাম্পুল! আমি তো তবু চুমু খাইয়েছি! লোকে তো পটাশিয়াম সায়ানাইড জিভে ঠেকিয়ে খাবি খাওয়ারও সময় পায় না! সেখানে দু-তিনটে চুমু! ইম্পসিবল!'

—'হোয়াট ইম্পসিবল!' পেন্ডুলাম আরও জোরে চ্যাঁচাচ্ছে—'তোকে কি ফরেনসিক সায়েন্সের ক্লাস নিতে বলা হয়েছে গান্ডু? আরও দু-মিনিটের ফুটেজ না হলে চলবে না, ব্যস!'

boierpathshala.blogspot.com

কী আশ্চর্য! পটাশিয়াম সায়ানাইডের একটা গোটা অ্যাম্পুল খাওয়ার পরও দু-মিনিট বাঁচতে হবে লোকটাকে! সেকেন্ড ভিলেন তো অগস্ত্য মুনি নয়, যে ইল্বল-বাতাপি-পটাশিয়াম সায়ানাইড, সব হজম করে মেরে দেবে!

কিন্তু সে কথা পেন্ডুলামকে কে বোঝাবে? সে প্রায় হিড়িম্বা নৃত্য করতে লেগেছে —'বাস্তব-অবাস্তব বুঝি না! মেগা সিরিয়ালে বাস্তব বলে কিছু নেই। যদি বাস্তব কিছু থাকে তা হল ওই দু-মিনিটের ফুটেজ আর তিনটে চুমু। যদি পারিস তো করে দে। না পারিস তো কবি হয়ে পেছন মারা!'

শেষ কথাটা শুনে সেটের সকলেই কেমন তাচ্ছিল্যভরা হাসি হেসে উঠল। উশ্রীও কেমন গায়ে জ্বালা ধারানো হাসি হাসছে! রাগে-ক্ষোভে মন্দারের চোখে এই প্রথম জল এসে পড়ল। উশ্রী অমন ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসছে কেন? সে কি কবিতা পড়ে না? একজন কবি যে একজন স্ক্রিপ্ট-রাইটারের চেয়ে বেশি মর্যাদার পাত্র তা কি সে বোঝে না!

—'আর শোন', পান্ডা খরখরে গলায় যোগ করে—'নায়িকার মাকে কিছুদিনের জন্য কাশী, গয়া বা হরিদ্বারে পাঠিয়ে দে। নেক্সট সিনে উশ্রীর মুখে ডায়লগ থাকবে—'মা কয়েকদিনের জন্য হরিদ্বারে গেছে'—বুঝেছিস?'

মন্দার মাথা নীচু করে চোখের জল আড়াল করেছে। কোনোমতে মাথা নাড়ল।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জাভেদ একবার ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করে—'তা কী করে হয় দাদা! তাহলে তো শুরুর এপিসোডগুলোর সঙ্গে কন্টিনিউইটি থাকছে না! শুরু থেকেই দেখানো হচ্ছে যে নায়িকার মা, আই মিন বৈজয়ন্তীদি দস্তুর মতো জাঁদরেল ও আধুনিকা। তিনি স্লিভলেস পিঠকাটা ব্লাউজ, শিফনের শাড়ি পরেন। বব কাট চুল। মদ, সিগারেট খান, পার্টিতে নাইট ক্লাবে যান। যিনি এমন আধুনিকা, তিনি কাশী, গয়া বা হরিদ্বারে মরতে যাবেন কেন?'

—'কেন? মানুষের মনের কি পরিবর্তন হয় না?' পেন্ডুলাম জাভেদকে এক রামধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে—'আর যদি পরিবর্তন না হয় তবে নায়িকার মায়ের রোলটা কি তুই করবি? বৈজয়ন্তীদির চিকুনগুনিয়া হয়েছে জানিস না? শুটিংয়ে আসবেন কী করে?'

পাশ থেকে কে একজন ফোড়ন কাটল—'তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দামানে পাঠিয়ে দাও না দাদা। এক্কেবারে দ্বীপান্তর।'

সকলে আর-একবার গা জ্বালানো হাসি হেসে ওঠে। মন্দার মাথা নীচু করে ভাবছিল, কী নির্বোধ এরা! নির্বুদ্ধিতার কি শেষ নেই?

সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। উশ্রী এমন বোকার মতো হাসছে কেন? ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে কি সে-ও অনুভূতিহীন নির্বোধে পরিণত হয়েছে!

আর থাকতে পারল না মন্দার। স্টুডিয়োর টয়লেটে ঢুকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। এখানে কী করছে সে? কতগুলো নিম্নমেধার লোকের ভিড়ে তার অবস্থান কোথায়? তার কাজ কি শুধু এই গালিগালাজগুলো খেয়ে, পাতার-পর-পাতা অর্থহীন মেলোড্রামা লিখে যাওয়া! এই জন্যই জন্মেছিল মন্দার! এই করেই মরবে!

হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল বাবার বলা কঠিন শব্দগুলো—'সাহিত্য পড়ে কোন রাজকার্যটা করবি? কবিতা লিখে কি পেট ভরবে! বাপের হোটেল চিরকাল খোলা থাকবে না চাঁদু! এটাই বাস্তব!'

boierpathshala.blogspot.com

সত্যিই কবি হয়ে পেট ভরানো যায় না। বিয়ে করা যায় না উশ্রীর মতন মেয়েকেও। সেইজন্যই তো এত কষ্ট সহ্য করেও এখানে টিকে আছে। আস্তে আস্তে পয়সা জমিয়ে দামি দামি গিফট দিয়েছে উশ্রীকে। কখনও জুয়েলারি, কখনও ফ্রেঞ্চ পারফিউম, কখনও বা দামি লেডিস হ্যান্ডব্যাগ। উশ্রী লাজুক মুখে সেগুলো নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে মোহিনী হাসি। ওই হাসিটা দেখার জন্য বহুবার মরতে পারে সে!

আস্তে আস্তে মন্দার চোখের জল মুছে ফেলল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। নাঃ, টিকে থাকতেই হবে। এগারোশো স্কোয়্যার ফিটের একটা ঝকঝকে ফ্ল্যাট, একটা গাড়ি, কিছু ব্যাংক ব্যালেন্স—আর উশ্রী। সবকটা পেতে হলে লেগে থাকতেই হবে।

সে চোখমুখে জল দিয়ে এসে বসল চেয়ারে। এখন মনটা অনেকটা শান্ত। স্ক্রিপ্টের গোছাটা নিয়ে দু-তিনটে চুমুর সিকোয়েন্স আর গোটা কয়েক ডায়লগ বসাতে যাবে, এমন সময় একটা মেয়েলি গোলগাল হাত সামনে এসে পড়ল। হাতে ধরা একটা রুমাল।

—'ছেলেদের কাঁদলে ভালো লাগে না।' একটা মিষ্টি রিনরিনে স্বর বলে ওঠে —'আপনার চোখে এখনও জল লেগে আছে। মুছে নিন।'

মন্দার অবাক হয়ে পিছনে তাকায়। উশ্রীর বোন ঊর্মি ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। এই মেয়েটিকে রোজই দেখে। দিদির সঙ্গে শুটিংয়ে আসে। বোধহয় দিদিকে পাহারা দেয়। শুটিং চলাকালীন সবসময়ই গম্ভীর মুখে ল্যাপটপে খুটুর খুটুর করে কী যেন করে।

কোনোদিন মেয়েটাকে ভালো করে দেখেনি। আজ দেখে মনে হল, ঊর্মি উশ্রীর বোন হতেই পারে না। দুই বোনের চেহারায় আকাশপাতাল তফাত। উশ্রী তন্বী, সুন্দরী। চোখে সবসময়ই দুষ্টুমি চিকমিক করছে। কালো কুচকুচে ঘন ভুরুর নানা বিভঙ্গে, লম্বা চুল ঝাপটে, ছেলেমানুষি হাবেভাবে পুরুষের বুকে ঝড় তোলে। নিজেকে কী করে মোহিনী সাজিয়ে তুলতে হয় তা সে জানে। সেইরকমই আউটফিট পরে।

তুলনায় ঊর্মি বেশ খানিকটা মোটাসোটা। এমন ঢিলেঢালা একটা সালোয়ার সুট পরে আছে যে হাঁটলেই মনে হয় থলির ভেতরে বিড়াল লাফাচ্ছে। সম্পূর্ণ প্রসাধনহীন মুখ। শান্ত চোখ। একখানা দিদিমণি মার্কা চশমা নাকের ওপর। মোটা ফ্রেমের দৌলতে ভুরু দেখাই যায় না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সে সবসময়ই মাথায় একটা ওড়না পরে থাকে।

—'আমি কাঁদছি না।' মন্দার প্রতিবাদ করে—'চোখে জলের ঝাপটা দিয়েছি।'

ঊর্মি মুচকি হাসল। তারপর রুমালটা তার দিকে এগিয়ে দেয়। সে বুঝতে পারে এ মেয়ে একটু আলাদা। এর চোখে ধুলো দেওয়া মুশকিল।

—'কবিতা-টবিতা লেখা হয়?'

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে থমকে গেল মন্দার।

—'আপনাকে কে বলল?'

—'আমি একটু আগেই সেটের ভেতরে ছিলাম।'

ওই একটা বাক্যেই সবকথা বলা হয়ে গেল। মন্দার মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

—'এখানে এসে একজন কবির দেখা পাব ভাবিনি।' ঊর্মির কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রম ও সহানুভূতি।

—'কোথায় লেখেন?'

boierpathshala.blogspot.com

—'বেশ কয়েকটা লিটল ম্যাগাজিনে।' ঊর্মির সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছিল। এই মেয়েটা হয়তো কবিতার মর্ম বোঝে। অন্যদের মতো অনুভূতিহীন নয়। বরং বেশ সহৃদয়। সে মৃদু স্বরে বলল—'একটা ওয়েবসাইটেও লিখি।'

—'ওয়েবসাইট! ইন্টাররেস্টিং।' ঊর্মির চোখে কৌতূহল—'কোন ওয়েবসাইট?'

—'কবিতা ডট কম।' সে রুমালটা ফেরত দিয়ে বলল—'ওখানে অবশ্য ছদ্মনামে কবিতা দিই।'

—'ছদ্মনাম। কীরকম?'

মন্দার এবার সামান্য হাসে—'নামটা মোটেও শোনার মতো নয়।'

—'তবু শুনি।'

সে ফিক করে হেসে ফেলেছে—'রামহনু।'

ঊর্মি কিছুক্ষণ তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় ছদ্মনামটা শুনে হাঁ হয়ে গেছে। তারপর বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সে-ও হাসল। মুচকি হেসে বলল —'মন্দ কি! বেশ তো।'

—'বুঝলেন কিনা, অ্যাঁ? মানুষের এমন শুষ্ক চোখ...।'

গহন বোতল থেকে জল খাচ্ছিলেন। 'শুষ্ক চোখ' শব্দটা শুনেই একটা মোক্ষম বিষম খেয়েছেন।

কণারও প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল। স্বামীর করুণ অবস্থা দেখে মুচকি হেসে 'শুষ্ক চোখে'-র সঠিক সংস্করণটি উচ্চারণ করলেন—'সূক্ষ্ম চোখ'।

—'হ্যাঁ...ওই তো শুষ্ক চোখ! সবকিছুই খুঁচি খুঁচি করে দ্যাখে।'

পতিদেব এবারও হাঁ করে তাকিয়ে আছেন দেখে কৃপা হল তাঁর। পরিমলবাবু বাংলাটা এরকমই বলেন। তাঁর উরুশ্চারণের একটু দোষ আছে। কোনোমতে ফিসফিস করে স্বামীর কানে কানে বললেন—'খুঁচি খুঁচি মানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।'

গহন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কণা দো-ভাষীর কাজটা চমৎকার করছেন। তিনি না থাকলে যে কী অবস্থা হত তাঁর! বোধহয় হাড়ি চণ্ডালের দশা হত! কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে কণার দিকে তাকালেন তিনি। কণাও কৌতুকমিশ্রিত সপ্রেম দৃষ্টিতে স্বামীর সাধুবাদ গ্রহণ করলেন।

—'বুঝলেন কিনা, অ্যাঁ? মেয়ের জন্য কয়েক সেট জরায়ু কিনেছি। বড়ো- ঘরে যাচ্ছে তো! যেমনি-তেমনি ভাবে মেয়ে তো পাঠাতে পারি না।' পরিমলবাবু হাসলেন—'তার সঙ্গে পাত্রপক্ষের দাবি, দশ ভরি সোনা দিতে হবে...।'

কবিবর ফের স্তম্ভিত! দশ ভরি সোনার ব্যাপারটা তবু বোঝা গেল, কিন্তু কয়েক সেট জরায়ু!

কণাই ফের উদ্ধারকর্তা হয়ে এগিয়ে এলেন—'দশ ভরি সোনাই তো যথেষ্ট ছিল। তার সাথে আবার জড়োয়ার সেট কিনলেন কেন? এত খরচ করছেন পরিমলবাবু! ছোটো মেয়ের বিয়েও দিতে হবে।'

boierpathshala.blogspot.com

ওঃ! জরায়ু মানে জড়োয়া! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গহন। ভাগ্যিস এই ভদ্রলোকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয় না! দেখা হলে বোধহয় মাতৃভাষাটুকু ভুলে যেতেন!

পরিমলবাবুর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে—'কী করি বলুন দিদি! ভগবান আমাদের ঘরে পয়সা দেয় না। কিন্তু উৎপাত হাজারো! বউ-এর অম্ল, আমাদের ডাইবেটিস! আরও কত কী! অসুখের পিছনেই অর্ধেক ব্যাতন যায়।'

—'তবে?'

ভদ্রলোকের চোখ ছলছল করে ওঠে—'মেয়েটা আমার বড় লক্ষ্মী দিদি। দেখতে শুনতে ভালো না ঠিকই। তবু বড়ো লক্ষ্মীমন্তর। কালো মেয়ের বাপ হওয়ার বড়ো যন্তনা। কিন্তুক এবারে সম্মন্ধটা খুব ভালো। ছেলে এঞ্জিনিয়ার— বাপের এট্টু দাবি-দাওয়া আছে, তবে ছেলে হিরের টুকরো। এমন সম্মন্ধ আমাদের ঘরে ভগবান দেয় না। তবে ললিতা মায়ের গান শুনেই ছেলে কাত। তাই ভাবি। ভগবান যুদি না—ও যদি লেখে—তবু ললিতার কপালে এ ছেলের নাম আমিই লিখব। তার জন্য ভিটেমাটি তো দূর, নিজের রক্ত, কিডনি বিক্কিরি করতে হয় তাই সই। কিন্তুক মেয়ের বিয়ে এই ছেলের সঙ্গেই দেব নিচ্চই।'

বলতে বলতেই তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে—'আর ছোটো মেয়েটা ফরসা-টরসা সোন্দর। আমি বেঁচে থাকলে ওরও গতি হবে।'

গহন অবাক হয়ে পরিমলবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একজন মধ্যবিত্ত মানুষের কী অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস! ভাগ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস একজন ছাপোষা কেরানিও রাখে!

—'ললিতা ভারী সুন্দর গান গায়।' কণা হাসলেন—'ওর গলাটাই একটা অ্যাসেট! যে গুণের কদর বোঝে তার কাছে রূপ তুচ্ছ জিনিস মাত্র।'

—'হ্যাঁ।' পরিমলবাবুর মুখ গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'মা আমার রবীন্দসংগীত বড়ো ভালো গায়। আর উশ্চারণও খুব ভালো। রবীন্দসংগীতে উশ্চারণটাই আসল বেপার। বুঝলেন কিনা, অ্যাঁ?'

আরও কিছুক্ষণ পাড়ার সমস্ত খবরাখবর দিয়ে উঠলেন তিনি। কার মেয়ে কার সঙ্গে 'পেম' করছে, বাজারের 'দর' ভয়াবহ। কিছুই কেনার উপায় নেই! পাশের বাড়ির 'নন্দীবাবুর' চরিত্তির খারাপ—এইসব আর কী!

কণা গালে হাত দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতার মতো শুনছিলেন। গহনের বিরক্ত লাগছিল। এ তো মানুষ নয়—আস্ত ডেইলি গেজেট! পাড়ার কোথায় কি হচ্ছে—সব ঠোঁটস্থ! তিনি পরনিন্দা-পরচর্চা য় বিশেষ অভ্যস্ত নন। তাই ভাবছিলেন, কী অজুহাতে এখান থেকে পালানো যায়!

কিন্তু অত কষ্ট করতে হল না। একটু বাদেই গাত্রোত্থান করলেন পরিমলবাবু। বিয়ের কার্ড গহনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—'আসবেন দাদা। আপনারা এলে খুব খুশি হব। ললিতাও খুশি হবে। আপনারা হলেন মন্যিমান লোক! আপনাদের আশীববাদের দামই আলাদা—বুঝলেন কিনা, অ্যাঁ?'

বলতে বলতেই বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। গহন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক অবশেষে 'ডেইলি গেজেট' বন্ধ হল! কণা তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন—'কী ভাবছ? বিয়েবাড়িতে যাবে না?'

—'পাগল!'

boierpathshala.blogspot.com

—'কেন? পাগলের কী আছে?' তিনি বলেন—'বাড়ি বয়ে এসে নেমন্তন্ন করে গেলেন ভদ্রলোক। না গেলে অভদ্রতা হবে। আমি তো যাবই। আমার সঙ্গে তুমিও যাবে কিনা সেটাই জানার বিষয়।'

গহন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালেন—'তুমি যাবে?'

—'অফকোর্স। কতদিন বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়া হয়নি।' তাঁর মুখের হাসিটা তখনও মিলিয়ে যায়নি—'তার ওপর শুনলাম স্টার্টারে তন্দুরি চিকেন থাকছে।... সঙ্গে মাটন বিরিয়ানি। এরকম সুযোগ কেউ ছাড়ে!'

—'ভদ্রলোক কি তোমাকে মেনুটাও বলে গেছেন?'

—'সে কী!' কণা চোখ কপালে তুলেছেন—'একটু আগেই তো বললেন, শোনোনি? অবশ্য শুনবে কী করে? তুমি তখন ফ্যানের দিকে তাকিয়ে তোমার নতুন প্রেমিকার কথা ভাবছিলে।'

কবি রাগত চোখে সহধর্মিণীর দিকে তাকিয়েছেন—'আমার কোনো প্রেমিকা নেই।'

—'তাই বুঝি?' কৌতুকে ভুরু নেচে উঠল কণার—'তাহলে আজকাল অত কম্পিউটারে নাক গুঁজে কীসব করা হচ্ছে শুনি? সবসময়ই দেখছি মহাউৎসাহে কম্পিউটার অন করে খুটখাট টাইপ করা হচ্ছে। কী উৎসাহ কবিমশাইয়ের! দিন নেই, রাত নেই—সবসময় কম্পিউটারের সামনে আসীন। বুড়ো বয়সে অরকুট বা ফেসবুকে কোনো অষ্টাদশী প্রেমিকা জুটিয়েছ। তার সঙ্গেই চ্যাটপর্ব চলছে।' তাঁর মুখে দুষ্টু হাসি —'হুঁ হুঁ বাবা...যতই লুকাও, ঠিক ধরে ফেলেছি!'

—'কি ধরেছি দেখবে?' গহন কণাকে হাত ধরে টেনে বিছানা থেকে নামিয়ে এনেছেন। —'চলো দেখাচ্ছি তোমায়। আমার প্রেমিকা কে, আর তার সঙ্গে কি চ্যাট করছি—সব দেখাব।'

—'অবশ্যই আমার দেখা উচিত।' কণা বিনা প্রতিবাদে পিছু পিছু চললেন— 'আমার স্বামীর গার্লফ্রেন্ড বলে কথা। আমারও তো পছন্দ-অপছন্দ আছে। যার-তার হাতে তো তোমায় তুলে দিতে পারি না।'

গহন ভ্রূকুটি করেছেন। কণা হাসতে হাসতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললেন—'শশশশ... ।'

কম্পিউটারটা খোলাই ছিল। কবিতা ডট কমের থ্রেডটাও স্ক্রিনে ভাসছে। 'একা মেঘ' বলে জনৈক কবি লিখেছেন—'ভাঙা চাঁদ।'

কার্নিশে চড়ুইয়ের লাফালাফি

বিস্রস্তবসনার ঘামের বিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায়...।

নির্জনে নির্বাসিত একা লাইট হাউস।

মেঘেরা মিজোরামে আজও কাঁদে।

শূন্য কলশিতে ধরা বালিয়াড়ি

পুঁইমাচাটা অবিন্যস্ত।

তার মধ্যেই ভেঙে গিয়েছিল আস্ত একাট চাঁদ...।

খুঁজে পেয়েছি তার দু-এক টুকরো কোনখানে...।

boierpathshala.blogspot.com

—'একা মেঘটা কে? তোমার প্রেমিকা?' কণা উৎসুক।

গহন বিষণ্ণ মুখে বলেন—'নাঃ। আমিই।'

—'তুমি!' তিনি হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন স্বামীর দিকে—'তুমি আবার কবিতা লিখছ! তাও ছদ্মনামে!'

তাঁর কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট উচ্ছ্বাস! সে উচ্ছ্বাসিত সুরের রেশ কেটে গেল গহনের বেসুরো জবাবে—'লিখছি। কিন্তু আর লিখব বলে মনে হয় না।'

—'কেন?'

—'কমেন্টগুলো পড়ে দেখো।'

সর্বমোট পঁচিশটা কমেন্ট পড়েছে। কেউ লিখেছে—'ধুত্তোর! ফের মাথার ওপর দিয়ে গেল!' কেউ বলেছে—'ঝুলস্য ঝুল।' কেউ বা আবার মন্তব্য করেছে—'একই দিনে দুটো ঘেঁটে ঘ করার মতো কবিতা। কী চাপ!'

কণার সবচেয়ে মজাদার লাগল বিশেষ দুটো কমেন্ট। প্রথমটা রামহনুর। সে লিখেছে —'ঠিক ব্যাপারটা বুঝলাম না। আমার মনে হল কবি কি কি সাবজেক্ট নিয়ে কবিতা লিখবেন তার লিস্টটাই আগে পোস্ট করেছেন। কবিতাগুলো বোধহয় পরে আসবে। কবিতার অপেক্ষায় রইলাম।' তার পাশেই দাঁত বের করে হাসার স্মাইলি।

আর একটা জব্বর মন্তব্য দিয়েছে কুবলাশ্ব। তার বক্তব্য—'একটু আগেই মগনলালের কবিতার থ্রেডে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। তাই বিশেষ কথা বাড়াতে চাই না। সম্ভবত এলিয়ট বলেছিলেন, যে কবিতার অর্ধেক বোঝা যায়, অর্ধেক যায় না—সেটাই আসল কবিতা। যেটা পুরোটাই বোঝা যায় না, সেটা বোধহয় কবিতার চেয়েও উচ্চমার্গের জিনিস। তুরীয় দশায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া বোঝার উপায় নেই দেখছি।'

মুমতাজ নাম্নী একটি মেয়ে মৃদু প্রতিবাদ করেছে—'অমন বোলো না। কবিতার শেষ দুটো লাইন আমার বেশ ভালো লেগেছে।'

উত্তরে কুবলাশ্ব বলেছে—'ভাই মুমতাজ, তোমার যদি শেষ দুটো লাইন ছাড়া বাকিটাও কবিতা মনে হয় তাহলে কিছু বলার নেই।'

'কেবিসিতে অমিতাভের নাচানাচি
ক্যাটরিনার আমসূত্রর ফোঁটায় ফোঁটায়
ফিলম থেকে নির্বাসিত একা রানি মুখার্জি
নিরূপা রায়েরা সিনেমায় আজও কাঁদে।
শূন্য বাংলা ফিলমের ভাঁড়ে ধরা তামিলের মিক্সচার
ইমরান হাসমির দাড়ি অবিন্যস্ত...
আগেরটা যদি কবিতা হয়, তবে এটাও কবিতা।'

কণা আর থাকতে পারলেন না, খিলখিল করে হেসে উঠলেন। গহন সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, 'তুমি হাসছ!'

'হাসব না!' তিনি হাসি থামাতেই পারছেন না—'কুবলাশ্বর সেন্স অব হিউমারটা কী মারাত্মক দ্যাখো কী সুন্দর তোমার কবিতার প্যারোডি বানিয়েছে! হিঃ...হিঃ...হিঃ...!'

boierpathshala.blogspot.com

গহন কিছুক্ষণ বাচ্চা ছেলের মতো গোঁজ হয়ে থাকলেন। তারপর দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

কণা বুঝলেন কবিবরের আঁতে ঘা লেগেছে! অমন মুখের ওপর হেসে ওঠাটা ঠিক হয়নি। ভুলটা বুঝতে পেরে সামান্য অনুতপ্তও হলেন। পরক্ষণেই অভদ্র হাসিটা ফের 'অধিকার' করে নিয়েছে তাঁকে। বেশ কিছুক্ষণ ফিক ফিক করে হাসার পর ক্রমশ শান্ত হলেন। এবার রঙ্গ-রসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে কর্তব্যপালনের পালা! কবির অর্ধাঙ্গিনী হওয়া সহজ কথা নয়।

আজও স্নিগ্ধ বৃষ্টি হচ্ছে। খুব জোরে নয়, বরং মাখনের মতো ঝিরঝিরে মোলায়েম বৃষ্টি। তার সঙ্গে মিঠে সোনালি রোদ্দুর কখনও লাজুক বউয়ের মতো মুখ দেখায়। আবার পরক্ষণেই পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে দেয়। যখনই রোদ্দুরের আভা বৃষ্টির ফোঁটার ওপর পড়ছে, তখনই বিন্দুগুলো সোনালি হয়ে উঠছে। ঠিক যেন গলন্ত সোনা।

কণা ধীর পায়ে বেডরুমের দিকে গেলেন। মেজাজ খারাপ হলে গহন সচরাচর বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকেন। অথবা মিউজিক সিস্টেমে গান শোনেন।

এখন অবশ্য তিনি গান শুনছিলেন না। বরং জানলাগুলো বন্ধ করে, অন্ধকার ঘরে শুয়েছিলেন। বৃষ্টি তার পছন্দ হচ্ছে না। ইদানীং বর্ষাকালের ওপরেও খাপ্পা হয়ে আছেন।

কণা মনে মনে স্বীকার করলেন যে কবিদের মেজাজ-মর্জি বোঝা ভগবানেরও অসাধ্য।

তিনি আস্তে অস্তে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়েন। ঘন হয়ে আদুরে ভঙ্গিতে তাঁর বুকে মুখ গুঁজেছেন। অন্যান্য দিন গহন আলগোছে তাঁর মাথাটা জড়িয়ে ধরে, কপালে আলতো একটা চুমু এঁকে দেন। আজ একদম স্থির! নড়াচড়া নেই।

—'কী হল? রাগ নাকি?' দু-হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন কণা—'কার ওপর এত গোঁসা কবিবর!'

রাগ নয়, হতাশা চুঁইয়ে পড়ল গহনের কণ্ঠস্বরে—'আমি আর কবি নই। আমি আর কবিতা লিখতে পারছি না কণা।'

—'কে বলল লিখতে পারছ না?' তিনি সস্নেহে তাঁর মাথার চুলে বিলি কাটছেন —'কবিতা যে লিখছ তা তো নিজের চোখেই দেখে এলাম।'

—'ধুস!' অধৈর্য হয়ে মাথা ঝাঁকালেন গহন—'কমেন্টগুলো তো নিজের চোখেই দেখলে। ত্রিশ বছর ধরে কবিতা লিখছি। কিন্তু শুঁটকির ভাষায় এমন 'ঝাড়' আগে কখনও খাইনি।'

—'হ্যাঁ। নিজের চোখে দেখেছি। তাতে কী?' তাঁর শান্ত উত্তর।

—'তাতেই সব।'

—'সব নয় গহন। তুমি শুধু ঝাড়টাই দেখছ। কিন্তু ওরা যা বলেছে তা অবান্তর কিছু নয়।'

—'তার মানে?' গহন উত্তেজিত—'তার মানে তুমিও বলতে চাইছ আমি যা লিখেছি তার সবটাই 'ঝুলস্য ঝুল'!' কণা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে।

—'কি দেখছ?'

—'একটা সত্যি কথা বলবে?'

boierpathshala.blogspot.com

—'কী?'

—'কবিতাটা লেখার আগে ঠিক কি ভেবেছিলে? মানে কি ভেবে লিখেছিলে?'

কণার কথায় থতোমতো খেয়ে গেলেন তিনি। এতক্ষণ কথাটা ভেবে দেখেননি। কবিতার সমালোচনার ঝালেই গা জ্বলছিল। কিন্তু কবিতার উৎপত্তি নিয়ে বিন্দুমাত্রও ভাবেননি।

—'কিছুই ভাবোনি। তাই না?' কণা নিজেই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন—'যা মাথায় এসেছে, সুন্দর সুন্দর শব্দ দিয়ে সাজিয়ে তাই বসিয়ে দিয়েছ।'

গহন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন—'আই মাস্ট কনফেস। ঠিক তাই।'

'—এটাই তোমার প্রবলেম। না ভেবে, শুধু শব্দের জোরে, যা খুশি তাই লিখে পার পাওয়ার ক্ষমতা গহন দত্তগুপ্তর আছে। কিন্তু 'একা মেঘের' নেই। পাঠক অত বোকা নয়। তারা একটা বিরাট নামের সামনে বোকা সাজে বটে। কিন্তু আদতে অত নির্বোধও নয়। পঙক্তিগুলো সুন্দর হচ্ছে অথচ স্পর্শ করছে না। সেইজন্যই এই রি-অ্যাকশন।'

—'শুধু রি-অ্যাকশন নয়, রুড রি-অ্যাকশন!'

—'স্বাভাবিক।' কণার হাতদুটো গহনের মুখ তাঁর বুকে চেপে ধরেছে। যেন মা সন্তানকে বুকে নিয়ে ভোলাচ্ছে।

—'তোমার মনে আছে গহন? একদিন তুমি পার্কস্ট্রিট থেকে আমার মোবাইলে ফোন করেছিলে। আমি স্নানে গিয়েছিলাম। কলারটিউনে 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে' গানটা বাজছিল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে যখন ফোনটা রিসিভ করলাম, তখন তোমার রি-অ্যাকশন কি ছিল মনে আছে?' কণা ফিক করে হেসে ফেললেন। তারপর গহনের বাচনভঙ্গি নকল করে বলেন—'তুমি বলেছিলে কি সব গান লাগিয়েছ! আমি এদিকে চাঁদিফাটা রোদে দাঁড়িয়ে গলগল করে ঘামছি—আর তোমার ফোনে বাজছে 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে, সখী ভালোবাসা কারে কয়?' এই পরিস্থিতিতে এইসব দার্শনিক প্রশ্ন শুনতে ভালো লাগে?'

ঘটনাটা গহনেরও মনে পড়ে গেল। অবিকল এই কথাগুলোই বলেছিলেন তিনি। ভাবতেই হাসি পেয়ে গেছে তাঁর।

—'তোমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হচ্ছে। চতুর্দিকে মানুষের এত সমস্যা, এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট—অথচ কবিতায় তার কোনো ছাপই নেই! তোমার কবিতা নরম, আতুর, সুন্দর। কখনও ভাবের গভীরে ডুবে যাচ্ছে, কখনও দার্শনিকতার আকাশে উড়ছে। কিন্তু মাটিতে নেমে আসছে না।' কণা স্নিগ্ধস্বরে বলেন—'যে লোকটা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, বসের খিঁচুনি খেয়ে, ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরছে, কিংবা যে ছেলেটি বা মেয়েটি বেকারত্বের জ্বালায় মরছে—তাদের কাছে ভাব, দার্শনিকতা বা সুন্দর শব্দ কোনোটাই আবেদন রাখে না। কারণ তুমি তো তাদের কথা কখনও বলোনি, তাদের যন্ত্রণাকে স্পর্শ করোনি।'

গহন কণার বুকে মুখ ডুবিয়ে খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। তিনি জানেন কণা একদম ঠিক কথা বলছেন। এর চেয়ে চরম সত্য আর কিছু হতেই পারে না। তবু মনের কোথাও একটা যন্ত্রণা কাঁটার মতো বিঁধছিল।

—'কিন্তু কণা, আমি যে কঠিন শব্দ, কষ্টের কথা, যন্ত্রণার কথা বলতে পারি না।'

boierpathshala.blogspot.com

—'সে আবার কী কথা!' কণা যেন শাসনের সুরে বলেন—'কেন পারো না! তোমার কলম আছে, শব্দ আছে, অনুভূতি আছে, ক্ষমতাও আছে। তবে পারবে না কেন?

—'হুঁ'।

—'হুঁ নয় হ্যাঁ।' তিনি বললেন—'আজকে যে মানুষটি আমাদের নেমন্তন্ন করে গেলেন, সেই মানুষটি তোমাকে জ্ঞানীগুণী মানুষ বলে জানেন। কিন্তু তোমার কোনো কবিতা কখনও পড়েছেন কি? পড়েননি। তার কারণ এই নয় যে তুমি ইন্টেলেকচুয়ালদের জন্য লেখো। না পড়ার একমাত্র কারণ, কখনও তাঁর কথা লেখোনি তুমি। কবিতা মানেই তো দুর্বোধ্য জিনিস নয়। যা মানুষকে ভাবায়, অনুভূতিকে ধাক্কা মারে—তাই কবিতা। যার অনুভূতি আছে, আবেগ আছে সে-ই কবিতা পড়বার যোগ্য। সেই অনুভব থেকে ওকে বঞ্চিত করবে কেন? ওনার অপরাধ কী? উনি আঁতেল নন, সাংঘাতিক ডিগ্রি নেই এটাই কি অপরাধ?'

গহন চুপ করে থাকলেন। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি এর উত্তর তাঁর কাছে নেই। সবসময়ই ভেবে এসেছেন কবিতা শুধু শিক্ষিত পাঠকদের জন্য। যাদের কাব্যচর্চা করার অভ্যাস আছে তারাই একমাত্র পাঠক হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু আজ মগনলালের থ্রেডে, স্বর্ণাভ গুপ্তর এই একই কথার উত্তরে কুবলাশ্বর একটি পোস্ট তাঁকে ভাবাচ্ছে। কুবলাশ্ব লিখেছিল—'কবিতা চর্চা করার অভ্যাস পুরো ভাঁটের কথা। মায়ের পেট থেকে পড়ে কেউই কাব্যচর্চা করতে শুরু করে না। আমাদের সকলের কবিতা চর্চা শুরু হয় 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে। তারপর একটু একটু করে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সাথেই পরিচয় হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে। তারপর জীবনানন্দ, সুকান্ত ভট্টাচার্যরাও এসে পড়েন। এই অবধি সব মানুষই অল্পবিস্তর পড়ে থাকেন। কারণ এরা আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে যারা একেবারে মাথামোটা, তাদের কথা বাদই দিলাম—কিন্তু যাদের অল্পবিস্তর সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে, তারা এর রস্বাস্বাদনও করতে পারে। সুতরাং যাকে বেস বলে তা তাদের তৈরি হয়ে যায়। অতএব অল্পবিস্তর সব মানুষেরই কবিতা পড়ার অভ্যাস থাকে। তারা হয়তো কবিতার ল্যাজা মুড়ো, ছন্দ অলংকার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু অনুভব করার ক্ষমতা রাখে।'

এর উত্তরে স্বর্ণাভ গুপ্তর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি—'সেই অনুভব করার ক্ষমতা কি ইন্টেলেকচুয়াল কবিদের কবিতা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট?'

কুবলাশ্বর ফের ঝাঁঝালো উত্তর—'ইন্টেলেকচুয়াল কবি বলতে আপনি যদি নিজেকে ও মগনলালকে বোঝান—তবে অনুভব তো দূর, কোনোকিছুই যথেষ্ট নয়। কিন্তু যখন শঙ্খ ঘোষ বলেন, 'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক' কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলে ওঠেন —'ভালোবাসা পেলে সব লন্ডভন্ড করে চলে যাবো' অথবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাহাকার করে বলেন—'কেউ কথা রাখেনি'—তখন আমরা অনুভব করতে পারি। কবিতা তখন আমাদের বুকে ধাক্কা দেয়। কাঁদায় হাসায়! যখন উচ্চারিত হয় 'কাল ছিল ডাল খালি/আজ ফুলে যায় ভরে/বল দেখি তুই মালি/হয় সে কেমন করে' তখন বিস্মিত হই। আপনি কি বলেন? এগুলো কি কবিতা নয়? না কবিরা আপনার মতে যথেষ্ট ইন্টেলেকচুয়াল নন।'

স্বর্ণাভ গুপ্ত এখানেই ক্ষান্ত দিয়েছিলেন। মডারেটর ব্যাসদেবও বিপদ বুঝে থ্রেডটাই ক্লোজ করে দিয়েছেন। কিন্তু গহনের মাথায় কথাগুলো তখন থেকেই ঘুরছিল। আর এই মুহূর্তেই কণা ঠিক ওই ভাষাতে না হলেও, মোটামুটি কাছাকাছি বক্তব্যই পেশ করেছেন।

boierpathshala.blogspot.com

—'কী ভাবছ?'

গহন কণার দিকে তাকিয়ে হাসলেন—'ভাবছি এত কথা শিখলে কোথায়!'

—'বা-রে!' তিনি ঠোঁট ফুলিয়েছেন—'আফটারঅল আমি কবিপত্নী। গহন দত্তগুপ্ত'র বউ বলে কথা! বুঝলেন কিনা, অ্যাঁ?'

গহন হেসে ওঠেন। আদর করে স্ত্রীয়ের স্ফুরিত অধরে চুমু এঁকে দিলেন—'এটা তার পুরস্কার।'

—'পুরস্কার তো বুঝলাম! কিন্তু মাথায় কিছু ঢোকাতে পেরেছি কি?'

—'মাথায় কি ঢুকিয়েছ তা একমাত্র গহন দত্তগুপ্তর বউয়ের স্বামী ছাড়া কেউ বুঝবে না।' তিনি কণার কোমর ধরে টেনে তুলে এনেছেন বুকের ওপর।

—'এসো। দেখি, আমার নদীটা কেমন আছে।'

কণা গহনের বুকে আলতো করে কিল মারলেন। লাজুক হেসে বললেন, 'অসভ্য!'

—'থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট।'

—'আচ্ছা, একটা কথা বলবে?'

কণার চুল আদরে এলোমেলো করে দিতে দিতে বললেন গহন—'বলো।'

—'তুমি রোমান্টিক কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লেখো না কেন? বাস্তবকে এত ভয় কীসের?'

তিনি কণাকে ঘনভাবে জড়িয়ে ধরেছেন। তাঁর মনে অদ্ভুত একটা ক্ষোভ গুমরে মরছিল। তবু একটা মৃদু হাসি দিয়ে ক্ষোভ ঢাকলেন। বললেন—'এসো। একটু ভালোবাসি।'

কণা বুঝলেন যে প্রসঙ্গটা গহন এড়িয়ে গেলেন। গহনও বুঝলেন যে কণা বুঝেছেন। তবু যে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না সেটাই যেন উচ্চারিত হল তাঁর দীর্ঘশ্বাসে।

—'বাস্তবকে ভয় পাই না কণা। বাস্তব যে আঘাত ছাড়া আর কিছু দেয় না, তা তোমায় কী করে বোঝাই।'

ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা পড়ল!

সারাদিন ধরে নম্র হওয়ার দরুন এখন পরিবেশ ঠান্ডা। এই মুহূর্তে বৃষ্টি নেই। তবে একটা জোলো হাওয়া থেকে থেকেই হুহু করে এসে আছড়ে পড়ছে। আকাশে একটা-দুটো পাতলা মেঘের স্তর খামখেয়ালিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মধ্যে দিয়েই শলমাজরির মতো নক্ষত্ররা কৌতুকে চোখ টিপছে।

রাতের অন্ধকার মেখে ছাতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন গহন। ছায়া ছায়া জ্যোৎস্না মাখা প্রেক্ষাপটে তাঁকে অতৃপ্ত আত্মার মতো মনে হয়। গন্ধরাজের মিষ্টি গন্ধ মাঝেমধ্যেই নাকে আসছে। কণা ছাতের টবে গন্ধরাজ লাগিয়েছেন। তার পাশে লংকা গাছের সহাবস্থান। গন্ধরাজের সঙ্গে লংকা গাছের বুনো গন্ধও পাচ্ছেন গহন।

তিনি অন্যমনস্ক ভাবে হাত বাড়িয়ে দেন গাছটার দিকে। ঠান্ডা ভিজে, ঈষৎ স্যাঁতস্যাঁতে পাতাগুলো তাঁর স্পর্শে খসখস করে উঠল। যেন সামান্য উষ্ণতা পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

boierpathshala.blogspot.com

গহন পরম স্নেহে হাত বাড়িয়ে দেন গাছগুলোর গায়ে। নিজেদের কোনো সন্তান তো আর হল না। এরাই কণার সন্তান। কণা এদের স্নেহে, যত্নে বড়ো করে তুলেছেন। যখন প্রথম এ বাড়িতে এসেছিল তখন ছোট্ট ছোট্ট চারা ছিল। এখন বড়ো হয়েছে।

গাছগুলোও যেন বুঝতে পারে তাদের ভীষণ আপন কেউ এসেছে। স্পর্শে ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানায়। লংকা গাছটা লংকার ভারে বিধ্বস্ত। তবু গহনের হাত স্পর্শ করে যেন বলছে—'দ্যাখো...আমি তোমাদের উপহার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই নাও আমার ফুল... এই নাও ফল...। স্পর্শ করো...অনুভব করো...।'

স্পর্শে যে কী আনন্দ তা আজ টের পেলেন গহন। অন্ধকারে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। তবু গাছটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব বুঝতে পারছেন! কোনটা পাতা! কোনটা ফুল! কোনটা ফল —সব অনুভব করছেন।

তাঁর আনন্দ যেন প্রকৃতির গায়েও ছড়িয়ে পড়ল। টুপ টুপ করে নিঃশব্দেই কয়েক ফোঁটা জল পড়ল তাঁর গায়ে। স্বাতী নক্ষত্রের জল নাকি! হাওয়া হুহু করে বয়ে গেল তাঁকে ছুঁয়ে। বাড়ির সামনের বড়ো আমগাছটার ডালপালা এসে পড়েছে ছাতে। হাওয়ার দমকে তার পাতায় পাতায় মর্মরধ্বনি। বাড়ির পিছনে অন্ধ গলিতে জোনাকির ভিড়। স্পষ্ট ও জোরালো আলোয় গ্রিন সিগন্যাল দিচ্ছে। রাস্তায় ভিখিরি আর কুকুরের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আওয়াজ! তার মাঝখানেই রাতজাগা প্রহরীর লাঠির ঠুকঠুক, হুইসেল এবং চিৎকার—'জাগতে রহো— ও-ও-ও-ও!'

সব মিলিয়ে আজ যেন পৃথিবী জীবন্ত হয়ে উঠে বলছে, 'দ্যাখো...চোখ মেলে দ্যাখ্যো... কান্না দ্যাখ্যো...বেদনা-যন্ত্রণা-লজ্জা সব দ্যাখো। স্পর্শ করো... অন্ধের মতো নয়, দার্শনিকের মতো নয়, মরমি মানুষের মতো স্পর্শ করো...।'

গহন দু-চোখ ভরে দেখলেন রাতের পৃথিবীকে। ছাত থেকে গোটা পাড়ার দৃশ্যই স্পষ্ট দেখা যায়। এতদিন আকাশের সৌন্দর্য দেখেছেন। এবার মাটির দিকে তাকালেন।

গহনের পাশের বাড়িতে তখনও আলো জ্বলছে। জানলা খোলা। কণার কাছে শুনেছেন, এ বাড়ির ছেলেটা রোজ রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। কাউকে হাতের কাছে না পেয়ে অসহায় বউটাকেই বেদম পেটায়। মাঝেমধ্যেই প্রবল চিৎকারও কানে আসে। নিতান্তই পি.এন.পি.সি. ভেবে পাত্তা দেননি। তা ছাড়া বিষয়টা তাঁর কাছে বিরক্তিকর ঠেকেছে।

কিন্তু আজ স্বচক্ষেই দেখতে হল দৃশ্যটা। তিনি শিউরে উঠেছেন। এ কী মানুষ! না না জানোয়ার! বেদম মারতে মারতেই ছেলেটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মেয়েটির ওপর। জোর করে ছিঁড়ে ফেলেছে তার ব্লাউজটা! শাড়ি অবিন্যস্ত। খাটটা যেন ভয় পেয়ে প্রবল নড়ে উঠল! পৈশাচিক দৃ,শ্য দেখে সে-ও নিজে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মানবিক নয়, জান্তব রিরংসা। পাশবিক মৈথুন!

গহন চোখ সরিয়ে নিলেন সেদিক থেকে। বুকের ভেতরে অসহ্য একটা অন্ধ রাগ, ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—'স্কাউনড্রেল।'

ছাতের উলটোদিকে বস্তির দৃশ্য! এখান থেকে খানিকটা দূরেই বস্তি অঞ্চল। দু-একটা ঘরে তখনও আলোর আভা। বেশ খানিকটা কালো ধোঁয়া উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। এত রাতে কারুর বাড়িতে হাঁড়ি চড়েছে। যখন সমস্ত মানুষ পেট ঠেসে খেয়ে স্বপ্নের দেশে পাড়ি দিচ্ছে, তখন হয়তো দুটো ভাতের জন্য লালায়িত হয়ে বসে আছে কেউ!

boierpathshala.blogspot.com

বস্তির কালো ধোঁয়া যেন উজ্জ্বল চাঁদকে ম্লান করে দেয়। গহন আকাশের দিকে তাকালেন না। আর ভালো লাগল না। বুকের ভেতরে একটা অব্যক্ত কষ্ট। ভীষণ অসহায় লাগছে নিজেকে। তিনি ফের চোখ ফিরিয়েছেন পাশের বাড়ির জানলায়। আলো নিভে গেছে। কিন্তু ল্যাম্পপোস্টের আলো নিষ্প্রভ বেদনার মতো পিছলে পড়েছে জানালার ওপরে। সেই ক্ষীণ আলোয় দেখতে পেলেন মেয়েটি জানলার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু-চোখে নিষ্প্রাণ শূন্য দৃষ্টি! পাথরের মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ। ভঙ্গি দেখে মনে হয়, বোধ হয় সে বেঁচে নেই!

অত ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে অসুবিধে হল না, তার কপালে, গালে কালশিটে! চুলের ফাঁকে, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ রক্তরেখা, গলায় সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ!

গহন দেখলেন মেয়েটির স্থির চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠল অশ্রুবিন্দুরা! মনে হল যেন বলছে—'দ্যাখো আমায়...স্পর্শ করো...চোখের জল স্পর্শ করো...অনুভব করো কালশিটের ব্যথা...স্পর্শ করো...।'

গহনের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকাতে অস্বস্তি বোধ করছেন। তার চোখে চোখ রাখার সাহস পাচ্ছেন না। দৃ,শ্যটা সহ্য হচ্ছে না। তাই আস্তে আস্তে তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে, ছাত থেকে চুপিসারে নেমে গেলেন গহন। একরকম পালিয়েই গেলেন। সাধে কি শুঁটকি তাঁকে বলে—এসকেপিস্ট!

'চালচুলো নেই তার, নেই তার চেনা বা অচেনা

আদমসুমারি হলে তার মাথা কেউ গুনবে না।

তার ভোট চাইবে না গণতান্ত্রিক কোনো প্রার্থী।

সরকারের দরকার নেই, তাই নিজের সুড়ঙ্গে—

পাগল,...পাগল, সাপলুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে।'

ফ্ল্যাটের ঘরটা অন্ধকার! অদ্ভুত আলোহীন বিবরের মতো। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় এ ঘরে বোধ হয় আলো ঢোকে না। ঢোকেনি কখনও! প্রাচীন সুড়ঙ্গের অন্দরে যেমন নির্নিমেষ রাত্রি ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনই অন্ধকার তার স্থায়িত্ব কায়েম রেখেছে এখানে।

ঘরে প্রধান শব্দ বলতে শুধু কবীর সুমনের গান। এ ছাড়াও খুঁটিনাটি দু-একটা ক্ষীণ শব্দ মাঝমধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কখনও-বা সেটা ঘড়ির কাঁটার টিকটিক। কখনও বাথরুমের কলে জলের টুপটাপ। আবার কখনও বা দেশলাই জ্বালানোর আওয়াজ। ঘন অন্ধকারের মধ্যেও সিগারেটের আগুনে মুখটা তীব্র ধকধকে আলো নিয়ে জ্বলছিল;

—'জগতে যা কিছু আছে, কিছু নেই তার অনুষঙ্গে

পাগল...পাগল...সাপলুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে...।'

গানটা শেষ হয়ে যেতেই আরেকটা নতুন শব্দ যোগ হল। তরলে বরফ পড়ার ছলাৎ আওয়াজ। তার পেছন পেছন একটা কণ্ঠস্বর—

কোনো উত্তর নেই।

—'কথা বলবে না? রাগ করেছ?'

এবারও কোনো উত্তর এল না। শুধু রকিং চেয়ারটা যেন একটু দুলে উঠল।

boierpathshala.blogspot.com

রকিং চেয়ারটার ঠিক সামনের ডিভানটাতে বসেছিল শুঁটকি। বিকেল থেকেই প্রচুর মদ খেয়েছে সে। কথা বেশ অস্পষ্ট। জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

—'আজ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি। মাফ করে দাও।'

চেয়ারটা আর একটু নড়ল। শুঁটকির মনে হল চেয়ারে বসা নারীমূর্তির মুখ বিষণ্ণ।

—'সরি রুমা।' সে অপরাধীর মতো মাথা নীচু করেছে—'জানি আমি ভীষণ খারাপ। মদ খাওয়ার অভ্যেসটা ছাড়তেই পারি। কিন্তু ছেড়ে দিলে তুমি তো আর বারণ করতে আসবে না।'

এবারও অন্যপক্ষ নিশ্চুপ! তার এই মৌনতার পিছনে রাগ লুকিয়ে না দুঃখ—তা বোঝা মুশকিল।

'বুবাই কেমন আছে? বড়ো হয়েছে?' শুঁটকি উৎসাহভরে জানতে চায়—'এখন কি বাবা বলে ডাকতে পারি? ওকে তুমি আমার কথা বলেছ?'

টুপ টুপ করে শুধু কোথায় যেন জল পড়ে যায়। আর কোনো শব্দ নেই।

'বলোনি তাই না?' সে যেন একটু হতাশ হল—'আচ্ছা, পরে বলে দিয়ো। বোলো ওর বাবা খুব দুষ্টু। মাকে খুব ব্যথা দিয়েছিল। তাই মা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু বাবার ওকে দেখতে ইচ্ছে করে। খুব আদর করতে ইচ্ছে করে। ওর জন্য বাবা একটা ঘর সাজিয়ে রেখেছে।' তার কণ্ঠস্বর ফের উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'গোলাপি রঙের দেয়াল, জানলায় মিকি মাউসের ছবিওয়ালা পর্দা। নরম গদির ছোট্ট একটা ধবধবে বিছানা।...হ্যাঁ তার দু-দিকে রেলিংও লাগিয়ে দিয়েছি রুমা। বুবাই পড়ে যাবে না। একটা দোলনাও আছে। আর আছে অ-নে-ক পুতুল। টেডি বিয়ার, বাঘ, সিংহ, বেন-টেন না কি যেন—অনেক খেলনা।'

বলতে বলতেই চুপ করে গেল শুঁটকি। কুণ্ঠাভরা কাতর গলায় বলে—'ও কি একবার বাবার কাছে আসবে? আমি শুধু একবার ওকে দেখব। কথা দিচ্ছি, সেদিন একটুও মদ খাব না। বাজে খিস্তি দেব না। তুমি বলতে যে বাচ্চাদের সামনে খিস্তি দিতে নেই! বুবাই এলে শুধু ভালো ভালো কথাই বলব। অনেক বেলুন কিনে আনব ওর জন্য। আমরা দুজনে শুধু খেলব। তোমার কোনো ব্যাপারে আর কোনোদিন জোর করব না। একটুও জ্বালাব না রুমা...।' তার কথায় তীব্র আকুতি—'ওকে শুধু একবার নিয়ে এসো...আনবে না?'

এমন প্রার্থনায় বোধহয় ঈশ্বরের মনও দ্রবীভূত হয়। কিন্তু ওপ্রান্তের মানুষটা এবারও কোনো কথা বলল না। শান্ত নীরবতায় ভরে আছে গোটা ঘর। হাস্নুহানার মিষ্টি গন্ধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে আবেশে। রুমা এলেই এই গন্ধটা পায় শুঁটকি। সে জানে রুমার গা থেকেই গন্ধটা আসে।

বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা। সে চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করছে। ওপ্রান্তের মানুষটি এখনও নীরব। বুকের ভেতরে দীর্ঘশ্বাসটা কোনোমতে চাপল শুঁটকি। তার মধ্যে হতাশা ক্রমাগতই গুমরে মরছিল। এখনও কি ক্ষমা পাওয়া যাবে না? আজও কি ক্ষমা করবে না রুমা? সে তো কোনোদিন রুমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি! কোনোদিন গায়ে হাত তোলেনি! তুলবেই বা কেন! সে যে রুমাকে ভীষণ ভালোবাসত। আজও বাসে। শুধু একটা দিনের ভুল...মুহূর্তের ভুল। ক্ষণিকের মতিভ্রম...।

boierpathshala.blogspot.com

হঠাৎই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। রিংটোনে একটা বাচ্চা খিলখিলিয়ে হাসছে। শুঁটকি একটু বিরক্ত হয়েই ফোনটা তুলে নেয়। গহনের ফোন! এই রাত দুটোর সময় তার আবার কী হল!

—'সরি রুমা।' সে অনুতপ্ত স্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করে—'গহন ফোন করেছে। গহনকে তো চেনো তুমি। ফোন না তুললে হারামজাদা অভিমান করে বসে থাকবে। তুমি একটু বোসো,...আমি ওর সঙ্গে কথা বলেই আসছি।'

ফোনটা হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে এল শুঁটকি। কলটা রিসিভ করেই বলল —'রামছাগল কোথাকার...এত রাত্রে ফের নাকে কান্না জুড়েছিস! ঝাড় সহ্য না হলে লেখা বন্ধ করে দে। মগজমারি খতম। আমায় জ্বালাচ্ছিস কেন?'

গহনের কণ্ঠস্বরটা আজ অন্যরকম শোনাল—'না শুঁটকি, আমি লিখব।'

শুঁটকি হাসে—'ঝাড় সহ্য করেও লিখবি! বাঃ। এবার আর পালাবি না! বাঘ! বাঘ! গহন দত্তগুপ্ত আর পালাবে না! গ্রেট!'

—'না!' গহন দত্তগুপ্ত নয়, গহন শান্তভাবে বলেন—'গহন দত্তগুপ্ত-ই হচ্ছে সব নষ্টের গোড়া। আমি বুঝতে পারছিলাম যে সমালোচনা প্রয়োজন, অথচ সমালোচনা সহ্য করতে পারছিলাম না। এই দ্বিচারিতার কারণ ওই গহন দত্তগুপ্ত নামটাই। ওই নামটা তার ইগোর পাহাড় নিয়ে বারবার বাধা দিচ্ছিল। এখন আমি আর গহন দত্তগুপ্ত-ই নই। কল মি একা মেঘ।'

'বাঃ।' সে হেসে উঠল—'তবে আজ তোর নবজন্ম হল।'

—'বলতে পারিস। অথবা নিউ জার্নিও বলা যায়।'

—'যাই হোক।' শুঁটকি আন্তরিক স্বরে বলে—'শেষ পর্যন্ত তুই জিতবিই।'

—'তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

—'ইয়ে...তার সঙ্গে একটু তুলসীপাতা, একটু এসেন্স, একটা খাটিয়া, আর এক-প্যাকেট ধূপও। বুঝতেই পারছিস, খরচ বেঁচে যায়।'

গহন বিরক্ত হলেন—'এই রাত দুটোর সময় ফের আজেবাজে কথা শুরু করেছিস!'

—'কেন? রাত দুটোর সময় তুই জন্মাতে পারিস, আর আমি মরার কথা ভাবতে পারি না?' সে বলে—'এমনিতেও আমাদের মরাটা কোনো ইস্যু নয়। চোখ বুজলে চশমার দোকানের কাস্টমারগুলো হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। বড়োজোর মদের দোকানের মালিকগুলো একফোঁটা-দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারে। একটা ভালো খদ্দের কমে গেল কিনা।'

—'আমাকে বাদ দিয়ে গেলি!'

—'তুই!' শুঁটকি হা হা করে হেসে ওঠে—'শালা, তোকে আমি চিনি না! তুই মহা হারামি মাল! আমি মলে একটুও কাঁদবি না। বরং খাতাপেন নিয়ে কবিতা লিখতে বসবি।'

গহন ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—'এতদিনে তুই আমায় এই চিনলি!'

—'খামোখা সেন্টু দিস না খুড়ো। তোকে আমি ঠিক চিনেছি। এখন আর জ্বালাস না। রুমার সঙ্গে কথা বলছি। তোর জন্য প্রেমটা চটকে গেল শালা!'

গহন চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আস্তে আস্তে বললেন—'ঠিক আছে। তোরা কথা বল। আমি রাখছি।'

boierpathshala.blogspot.com

লাইনটা কেটে দিয়ে ফোনটাকে সুইচ অফ করে দেয় শুঁটকি। রুমার সঙ্গে কথা বলার সময় কেউ তাকে জ্বালাতন করুক তা চায় না। এই সময়টুকু তার একান্ত নিজস্ব। শুধু তার আর রুমার! মাঝখানে আর কাউকে সে বরদাস্ত করবে না।

শুঁটকি ফোনটাকে পকেটে পুরে রুমার কাছে ফিরে এল। গাঢ় স্বরে বলল—'গহন আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছে জানো? মালটার একটু ঝাড় খাওয়ার দরকার ছিল। এতদিন স্রেফ ফাঁকি দিয়ে 'আম গাছ-জাম গাছ' লিখে পাতা ভরিয়েছে। উদমা খিস্তি খাওয়ার পর এবার সত্যিকারের কবিতা আবার ওর হাত থেকে বেরোবে।' তার মুখে একটা স্মিত হাসি ভেসে ওঠে—'আমিও অবশ্য লুকিয়ে-চুরিয়ে একটু-আধটু কবিতা লিখছি। সব কবিতাই তোমাকে নিয়ে। পাবলিশারের সঙ্গে কথাও বলেছি। চার ফর্মা, মানে চৌষট্টি পৃষ্ঠার বই না হলে সেটা বই বলে ধরাই হয় না। এখনও পর্যন্ত চল্লিশটা কবিতা লিখেছি। পাবলিশার বলেছে ছাপান্ন থেকে আটান্নটা কবিতা চাই। আর ষোলোটা। আমারও বই বেরোবে রুমা। আমিও কবি হয়ে যাব। শুঁটকি কবি হবে!' কথাটা বলেই হা হা করে হেসে ফেলল সে। যেন খুব বড়ো একটা রসিকতা করেছে! হাসতে হাসতেই চোখে জল এসে গেছে। দু-হাতে চোখের জল মুছে বলল—'আজও একটা লিখেছি। শুনবে?'

ওপারের জমাট নিস্তব্ধতা থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া এল না। তবু শুঁটকি মহা উৎসাহে আবৃত্তি করতে শুরু করল—

পুড়ব বলেই কাব্য লিখি সহজ মন,
তরাই ঘুরে, আদর করে আসল জল।
তিস্তানদীর বুকের ভাষায় মাদল শোন
যে কথাটা বলবি ভাবিস, আজকে বল।
ভিড় পড়েছে জংশনে আর চৌমাথায়
কে জানে কোথায় যাচ্ছি ভেসে কে জানে!
হিজবিজিয়ে ছন্দ ওঠে আজ মাথায়,
দেয়াললিখন কালের কাছে হার মানে।
কলকাতাতে ট্রাফিক—আলোর রূপকথা।
ফুটপাথে ঐ স্বপ্নপোড়ার জ্বলছে ঘুম!
গাত্রদাহ আজ শহরের চুপকথা
তাই বেপাড়ার নষ্ট মেয়ের সাজের ধুম
দিব্যি দিলেও তিস্তাপারে ডুবব না,
ভেসে বাঁচার, বেঁচে ভাসার মন্ত্র চাই।
গীতার বাণী আর কিছুতেই শুনবো না।
প্রেম বলে তাই কাম শরীরে আজ জাগাই!
তবুও কেন তিস্তাপারে রঙিন ফুল
ফুটছে মনে, স্বপ্নকোণে আজ বদল!
যে কথাটা বন্দি, ঠোঁটে তোর আঙুল,

boierpathshala.blogspot.com

চুপ করে সেই গোপন কথাই আজকে বল।

শুঁটকির আবৃত্তি শেষ হল। আবার পিন পতনের স্তব্ধতা ফিরে ফিরে এসেছে। বেসামাল হাওয়ায় ঘরের সাদা পর্দাটা হু হু করে উড়ছিল। একটা টিকটিকি কোথা থেকে যেন মৃদু আওয়াজ দিয়ে ওঠে—'ঠিক...ঠিক...ঠিক...।'

—'তোমার দিঘার রাতটার কথা মনে আছে রুমা?' সে আপনমনেই বলে—'তখন পূর্ণিমা ছিল। চাঁদের আলোয় সমুদ্রের সাদা ফণা চিকচিক করছিল। ভরা কোটালের জল ফুলে ফুলে উঠছিল। বড়ো বড়ো ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল তোমার পায়ের কাছে। চোখে-মুখে নোনতা জলের ছিটে...' তার চোখ স্বপ্নিল। যেন সেই মুহূর্তটা আবার এসে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। সমুদ্রের নোনা গন্ধ, উত্তাল হাওয়া সবই যেন তার অনুভবে ধরা দেয়—চ 'তোমার কোলে ছ-মাসের বুবাই। চাঁদের আলোয় দুধসাদা শাড়ি হিমজুঁইয়ের মতো ঝলমল করছিল। হাওয়ায় এলোমেলোভাবে তোমার চুল উড়ছিল। শাড়ির আঁচল উড়ছিল। তুমি জানো না, সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে তোমাকে ভেনাসের মতো দেখায়। আমি বলেছিলাম—'চলো সমুদ্রে নামি।' তুমি ভয় পেয়েছিলে। ভেনাসের সমুদ্রকে ভয় কী! জোর করে হাত ধরে টেনে জলে নামালাম। তোমার শাড়ি ভিজে গেল। ভয়ও খানিকটা কাটল। খুব মজা পেয়েছিলে। বুবাইকে শক্ত করে ধরে এক পা এক পা করে কোমর জলে নামলে। সমুদ্র কোমর ছুঁয়ে, শাড়ি ছুঁয়ে কলকল—ছলছল করে বয়ে যাচ্ছিল। আর আমি গান ধরেছিলাম। কোন গানটা বলো তো?'

শুঁটকি উদাত্ত গলায় গান গেয়ে ওঠে। ফ্ল্যাটের ঘরটায় অনুরণিত হতে লাগল তার কণ্ঠস্বর। চোখ বুজে, গলার শিরা ফুলিয়ে একমনে গেয়ে যাচ্ছে সে—'সাগরসঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত, কখনও তো হই নাই ক্লান্ত/তথাপি মনে মোর প্রশান্ত সাগরে ঊর্মিমালা অশান্ত...।'

একই লাইন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইছিল শুঁটকি। তার গলায় বিশেষ সুর নেই। কথাও জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কী অদ্ভুত জেদে, জোর করে গেয়ে যাচ্ছিল। কথাগুলো আস্তে আস্তে বিকৃত হয়ে আসে। গলাও কী যেন অজ্ঞাত কারণে ধরে এসেছে। ভেঙে যাচ্ছে বারবার, তবু বারবার ফিরে ফিরে গাইছিল— 'তথাপি মনে মোর প্রশান্ত সাগরে ঊর্মিমালা অশান্ত/সাগরসঙ্গমে...।'

আস্তে আস্তে গান সুরহীন হয়ে এল। একসময় হারিয়ে গেল কথাগুলোও। হা হা করে কেঁদে উঠল শুঁটকি। প্রবল আবেগে চেয়ারের পায়ের কাছে বসে পড়েছে সে। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাহাকার করে বলল—'আমায় ক্ষমা করো রুমা...আমি জানতাম না, হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ বেসামাল হয়ে আচমকা এসে আছড়ে পড়বে...জানতাম না, যে বোল্ডারগুলো অত শক্ত! তোমার, বুবাইয়ের যে অত ব্যথা লাগবে আমি জানতাম না...জানতাম না...।'

হাসুহানার গন্ধ মাখা একঝলক হাওয়া হুহু করে তাকে ছুঁয়ে যায়। রকিং চেয়ারটা দুলে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

কবিতা ডট কমের পেজগুলো খুলে খুলে সবার কবিতা পড়ছিলেন গহন। এমনকি কমেন্টগুলোও বাদ দিচ্ছিলেন না।

boierpathshala.blogspot.com

এতদিন যেন বুকের ওপর একটা পাথর চেপে ছিল। গহন দত্তগুপ্ত নামটার অহংবোধ তাঁকে অন্যদের কবিতা পড়া থেকে সবসময়ই বিরত রেখেছে। ভাবটা এমন ছিল, যেন এই সাইবার জগতের একটা গুরুত্বহীন সাইটে কবিতা পোস্ট করে সবাইকে ধন্য করেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তেই সাইটটার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন সেই মুহূর্তেই নতুন লড়াই শুরু হল। গহন দত্তগুপ্ত-র নয়। 'একা মেঘের'। যাকে কেউ চেনে না, জানে না। নাম শোনেনি কখনও। নিতান্তই ভাগ্যান্বেষী এক কবি। তার ইগো নেই। সে যেখানে খুশি যেতে পারে, যা খুশি বলতে পারে, সবার কথা শুনতেও পারে। তার কোনো অহংবোধ নেই।

কবিদের মধ্যে 'জোনাকি', 'আকাশনীল'-এর কবিতা বেশ ভালো লাগল তাঁর। কিন্তু আশ্চর্য কিছু লাগল না। লিখেছে ভালোই। অথচ মনে তেমন দাগ কাটছে না। অন্যদিকে মনে মনে অবাকও হচ্ছিলেন। কবিতাগুলো কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে এ ধরনের কবিতা আগেও পড়েছেন।

এমন মনে হওয়ার কারণটা খুঁজছিলেন গহন। উত্তর পেতেও অবশ্য দেরি হল না। কমেন্টগুলো পড়তে পড়তেই রামহনুর বক্তব্যে পেয়ে গেলেন ইপ্সিত উত্তর। রামহনু স্পষ্ট লিখেছে—'কবিতা ভালো লাগল। তবে নতুনত্ব কিছু পেলাম না। বরং শব্দ চয়ন, স্টাইল, রোমান্টিসিজমে প্রখ্যাত কবি গহন দত্তগুপ্ত-র ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যেতে পারে। কিন্তু মৌলিকতা নেই।'

কমেন্টটা পড়ে চমকে উঠলেন তিনি। বিস্মিতভাবে কবিতাগুলো আবার পড়ে দেখলেন। রামহনুর কথা সম্পূর্ণ সঠিক! কবিতাগুলোর নীচে অনায়াসেই গহনের নাম লিখে চালিয়ে দেওয়া যায়! কেউ কোনো পার্থক্য বুঝতেও পারবে না। শুধু উক্ত দুজনেরই নয়, আর অনেকের কবিতাই পড়ে দেখলেন। প্রত্যেকের রচনাশৈলীই প্রায় একরকম। একইরকম বিরহ, একইরকম প্রেম, একইরকম সুন্দর সুন্দর শব্দচয়ন। শুধু কুবলাশ্ব-র কবিতাটা এর থেকে কিছুটা আলাদা। সে কিছু আঞ্চলিক আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করেছে বলেই বোধহয় বেশি ভালো লাগল কবিতাটা।

তু হমার মরদ বটিস-লয়?

...মেয়েটা ভাবে।

'আপন করম ভায়েক ধরম' গানে

তাল মিলিয়েই গোটা পরব যাবে।

'কেনি রে তু চাস না হামার পানে?'

সোহাগ রঙের অভিমানী মেয়ে,

আকুল ব্যথায় ঈষৎ এলোমেলো

চাঁদকে ভেবে সওদাগরের আলো

বলছে কেঁদে—'দেখলি না তু চেয়ে!'

নীলচে আভা নীল পাহাড়ের গায়ে,

চাঁদ চলে যায় তেপান্তরের পারে।

আকুল ব্যথা ফিরল দখিন বায়ে

'টুকুনখানিও দেখলি না তু হা রে!'

boierpathshala.blogspot.com

শালের বনে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে

মহুল মাতাল—ধূপ জ্বলেছে বুঝি!

চাঁদ জানে না, করছে খোঁজাখুঁজি

এক মেয়ে, তার প্রেমিক সদাগরে।

জ্যোৎস্না বুকে পাথর হল মেয়ে

টুকুনখানিও দেখল না চাঁদ চেয়ে।

তিনি 'একা মেঘ' কবিতার নীচে মন্তব্য লিখে দিলেন—'কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ সত্যিই প্রশংসনীয়। শব্দের চালাকি নেই। সোজাসাপটা সরল ভাষায় একটি রূপকথার মতো কবিতা। আদ্যন্ত সুন্দর।'

তাঁর মন্তব্যের একমিনিট পরেই রামহনু মন্তব্য করল—'ঠিক বলেছেন। আপনাকে দ্বিত্ব দিলাম।'

গহন অবাক হয়ে পালটা মন্তব্য করেন—'দ্বিত্ব! মানে?'

রামহনু একটা স্মাইলি দিয়েছে—'এ পাড়ায় নতুন তো! তাই সব কথার মানে বুঝতে একটু সময় লাগবে। আপাতত এইটুকু বলতে পারি—দ্বিত্ব মানে, সেকেন্ড করা।'

—'ও।'

—'বাই দ্য ওয়ে, আপনাকে কী বলে ডাকব? 'একাদা' বা 'একাদি' বলে ডাকা যাবে? না মেঘ না মেঘদি বলব?'

গহন হেসে ফেলেন। এই রামহনুর বিরূপ মন্তব্যেই রাগ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এখন আর রাগ নেই।

—'মেঘদাটাই বেটার। আমি কোনোভাবেই দিদি নই।'

—'বেশ, 'মেঘদা'ই বলব তবে।' রামহনু লিখল—'রাতে কতক্ষণ অনলাইন থাকবেন? একটু আড্ডা মারা যাবে?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'তাহলে আড্ডার থ্রেডে আসুন।' সে আবার স্মাইলি দিয়েছে—'নয়তো কুবলাশ্ব কাল সকালে কুরুক্ষেত্র করবে। কবিতার থ্রেডে পাব্লিক গপ্পো করলে ওর একদম পছন্দ হয় না। ব্যাটাকে আমি বড্ড ভয় পাই। বড়ো কড়া লোক।

গহনের বেশ মজা লাগছিল। তিনি উত্তরে টাইপ করলেন—'সে কী! কুবলাশ্ব ব্যাটা নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম বেটি!'

—'বেটি! বলেন কী! কুবলাশ্ব বেটি হতে যাবে কোন দুঃখে!'

—'কবিতা পড়ে তো বেটিই মনে হল। তা ছাড়া ছদ্মনাম তো মুখোশের মতো। তার পিছনের আসল লোকটাকে দেখা যায় না। অবশ্য আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।'

রামহনু উত্তরে আরও কিছু টাইপ করার আগেই এই সাইটের মডারেটর 'ব্যাসদেব' স্ক্রিনে আবির্ভূত হলেন—'মেঘবাবু ও হনু, কুবলাশ্বর জেন্ডার নির্ণয় ও ওই বিষয়ক আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকলে আড্ডাঘরে গিয়ে বলুন। আমি অদরকারি পোস্টগুলো ডিলিট করব।'

boierpathshala.blogspot.com

—'আহা দাদা, এমন জব্বর পোস্টগুলো ডিলিয়ে দেবে। কুবলাশ্ব-র দেখা উচিত যে ওকে কেউ মেয়ে বলেছে। তারপর ঘোড়াটা কি কুকথা বলে সেটাই দেখার!'

রামহনুর কথার উত্তরে ব্যাসদেব বললেন—'হনু, কবি ছেলে কি মেয়ে সেটা বড়ো কথা নয়। শেষ পর্যন্ত সে কবিই। আমি পোস্টগুলো ডিলিয়ে দিচ্ছি। আড্ডাঘরে এসো।'

গহন চমৎকৃত হচ্ছিলেন। দু-তিনটে লোক কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে চোখ রেখে বসে আছে। তারা ছেলে না মেয়ে, সুন্দর কী অসুন্দর, লম্বা না বেঁটে, বুড়ো না জোয়ান—তা কেউ জানে না। কেউ কাউকে চেনে না। অথচ কেমন সুন্দর আন্তরিকভাবে আড্ডা মারছে। সাইবার ওয়ার্ল্ডের কী অসীম ক্ষমতা!

কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনজনের আড্ডা জমে গেল। ব্যাসদেব দুঃখ করে বলছিলেন —'আজকাল কবিতার আর সেই দিন নেই। এই কবিতা ডট কমেই একসময় কীসব অসাধারণ কবিতা পোস্ট হত! এখন সব কপিক্যাট আর চোরদের জায়গা হয়েছে।'

গহন বিস্মিত—'কপিক্যাট আর চোর মানে?'

রামহনু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়—'বেশির ভাগ কবিতাগুলোই কোনো না কোনো বিখ্যাত কবির স্টাইলে লেখা। নিজস্ব স্টাইল এখানকার খুব কম লোকেরই আছে। যেমন আজকাল ট্রেন্ড চলছে গহন দত্তগুপ্ত-র। ভদ্রলোক বহুদিন কবিতা লিখছেন না। কিন্তু তাঁর অভাব আমরা টেরই পাচ্ছি না। কারণ 'জোনাকি', 'আকাশনীল' বা আরও কিছু কবি হুবহু গহন দত্তগুপ্ত'র স্টাইলেই লেখে। ওদের কবিতা পড়লেই মনে হয় বকলমে গহন দত্তগুপ্তই লিখে দিয়ে গেছেন কবিতাগুলো। সেই সাবজেক্ট! একই ভঙ্গি। নতুনত্ব কিছু নেই। বুঝলাম, যে ওরা কবির অন্ধভক্ত। তাই বলে তাঁকেই সবসময় কপি পেস্ট মারতে হবে!'

রামহনুর কথার রেশ টেনেই ব্যাসদেব জানালেন—'সত্যিই তাই, মৌলিকতা কিছু নেই। ইনফ্যাক্ট ওদের কবিতাগুলো যদি পরপর কবির নাম ছাড়া পোস্ট করে দেওয়া হয় —তাহলে কোনটা কার কবিতা আলাদা করে আইডেন্টিফাই করা যাবে না। সবই একরকম। কবির সিগনেচারের অভাব যাকে বলে আর কী!'

গহন আস্তে আস্তে টাইপ করেন—'ও।'

—'কিছু পাব্লিক তো তার চেয়েও আরও উচ্চস্তরের ঝাড়ু।'

—'ঝাড়ু! মানে ঝাঁটা?'

—'না...না...।' রামহনু একটা চোখ টেপার স্মাইলি দেয়—'ঝাড়ু মানে ঝাড়া বিদ্যায় এক্সপার্ট।'

ব্যাসদেব একটা কাঁদো কাঁদো মুখের ইমোটিকন দিয়েছেন—'সেই চিরাচরিত সমস্যা। প্লেগিয়ারিজম। আজকাল তো ব্লগে ব্লগে শখের কবিরা কবিতা পোস্টাচ্ছে। কথা নেই বার্তা নেই—একজন তার মধ্যেই একটা কবিতা বেমালুম ঝেঁপে দিয়ে এখানে নিজের নামে পোস্ট করে দিল। ব্যস, সেই নিয়ে চলল মারপিট। দুই কবিই একটা কবিতাকে নিজের বলে দাবি করছে! সে প্রায় প্রাণান্তকর পরিস্থিতি!'

যত জানতে পারছিলেন গহন, ততই তাঁর চোখ ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকছিল। এরকমও হয়!

—'তোমরা কেউ জানো না।' রামহনুর মন্তব্যে এবার ভুরু কোঁচকানো রাগি মুখের স্মাইলি—'ভানুসিংহের পদাবলির গোটাটা আমি আগের জন্মে লিখেছিনু। দাদু ঝেঁপে

boierpathshala.blogspot.com

দিয়েছে! উঃ, কী দুঃখু।'

তার মন্তব্যের ভঙ্গিতে তিনি হেসে ফেলেছেন। তাঁর মাথায় তখন অন্য একটা চিন্তাও ঘুরঘুর করছিল—

—'আচ্ছা, এদের কেউ কিছু বলে না?'

ব্যাসদেব উত্তর দিলেন—'প্লেগিয়ারিজম হলে চোরের আই. পি. অ্যাড্রেসটাকে ব্যান করে দেওয়া হয়। তার অ্যাকাউন্টও ব্লক করা হয়। কিন্তু কপিক্যাটদের নিয়ে কী করবেন? এরা প্রত্যেক বইমেলাতেই কবিতার বই বের করে। কোন প্রকাশনী যে বের করে, আর কারা যে পড়ে তা ভগবানই জানেন! কিন্তু অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। কার কটা বই হয়েছে তা নিয়েও কম্পিটিশন! এদের কারুর পঁয়ত্রিশটা বই, কারুর-বা আবার চল্লিশটা। সব স্বঘোষিত 'মহান কবি'। কালেভদ্রে যদি একটা বা দুটো কবিতা কপালগুণে 'স্বদেশ'-এ ছাপা হয়ে যায় তবে তো কথাই নেই! বাবফট্টাইয়ের চোটে টেকাই যায় না। আর যদি না হয় তাহলে আঙুরফল টক। বলে বেড়াবে—'আমি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে।'

গহন নিজের মনেই সজোরে হেসে উঠলেন। এমন প্রজাতির বিশেষ অভাব নেই। সকলেই অসিতবরণ চৌধুরীর মতো নিঃস্বার্থ নয়। এমনকি সেই স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কবিও হাসপাতালের বেডে শুয়ে আক্ষেপ করেছেন, আর এরা তো নিতান্তই ভেকধারী! আর বইয়ের সংখ্যাও প্রচুর! তিনি আপনমনেই গুনতে শুরু করেন—আদৌ তাঁর নিজের অতগুলো বই আছে কি?

রামহনু যোগ করে—'এদের প্রচুর পোষা ভাই-বোনও আছে। দাদাদের অন্ধ ভক্ত। দু-লাইন লিখলেই একেবারে 'বাঃ বাঃ' করে পিঠ চুলকোতে শুরু করে। আর কি বলব। এসে যখন পড়েছেন তখন সবই স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। চিন্তা নেই।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গহন লগ আউট করেন। কম্পিউটার শাট ডাউনও করেছেন। কিন্তু তখনই শুতে গেলেন না। বরং অশান্ত মনে পায়চারি করছেন।

তাঁর মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরেফিরে আসছিল। বারবার ভাবছিলেন এই জোনাকি, আকাশনীলদের সঙ্গে তাঁর তফাতটা কোথায়? ওদের বইয়ের সংখ্যা তাঁর থেকেও বেশি। ওদেরও 'বাঃ, বাঃ' করার জন্য ভক্তবৃন্দ আছে! এমনকি তিনি ঠিক যেমন কবিতা লেখেন, এরাও অবিকল তেমনই লেখে। পার্থক্য কোথায়? তবে আকাশনীল কেন 'আকাশনীল'? আর তিনিই বা কেন তিনি?

রাতের ছায়ায় নিভৃত আসনে বসে বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকেন কবি—'আমি কে? আমি কোথায় আলাদা?...আমি কেন আমি?...'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পরিমলবাবুর কথা। কণা বলেছিলেন—'ওঁর কথা কখনও লেখোনি তুমি...'

তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। কী ভেবে যেন খাতা-কলম নিয়ে বসে গেলেন। কয়েকটা মিনিট স্তব্ধতা। তারপরেই সাদা পাতার ওপর কলম খসখস করে চলতে শুরু করল।

—'ওঃ ঈশ্বর! তুই এখনও টয়লেটে!'

প্রায় রোজই বাবার এই ডায়লগটা শুনে শুনে বোর হয়ে গেছে মন্দার। ভদ্রলোক তো মানুষ নন, 'মার্ফিজ ল'-এর (Murphys law) চলতা ফিরতা উদাহরণ। যেদিন তিনি ছাতা

boierpathshala.blogspot.com

নিয়ে বেরোবেন না, সেদিনই বৃষ্টি নামবে! যেদিন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকবে, সেদিনই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খুঁজে না পেয়ে 'লেট হচ্ছে...লেট হচ্ছে...' বলে নাচতে শুরু করবেন। এবং অবধারিত ভাবেই সেদিন তাঁর গাড়ির টায়ার পাংচার হবে ও স্টেপনি থাকবে না!

সেইসব অমোঘ নিয়মগুলোর অন্যতম হল, যেদিন মন্দারকে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, এবং সে বাথরুমে ঢুকে বসে থাকবে, ঠিক তখনই বাবার নিম্নচাপ ও গ্র্যাভিটেশনের চূড়ান্ত হবে।

মন্দারের এমনিতেই আজ মেজাজ খিঁচড়ে ছিল। ভোররাতে আবার একটা দুঃস্বপ্ন-র গুঁতো খেয়েছে। আজ অবশ্য লোকটা তাকে মারেনি। শুধু যখন উশ্রীকে 'ভালোবাসি' বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই টপকে পড়ে উশ্রীর মাথার একঢাল চুল ধরে টান মেরে বলল —'এইবার!'

মন্দার হতভম্ব হয়ে দেখে যে কালো মুষকো লোকটার হাতে উশ্রীর পুরো চুলটাই উঠে এসেছে! তার মাথায় টাক! উশ্রীকে এমন কুশ্রী আগে কখনও লাগেনি! চুল ছাড়া একটা মেয়েকে যে এত খারাপ লাগতে পারে তা তার ধারণাতেই ছিল না। সে বোধহয় হার্টফেলই করত! ভাগ্যক্রমে ঘুমটা তার আগেই ভেঙে গেল।

এই শনিপুজোই তার কাল হয়েছে। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে খুচুর-খুচুর করে দাঁত মাজতে মাজতে দুঃস্বপ্নগুলোর কথাই ভাবছিল সে। কালো পালোয়ানটা তাকে কিছুতেই 'ভালোবাসি' শব্দটা বলতে দেয় না কেন? বাস্তবে প্রপোজ করার মতো সাহস এখনও জুটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু স্বপ্নে তো 'ভালোবাসি' বলে ফেলতেই পারে! অথচ প্রত্যেকবার বলার আগেই ওই কেলে মোষটা এসে কিছু-না-কিছু কাণ্ড ঘটবেই।

আসলে দোষ লোকটারও নয়। সব দোষ ওই কুবলাশ্বের। কাল একটা চমৎকার কবিতা লিখেছিল সে। যথারীতি সে কবিতার নায়িকা উশ্রী। তার রেশমি চুলের বর্ণনাও দিয়েছিল চমৎকার। কিন্তু সব মাটি করল ওই হতভাগা। কবিতাটা পড়েই দ্রাম করে মন্তব্য করল—

—'আপনারা কবিরা এত প্রেমিকার চুল ধরে টানাটানি করেন কেন বলুন তো! মেয়েদের মাথায় চুল থাকলে সুন্দর দেখায় নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা নিয়ে এত আদিখ্যেতা করার কি আছে?'

সে বিশেষজ্ঞের মতো বলে—'কবির প্রেমিকার মাথায় ঘন চুল থাকাটা মাস্ট।' জীবনানন্দও তো বলেছেন—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।'

—'সে জীবনানন্দ বলেছেন...বলেছেন। উনি তো এ-ও বলেছেন...'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' মুখে তখনই থাকতে পারে যখন প্রেমিকার মুখময় ব্রণ থাকে। তাই বলে কি সব কবির প্রেমিকার মুখই 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' হতে হবে! এবার বলুন, ওটাও মাস্ট।'

মন্দার বুঝতে পারছিল না, সে সামান্য একটা বিষয়কে নিয়ে এত টানাহ্যাঁচড়া করছে কেন? কোনোমতে জানায়—

—'না...আসলে প্রেমিকার ঘন লম্বা চুল কাব্যিক!'

—'এ আবার কী কথা! কোনো কবির প্রেমিকা কি ববকাট কাটতে পারে না? মাশরুম ছাঁট বা ভেজ ছাঁট যে মেয়েরা মারে, তারা কি সুন্দরী নয়? অথবা যে মেয়ের মাথায় টাক আছে সে কি কবির প্রেমের যোগ্য নয়?'

boierpathshala.blogspot.com

টাকলু মেয়ে! তার প্রায় বিষম খাওয়ার দশা। এসব কী উদ্ভট উদ্ভট কথা বলছে লোকটা!

সে কথা বলতেই 'কুবলাশ্ব'র কড়া জবাব—'উদ্ভট নয়, আসলে আপনারা চিরকালই বাহ্যিক সৌন্দর্যের পূজারি। আপনাদের কাছে প্রেমের যোগ্য মেয়ে মাত্রেই সুন্দরী হতে হবে। আর তার সৌন্দর্যের একমাত্র মাপকাঠি ঘন, কালো, লম্বা চুল। ডাবর আমলা কেশ তেলের মডেল।'

মন্দারের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। 'একা মেঘ' বোধ হয় ঠিক কথাই বলেছিল। কুবলাশ্ব নামের পিছনে নির্ঘাৎ কোনো ববছাঁট চুলের মেয়ে আছে। সেইজন্যই এমন সদ্য তেলে ফেলা বেগুনের টুকরোর মতো ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে।

সে আর কথা বাড়ায়নি। চেপে গিয়েছিল। আর তারপরই এই দুঃস্বপ্নটা। উশ্রীর মাথায় টাক!

—'কী হল? আর কতক্ষণ?' বাইরে থেকে বাবার প্রাণান্তকর হাঁক—'ওরে, এটা কি অর্ডিনারি না ফেভিকল?'

এরপর আর বেশিক্ষণ বাথরুম আটকে রাখা যায় না। অগত্যা মন্দার বেরিয়ে এল। মানে বেরোতেই হল তাকে।

বাবা তখন যথারীতি মেঝের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল সে —'এমন জব্বর টাইমিং ফিক্স করো কি করে একটু বলবে? যখনই আমি টয়লেটে ঢুকি ঠিক তখনই তোমার ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। পাঁচ মিনিট আগে বা পরে এই ঘটনাটা ঘটে না কেন?'

বাবা কুঁই কুঁই করে উত্তর দেন—'টাইমিং ফিক্স করার আমি কে! আমার কোলনকে জিজ্ঞেস কর।'

—'মানতেই হবে যে তোমার কোলনের টাইমিং শচীন তেন্ডুলকরের চেয়েও ভালো। যাও'।

বাবা দৌড়োলেন। সে তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে রান্নাঘরের দিকে চলল। আজ নাকি টিকলি একটা এক্সপেরিমেন্টাল ডিশ তৈরি করবে। এই এক্সপেরিমেন্ট-এর গিনিপিগ অবধারিতভাবেই সে আর বাবা! এর আগের সপ্তাহে টিকলি 'মাশরুম চিচিঙ্গা' নামের একটা ডিশ তৈরি করেছিল। সেটা খেতে কেমন হয়েছিল তা টের পাওয়া গিয়েছিল পরদিন সকালে। মন্দার আর বাবা দুজনেই সেই ডিশের ধাক্কায় টয়লেটে প্রায় ইট পেতে রেখেছিল।

রবিঠাকুর বোধহয় টিকলির ডিশের কথা ভেবেই লিখেছিলেন—'শুধু যাওয়া-আসা... শুধু স্রোতে ভাসা...।'

আজও ডিশের নামে আর-একখানা মূর্তিমান জোলাপ তৈরি হচ্ছে! সে ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দেখল টিকলি মুখখানা হাঁড়ি-পানা করে ভাজা মাছের দিকে তাকিয়ে আছে। সে মুখে সদ্য সদ্যই দই মেখে সাদা ভূত সেজেছে। আজকাল বেশ রূপচর্চা র দিকে ঝোঁক গেছে বেটির! মুলতানি মাটি, বেসন, চন্দন—কিছুই বাদ যাচ্ছে না!

কিন্তু আজ কী হল! এমন 'কলহান্তরিতা' নায়িকার মতো মাছের দিকে তাকিয়ে আছে কেন? মন্দারের সন্দেহ হয়। তবে কি দইটা মাছের গায়ে পড়ার কথা ছিল? ভুল করে নিজের মুখে মেখে ফেলেছে!

boierpathshala.blogspot.com

—'কী হয়েছে?' থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলে সে—'মুখে অমন হসন্ত দিয়ে রেখেছিস কেন?'

টিকলি কোনো কথা না বলে ভাজা মাছের দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

মন্দার সবিস্ময়ে দেখে, মাছগুলোকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। কোন বাজারে এ ধরনের মাছ পাওয়া যায়! এ কী জিনিস বাজার থেকে এনেছে বাবা! কুচকুচে কালো! মাছ না অন্যকিছু!

—'সব পুড়ে গেছে!' টিকলি প্রায় কেঁদে ফেলেছে—'আমি কড়ায় বসিয়ে মুখে দই মাখতে গিয়েছিলাম...সেই ফাঁকে!'

এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। এগুলো মাছই। অন্তত কড়ায় বসানোর আগে তাই-ই ছিল। কিন্তু এখন পুড়ে ঝামা!

টিকলি ঠিকমতো কাঁদতেও পারছে না। চোখ থেকে জল পড়লেই মুখের দই ধুয়ে যাবে। কোনোমতে বলল—'কি করব দাদাভাই? ভিনিগার ঢেলে দিলে পোড়া পোড়া ভাবটা কি যাবে?'

পোড়া মাছ উইথ ভিনিগার! ভাবতেই হৃৎকম্প হতে শুরু করল। সে আমতা-আমতা করে বলে—'ইয়ে...মানে...টিকলি, আজ আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে। সকালে...মানে এখন তার বাড়িতেই খাওয়ার কথা। তুই বরং বাবাকে নতুন ডিশটা টেস্ট করা...।'

টিকলি আর কিছু বলার আগেই সে রাজধানী এক্সপ্রেসের স্পিডে সেখান থেকে কেটে পড়ল। এখন কোনোমতে বাড়ি থেকে বেরোতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু পেটকে তো বেশিক্ষণ পোড়া মাছ আর ভিনিগারের ভয় দেখিয়ে রাখা যায় না! তার ওপর এখন আবার বাইরে খেয়ে পয়সা নষ্ট করছে না মন্দার। উশ্রীর জন্মদিনে তাকে চমকে দেবে সে। সেই লক্ষ্যেই একটু-একটু করে টাকা জমাচ্ছিল। বাইরে খাচ্ছে না, যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করছে না, এমনকি নিজের জন্য একটা সুতোও কেনেনি। নামকরা জুয়েলারির দোকানে একটা দারুণ হিরের আংটি দেখেছে। ওই আংটিটাই উশ্রীকে দেবে এবারের জন্মদিনে। এই লক্ষ্যেই গোটা বছর সে তার মাইনের টাকা বাঁচিয়ে এসেছে।

আজ সেইদিন! আজ উশ্রীর জন্মদিন! দোকানে গিয়ে তার যথাসর্বস্বের বিনিময়ে আংটিটা কিনে নিল মন্দার। পেটে তখন ছুঁচো ডন মারতে শুরু করেছে। কিন্তু বুকভরা আনন্দের কাছে খালি পেটের চিনাচিনানি আর কতটুকু!

হিরের আংটিটা ব্যাগে পুরে সে হাওয়ায় উড়তে উড়তে স্টুডিয়োতে পৌঁছোল। আজ এই আংটিটা উশ্রীকে দেবে। আজই তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের হৃদয়ের কথা জানাবে সে। উশ্রী কি হাসবে? চোখের ঘন পল্লব ঝুঁকিয়ে লাজুক মুখে সম্মতি দেবে কি? ওর আপেলের মতো গালে আরও-একটু রক্তিমাভা কল্পনা করে মন্দার নিজেই বিহ্বল হয়ে পড়ে। ভয় হয় দৃশ্যটা দেখার আগেই না তার হৃদপিণ্ড থেমে যায়।

স্টুডিয়োতে এসে কিন্তু উশ্রীকে দেখতে পেল না সে। হয়তো সে কোনো শটে ব্যস্ত। তবে বাইরে ঊর্মির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন যথারীতি ল্যাপটপে ওয়্যারলেস কানেকশন গুঁজে নিবিষ্ট মনে কি যেন করছে। মন্দারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাসল —'গুড মর্নিং।'

boierpathshala.blogspot.com

—'গুডমর্নিং ঊর্মি।' মন্দার তার পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়ে—'কেমন আছ?'

তাদের মুখোমুখি পরিচয়ের পর আপনি থেকে তুমি-তে নামতে বেশি সময় লাগেনি। ঊর্মি খুব মজার মেয়ে। গভীরমনস্কও বটে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠেছে কয়েকদিনেই। মন্দারের তার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। ঊর্মির সঙ্গে কথা বলে, তার কথা শুনে সে আরাম পায়। তার শ্যালিকা ভাগ্য ভালো বলতে হবে!

মন্দারের চোখের দিকে তাকিয়েই সে যেন তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা ধরে ফেলে—'আমি দিব্যি আছি। উশ্রীও ভালো আছে। শট দিচ্ছে, একটু পরেই আসবে।'

—'ও।' মন্দার আরও কিছু বলার আগেই তার পেট রীতিমতো সশব্দ বিপ্লব করে ওঠে —গররররর ঘুঁ উ উ...।

আর গররররঘুঁ! জ্বলন্ত ইজ্জতের মুখে ফুঁ! প্রেস্টিজে গ্যমাক্সিন! ঊর্মি পর্যন্ত আওয়াজটা শুনতে পেয়েছে। তার মুখে স্মিত হাসি।

—'মধ্যপ্রদেশে এমন কোলাহল কেন? ব্রেকফাস্ট হয়নি?'

—'না...না...!' মন্দার অপ্রস্তুত। মাথা চুলকে বলে—'হয়েছে...মানে...।'

পেটটা বোধহয় ঠিক করেছে যে করেই হোক তার মুখে চুন-কালি মাখিয়ে ছাড়বে। সে এবার আরও তীব্র প্রতিবাদ জানাল—'ঘুর র র র...ঘুট...ঘুট... ঘুট...।' অর্থাৎ 'মিথ্যেবাদী! ব্রেকফাস্টে কী খেয়েছিস? হরিমটর!'

মন্দার পারলে এক্ষুনি অভদ্র পেটটাকে কেটে বাদ দেয়! ঊর্মি আড়চোখে তার পেটের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। মাথায় জড়ানো ওড়নাটা বারবার মুখের ওপর এসে পড়ছিল। একহাতে সেটাকে সরিয়ে বলল—'কেমন হয়েছে তা ঘুঁ ঘুঁ...ঘুঁট ঘুঁট শুনেই বুঝতে পারছি।'

মন্দার লক্ষ করেছে যে ঊর্মির সঙ্গে সবসময়ই একটা ঢাউস ব্যাগ থাকে। উশ্রীর মেকআপ বক্স, এক্সটা আউটফিট, পারফিউম, জলের বোতল ইত্যাদি ক্যারি করার জন্যই ব্যাগটা ব্যবহৃত হয়।

সেই ব্যাগ থেকে একটা টিফিন বক্স বের করে এগিয়ে দিল ঊর্মি।

—'এই নাও।'

—'কী এটা?' মন্দার বিস্মিত!

—'খাবার।' সে মৃদু হেসেই উত্তর দেয়—'আমার স্পাইসি ফুড খাওয়ার একদম অভ্যেস নেই। এখানে লাঞ্চে রীতিমতো লংকার গুঁড়ো দেওয়া খাবার দেয়। তাই নিজের লাঞ্চ আমি সবসময়ই ক্যারি করি।'

মন্দারের দ্বিধা তবু কাটে না—'এটা তো তোমার খাবার!'

—'হ্যাঁ, আমার কথা ভেবেই বানিয়েছিলাম।' সে আবার হাসল—'কিন্তু আজ না হয় তুমিই টেস্ট করে দ্যাখো।'

—'কিন্তু তুমি...?'

—'আমি আজ তোমার লাঞ্চে ভাগ বসাব।' ওড়নাটা ফের তার চোখের ওপর এসে পড়েছে। সেটাকে বাঁ হাতে সরিয়ে হাসে ঊর্মি, 'আশা করি অসুবিধে হবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

একটু কিন্তু কিন্তু করতে করতেই টিফিন বাক্সটা খুলল মন্দার। ভেতরে জ্বলজ্বল করছে সাদা ফকফকে পাতলা রুটি, বেগুনভাজা আর আলুর তরকারি। রুটির এককোনা ছিঁড়ে আলুর তরকারি সুদ্ধু মুখে দিতেই মনে হল—অমৃত! সাধারণ একটা খাবারও যে এত সুস্বাদু হতে পারে তা জীবনে এই প্রথম জানল সে!

—'তরকারিটা তুমি করেছ!' মন্দার বিস্ময় আর প্রশংসা মাখা দৃষ্টি ঊর্মির দিকে ছুড়ে দিয়েছে—'ডেলিশিয়াস!'

ঊর্মি দু-চোখে স্নেহ মাখিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত একটা বাৎসল্য তার হাসির মধ্যে ফুটে ওঠে। মন্দারের মনে হল—এমনভাবে বোধহয় একমাত্র মেয়েরাই হাসতে পারে! অভুক্ত সন্তানের সামনে নিজের খাবারটুকু তুলে দিয়ে এমন তৃপ্তিমাখা হাসি হাসার ক্ষমতা শুধু গর্ভধারিণীরই আছে।

সে মুগ্ধ হয়ে ঊর্মির মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। এমন হাসি উশ্রীর মুখে কখনও দেখেনি। তার হাসিতে আকর্ষণী শক্তি আছে, মদিরতা আছে, কুহক আছে—কিন্তু স্নেহ, মমতা নেই!

কেন কে জানে, এই প্রথম তার বুকে অব্যক্ত একটা কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এমন হাসি কেন উশ্রী হাসে না!

—'কী হল? খাও!'

ঊর্মির কণ্ঠস্বরে সংবিৎ ফিরল মন্দারের। খিদেও পেয়েছিল খুব। প্রায় চেটেপুটেই রুটি, বেগুনভাজা, আলুর তরকারি শেষ করে ফেলেছে। খাওয়া শেষ করে খালি টিফিন-বক্সটা এগিয়ে দিয়ে বলল—

—'থ্যাঙ্কস ঊর্মি।'

—'ওয়েলকাম।'

—'দাঁড়াও...তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।' মন্দার হাত-মুখ ধুয়ে এসে ব্যাগ খুলতে খুলতে বলল—'দ্যাখো তো জিনিসটা কেমন? উশ্রীর পছন্দ হবে? আমি আবার মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ ঠিক বুঝি না।'

সে বাক্স খুলে হিরের আংটিটা দেখায়। এবার অবাক হওয়ার পালা ঊর্মির। হিরেটা আগুনের ছোট্ট কণার মতো দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলছিল। সেদিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বলল—'কী সর্বনাশ! এ তো খাঁটি ডায়মন্ড! কার জন্য কিনেছ? এত দামি জিনিস...!'

মন্দার সমস্ত কথা ঊর্মিকে খুলে বলে। কার জন্য কিনেছে, কেন কিনেছে, কীভাবে কিনেছে—সব। ঊর্মি তার সব কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। সব কথা যেন ঠিক মাথায় ঢুকছে না।

মন্দারের কথা শোনার পর সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। অদ্ভুত বিষণ্ণতা তাকে ছেয়ে আছে।

—'কী হল? উশ্রীর কি পছন্দ হবে না গিফটটা?'

মন্দারের শঙ্কিত কণ্ঠস্বর শুনে একটু যেন বিষণ্ণ হাসি হাসে ঊর্মি—'অপছন্দ হওয়ার মতো জিনিস তো নয়। কিন্তু মন্দার, তুমি কী কখনও উশ্রীকে তোমার ফিলিংসের কথা বলেছ?'

boierpathshala.blogspot.com

—'না।' মন্দার একটু চিন্তা করে জবাব দেয়—'সেভাবে কখনও বলিনি। কিন্তু ভ্যালেন্টাইনস ডে, রোজ ডে বা নিউ ইয়ারে সবসময় দামি দামি গিফট দিয়েছি। ও রিফিউজ করেনি কখনও।'

ঊর্মি চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—'অন্য দামি গিফটের কথা বলছি না। তবে হিরের আংটির ব্যাপার আলাদা। হিরেটার নিশ্চয়ই অনেক দাম। কিন্তু তার দামের চেয়েও বেশি দামি তোমার ফিলিংস। এটার পিছনে তোমার রক্ত, ঘাম, কৃচ্ছ্রসাধন জড়িয়ে আছে। এটা হিরের আংটি নয়, আসলে তোমার সমস্ত জীবন, সমস্ত অনুভব। কার হাতে যাবে সেটা বড়ো কথা নয়। বড় কথা, সেই হাতের এই আংটি পরার যোগ্যতা আছে কি না।'

মন্দার ঊর্মির কথা শুনছিল। তার বিরক্ত লাগছে। হঠাৎ করে ঊর্মি এমন ভাষণ দিতে শুরু করেছে কেন? বিরক্তিটা সম্ভবত তার মুখেও ছাপ ফেলেছিল। ঊর্মি সেটা লক্ষ করেই ফের বিষণ্ণ হাসিটা হাসে—'আমি তোমায় জ্ঞান দিতে চাই না মন্দার। শুধু এইটুকু বলতে চাই তোমার ফিলিংস যেন কারুর কাছে 'টেকেন ফর গ্রান্টেড' হয়ে না দাঁড়ায়। দ্যাটস অল।'

বলতে-বলতেই তার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যটা সরে গেছে। তার বদলে এখন একটা ছেলেমানুষি ভাব—'আর শুধু উশ্রীর জন্য গিফট আনলেই হবে? আমার জন্য কী এনেছ?'

সে আশ্চর্য হয়ে বলে—'তোমার জন্য?'

—'হ্যাঁ, আমার জন্য।' ঊর্মি মিটিমিটি হাসে—'জানো না? উশ্রী আর আমি টুইনস। আমাদের জন্ম একই দিনে। উশ্রী আমার থেকে দু-মিনিটের বড়ো। অর্থাৎ আজ আমারও জন্মদিন।'

মন্দার অপ্রস্তুত। এমন সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসেনি। উশ্রী আর ঊর্মি পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে, 'তুইতোকারি' করে। কিন্তু উশ্রী সর্বত্র ঊর্মিকে 'বোন' হিসেবে পরিচয় দেয়। সে পরিচয়টাই জানত মন্দার! ওদের দুজনের চেহারা, স্বভাব, ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ আলাদা! তাই কখনও মনে হয়নি ওরা যমজ বোনও হতে পারে।

—'ওঃ...আই অ্যাম সরি...।' সে আমতা আমতা করে বলে—'আমি জানতাম না... আই মিন...বুঝতে পারিনি। তোমাদের দেখতে তো...।'

—'একদম একরকম।' ঊর্মি মুখ টিপে হাসল...'শুধু বাইরের লোক সেটা দেখতে পায় না।' সে একটু থেমে ফের বলে—'কই, আমার গিফট তো দিলে না?'

ঊর্মির কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল মন্দার। দুজন একরকম দেখতে! বলে কী! ওদের দুজনের চেহারায় আকাশ-পাতাল তফাত!

বিস্ময়টা কোনোমতে গিলে ফেলে সে বলল—'তোমার জন্য তো কিছু আনিনি। সরি ঊর্মি।'

—'সরি বললে তো শুনছি না।' ঊর্মি ঢাউস ব্যাগটা খুলে একটা বিরাট ডায়ারি বের করে এনেছে। ডায়ারির একটা পাতা খুলে এগিয়ে দেয়—'দাও।'

মন্দার বিহ্বল—'কী?'

boierpathshala.blogspot.com

—'গিফট। উদীয়মান কবির সই সহ একটি তাৎক্ষণিক কবিতা।' সে বলল—'বলা যায় না, কোনোদিন হয়তো তুমি বিশাল নামী কবি হবে। আমাদের চিনতেই পারবে না। তখন এই গিফটটাই সবাইকে সগর্বে দেখিয়ে বলব—'মন্দার ভট্টাচার্য একসময় আমাকে চিনতেন।'

—'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!' মন্দার ফিক করে হেসে ফেলেছে। হাসতে হাসতেই তার ডায়ারিতে জন্মদিন উপলক্ষ্যে কয়েক লাইনের একটা ছড়া লিখে দিল—

এই মরেছে, এই মরেছে, এই হয়েছে কেলো!

হেড্ডিমণির জন্মদিনে কেকটা কোথায় গেল?

ফেট্টিবাঁধা দুষ্টুবুড়ি

মিষ্টি কথায় মিছরি ছুরি

রূপের ঠ্যালায় কোথায় লাগে অ্যাঞ্জেলিনা, জেলো!

কেক আনিনি, গিফট আনিনি, তাই তো বাজাই বাজা,

ট্যাঁকের কৃপায় আমি সদাই বোম্বাগড়ের রাজা।

এমন সাধের জন্মদিনে

নাই বা দিলুম কিছুই কিনে

দিদিমণি, তুমিই সত্য, বাদবাকি সব গাঁজা!

—'ও-মা! লিমেরিক!' ঊর্মির মুখ খুশির হাসিতে ঝলমল করে উঠেছে—'কী সুন্দর হয়েছে!'

—'পছন্দ হয়েছে তোমার?'

—'ভীষণ...ভীষণ...ভীষণ', সে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বাসিত—'তুমি আজকের পার্টিতে আসবে তো? আমার সব বন্ধুদের আমি কবিতাটা পড়ে শোনাব...।'

—'পার্টি!'

—'হ্যাঁ, পার্টি।' ঊর্মি একটু যেন অবাক হয়—'কেন? উশ্রী তোমায় ইনভাইট করেনি?'

মন্দার কিছু বলার আগেই উশ্রী এসে পড়ল। তার মুখে তখনও মেক-আপ। শট দিয়ে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মন্দারের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলল—'হাই মন্দার।'

—'হাই উশ্রী।' সে হিরের আংটির বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে—'হ্যাপি বার্থ ডে। ভেরি ভেরি রিটার্নস অফ দ্য...'

—'কী এটা?' উশ্রী নিরুৎসুকভাবে বাক্সটা খুলল। বাক্সের ভেতর হিরেটা ঝলমলিয়ে উঠেছে।

অথচ সেই ঝলমলানির কণামাত্রও উশ্রীর মুখে দেখতে পেল না মন্দার। ভেবেছিল আংটিটা তাকে পরিয়ে দেবে। কিন্তু সে নিজেই আংটিটা পরে ফেলেছে। বেশ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে তার ভুরু কুঁচকে গেল। ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বলল—'কী মনে হয়? এটা এক ক্যারাট হবে?'

ঊর্মির হাসি ঝলমলে মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মন্দারের মনে হল শনিদেব নয়, এবার চড়টা তাকে উশ্রীই মেরেছে।

boierpathshala.blogspot.com

—'না।' তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। তবু কোনোমতে বলল—'ফরটি ফাইভ সেন্ট।'

অদ্ভুত তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উশ্রী বলে—'এক ক্যারাটের নীচে হিরে হিরেই নয়।'

—'উশ্রী,...।' ঊর্মির মুখ রাগে থমথম করছে—'এটা কী জাতীয় ভদ্রতা? তুই জানিস কত কষ্ট করে এই আংটিটা ও কিনেছে?'

—'দ্যাটস নট মাই প্রবলেম।' উশ্রীর মুখে সেই কুহকমাখা হাসি। মন্দারের হঠাৎ মনে হল এমন কুৎসিত নির্বোধ হাসি আগে কখনও দেখেনি।

—'একটা মিডলক্লাস ঘরের সাধারণ স্ক্রিপ্টরাইটারকে আমি হিরে গিফট দিতে বলিনি।' সে তার ঘন চুলে হাত বোলায়—'এনিওয়ে আই অ্যাম টায়ার্ড।'

মন্দারের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। এমন অপমানিত সে কখনও হয়নি। সকাল থেকে কত কিছুই না কল্পনা করেছে। কেউ যেন সেই কল্পনাকে এক হাতুড়ির বাড়ি মেরে খানখান করে দিল।

তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন। নাক-কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। তবু দাঁতে-দাঁত চেপে বলল—'আমি জানতাম না উশ্রী, তুমি আমার সম্পর্কে এরকম ভাবো!'

—'কাম অন...গ্রো আপ মন্দার!' উশ্রী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে—'এরকম, ওরকম তো দূর। আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই ভাবি না! তোমাকে নিয়ে ভাবার সময় আমার নেই।'

বলতে-বলতে সে উঠে দাঁড়িয়েছে—'আমার কাজ আছে। অ্যান্ড মন্দার, থ্যাঙ্কস ফর দ্য গিফট।'

মন্দার দেখল ঊর্মি তার দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল একটু আগেই তার বলা কথাগুলো।

—'এটা হিরের আংটি নয়, আসলে তোমার সমস্ত জীবন, সমস্ত অনুভব! কার হাতে যাবে সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, সেই হাতের এই আংটি পরার যোগ্যতা আছে কিনা।...'

তখন ভীষণ ভেবে বিরক্ত হয়েছিল সে। কিন্তু...।

—'দাঁড়াও উশ্রী।' কোথা থেকে তার মধ্যে এত জোর এল, মন্দার জানে না। কিন্তু সে বিদ্যুৎগতিতে উঠে গিয়ে উশ্রীর সামনে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে চোখ রেখে বলল —'আংটিটা ফেরত দাও।'

উশ্রী যেন তার কথাটা বুঝতে পারেনি। থতোমতো খেয়ে বলে—'সরি...!'

—'আই অ্যাম সরি উশ্রী।' তার কণ্ঠস্বরে জেদ, রাগ, ক্ষোভের মিলিত প্রকাশ—'এই আংটিটা তোমার জন্য নয়। ফেরত দাও।'

উশ্রীর ফরসা মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে বিনাবাক্যব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গেই হাত থেকে খুলে আংটিটা ছুড়ে দিয়েছে তার মুখের ওপর। খপ করে সেটাকে লুফে নিল মন্দার। শান্ত স্বরে বলল—'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আমার অ্যান্টাসিডের শিশি,

দাঁতে সকালবেলার মিশি,

boierpathshala.blogspot.com

বউয়ের বাসি মুখের কিসি
নিয়ে মধ্যবিত্ত আমি।

হাতের বাবরি আমল ছাতায়,
প্রভুর চিত্রগুপ্ত খাতায়
ভুঁড়ি ইন্দ্রলুপ্ত মাথায়
নিয়ে নিটোল গৃহস্বামী।

আবেগ নেয় না কোনো ঝুঁকি,
তোমায় ডিস্কো প্রণাম ঠুকি,
তবু দেয় না কপাল উঁকি
প্রভু আধকপালী ছেড়ে,—

মেশে রক্তে চিনি স্নেহ।
তবু পাঁঠামৃতই দেহো!
যতই বাড়ুক মধুমেহ,
ডোবা কবজি তোলে কে রে!

বহর ছোট্ট লম্বোদরো।
কাব্যে সখী আমায় ধরো!
ফিলিম মোগ্যাম্বো গব্বরও
আমার ডেইলি হাতিমতাই।

ঘরে বৌ-মায়ে কারগিল
আমি বিষণ্ণ চার্চিল
ইস্যু তাল হয়ে যায় তিল
‘প্রভু নষ্ট হয়ে যাই।’

আমি বাসে ট্রামে চড়ি
কনুই হিলের গুঁতোয় মরি
আজও স্বপ্নে দেখি পরি

boierpathshala.blogspot.com

পাঁচীর সঙ্গে খাটে শুয়ে...!

তোমার বৈকুণ্ঠে বাতি
আমার লোডশেডিংই সাথী।
যতই হই না আমি পাতি
ঝড়ে পড়ছি না তো নুয়ে!
তোমার একটেরে চোখ খোলা
আশিস তাদের জন্য তোলা
যাদের ব্যাংকে টাকার গোলা
দেশের শুম্ভ-নিশুম্ভ।

আমি সবার জন্য আছি
একা যুদ্ধ করেই বাঁচি।
যতই দাও না পাছায় কাঁচি
জমি ছাড়ছে না কুম্ভ।

যারা লক্ষহিরা ছড়ায়
তোমায় বুর্জোয়া-পাঠ পড়ায়
সোনা রুপোর মুকুট গড়ায়
তাদের বাড়ুক তসিল খান!
ধনে থাকি বা নাই থাকি
মনে ডাকছে অচিন পাখি
নিজের জীবন নিজেই আঁকি
আমিই মধ্য ভগবান!

—'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

শুঁটকি অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে গহনের দিকে তাকিয়েছে—'কবিতাটা লিখেছিস ভালো। এটাও ঘটনা যে তোর পরিচিত রাইটিং স্টাইল ভেঙে বেরিয়েছিস। কিন্তু প্রশ্নটা সেই একই জায়গায়—'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

গহন অসহিষ্ণু হয়ে বলেন—'তুইও কপালকুণ্ডলা নোস, আমিও নবকুমার নই। তাহলে হঠাৎ করে বঙ্কিমবাবু এসে পড়লেন কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

—'বঙ্কিমবাবু আসেননি। প্রশ্নটা এসেছে।' শুঁটকি বলল—'তুই ভাবছিস যে পরিচিত ছক ভেঙে বেরিয়েছিস। তা বেরিয়েছিস ঠিকই। কিন্তু নিজের পরিচিত ছক ভাঙতে গিয়ে অন্য একটা ছকে ঢুকে পড়েছিস। যেটা আমাদের কাছেও সমান পরিচিত।'

—'মানে?'

—'কমেন্টগুলো দ্যাখ।'

কবিতার নীচে বড়ো বড়ো ব্লকে ত্রিশটা কমেন্ট পড়েছে। 'আকাশনীল' লিখেছে —'আরে, এ তো পুরো ঝিঙ্কু চিকু। মিঠুনের ফিলমে রম্ভার নৃত্য! একেবারে স্বপ্নিলীয় স্টাইল।'

ব্যাসদেব বলেছেন—'এতদিনে একটা অন্যরকম কবিতা পড়লাম। শব্দচয়ন দুর্ধর্ষ। ছন্দ জমে ক্ষীর! আপনি কি স্বপ্নিল আচার্যের ফ্যান?'

নিধিরাম সর্দারের মন্তব্য—'পুরো চম্পা মাল মামা। স্বপ্নিল, স্বপ্নিল গন্ধ! পাগলা, ক্ষীর খা কুলস্য কুল।'

গহন সবকটা কমেন্টেই চোখ বোলালেন। তারপর বিভ্রান্তভাবে বলেন—'এতে দেখার কী আছে? এতদিন 'ঝুলস্য ঝুল' ছিলাম। এখন 'কুলস্য কুল' হয়েছি।'

—'এই!' শুঁটকি চেয়ারের হাতলে আলতো চাপড় মারে—'এই হচ্ছে তোর পলায়নপর মনোবৃত্তি। ভালো ভালো জিনিসগুলো দেখলি—অথচ আসল জিনিসটাই দেখলি না!'

—'কি দেখিনি?'

—'প্রত্যেকেরই কবিতাটা ভালো লেগেছে। কিন্তু...!' সে পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে—'প্রত্যেকেই বলেছে যে কবিতাটায় 'স্বপ্নিল',...'স্বপ্নিল' গন্ধ আছে। নতুন প্রজন্মের ফেমাস কবি স্বপ্নিল আচার্য ঠিক এইরকম ভাষাতে, এইরকম স্টাইলেই কবিতা লেখেন। কবিতাটা ভালো হয়েছে নো ডাউট। তোর অন্যান্য লেখার থেকে আলাদা হয়েছে তা-ও ঠিক। কিন্তু স্বপ্নিলের কবিতার মতো হয়েছে। তুই নিজেকে ভাঙতে গিয়ে অন্য একজনের মতো করে গড়ে ফেলেছিস।'

গহন কপালে হাত রেখে শুঁটকির কথা শুনছিলেন। সে বিন্দুমাত্রও বাড়িয়ে বলছে না। কবি স্বপ্নিল আচার্যের অনেক কবিতা পড়েছেন তিনি। লেখার সময়ে মনে হয়নি যে, সেই আদলেই কবিতাটা গড়ে উঠছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন সত্যিই ওটা স্বপ্নিলীয় স্টাইল হয়ে গেছে!

—'নিজেকে ভাঙছিস ভাঙ।' শুঁটকি বলে—কিন্তু নিজের মতো করে ভাঙ। নিজের মতো করে শব্দ বেছে নে। অন্যের মতো নয়। একটা জিনিস দেখাই তোকে।'

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। গহন দেখলেন শুঁটকি তার লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছে। নির্ঘাত এখনই কোনো বই এনে বলবে—'তোর এটা পড়া উচিত।' কিংবা কোনো বইয়ের রেফারেন্স এনে সুদীর্ঘ ভাষণ দেবে। বলবে, কবিতা কাকে বলে, কবিতা কী জন্য কবিতা —এইসব!

ভেবেই মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন গহন। শুঁটকির লেকচার হজম করা রীতিমতো কঠিন কাজ। সে শুরু করতে জানে, থামতে জানে না।

boierpathshala.blogspot.com

বাস্তবে অবশ্য সেসব কিছুই ঘটল না। শুঁটকি দলামোচা পাকানো, হলদে হয়ে যাওয়া কাগজ নিয়ে এসেছে। গহনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'পড় এটা।' গহন সবিস্ময়ে দেখলেন হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজে নীল অক্ষরে গোটা গোটা হরফে একটা কবিতা লেখা আছে—

—'এ কী!' তিনি বিস্মিত চোখজোড়া তুলে তাকালেন বন্ধুর দিকে— 'এ তো...।'

—'হ্যাঁ, তোরই কবিতা।' শুঁটকি বলে—'আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে, তুই নিজেই লিখে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলি। কুড়িয়ে রেখেছিলাম। এটা অন্যদিক দিয়ে ইউনিক গহন। কারণ এমন কবিতা তুই আর কখনও লিখিসনি। যদিও তোরই লেখা উচিত ছিল।'

গহন চোখ বুজলেন। তিনি জানেন এবার সে কী বলবে—

—'তোকে আমি এসকেপিস্ট কেন বলি জানিস?' শুঁটকি বলে—'কারণ তুই চিরকাল জীবনের সেই দিকটার দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছিস, যে দিকটা তোর চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।'

সে চুপ করে গেল। গহনও স্তব্ধ। তিনি আন্দাজ করতে পারেন শুঁটকি কোন দিকের কথা বলছে। যে সময়ের কথা ভুলে যেতে চান, ঠিক সময়ের কথাই বলছে সে।

মুখ নীচু করে গোঁজ হয়ে বসেছিলেন গহন। শুঁটকির দিকে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারছেন যে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিকেই নিবদ্ধ। ভেতরে ভেতরে একটা তীব্র প্রতিবাদ জন্ম নিচ্ছিল। যে প্রতিবাদে একদিন সেই সময়টার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, ডুবে গিয়েছিলেন রোমান্টিসিজমে। মনে হয়েছিল—'কেন লিখব? যে ক্ষত বুকে আছে তা থাক। ভিখিরির মতো দেখিয়ে বেড়াব কেন? যে অসুখের কথা ভুলে যেতে চাই, তাকে ফিরিয়ে আনব কোন যুক্তিতে?'

—'তুই শুধু রোমান্টিক কবিতাই লিখিস কেন?' সে তীব্র দৃষ্টিতে গহনকে দেখছে —'খুব অল্প বয়সে একটা অশান্ত সময় দেখেছিস। যদিও সে সময়কে বোঝার মতো বয়েস তখন তোর বা আমার—কারুর ছিল না। কিন্তু সেই সময়টা তোকে একটা জোরদার ধাক্কা দিয়ে গেছে। ছাপ ফেলে গেছে। আজও তেমন একটা সময় আসছে গহন। আবার একটা অস্থির সময়। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও চাঁদ-তারা-ফুল-পাখির সৌন্দর্যে নিজেকে জোর করে ডুবিয়ে রাখবি! কেন তাকাবি না সেই অস্থিরতার দিকে?'

—'আমি কবিতা লিখতে চাই।' গহন যেন একটু উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলেন—'স্লোগান লিখতে চাই না।'

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই বাধা পড়ল। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে ঘরে এসে ঢুকেছে। গহন দেখেই চিনতে পারলেন। এই সেই ছেলেটা। যে সেদিন 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটা আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলেছিল। তিনি অবাক! ছেলেটা এখানে কী করছে? শুঁটকির সংসারে নতুন অতিথি!

—'কহো গোপাল...।' শুঁটকির সস্নেহ চোখ ছেলেটার দিকে ফিরল—'কী সমাচার?'

গোপালকে এখন আর চেনাই যায় না। পরনে ঝকঝকে তকতকে জামা। মাথায় শ্যাম্পু আর গায়ে সাবান পড়েছে। তবে মাথার উকুনগুলোর রাজত্ব বোধহয় এখনও কায়েম। সে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে—'ভাত কি বসিয়ে দেব?'

boierpathshala.blogspot.com

শুঁটকির ভুরু কুঁচকে গেছে। ভ্রূকুটি করে বলল—'তোকে কি আমি ভাত রাঁধতে বলেছি? যা করতে বলেছি সেটা কতদূর?'

মুখ কাঁচুমাচু করে বলল গোপাল—'দীঘ্যইটা লিখতে পাচ্ছিনে কো।'

'দীর্ঘই'টা লিখতে পারছ না, তাই ভাত রাঁধার এত তাড়া।' সে ধমক দেয়—'যা। লেখার চেষ্টা করগে। না পারলে দেব এক কানের গোড়ায়...।'

ছেলেটা বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে চলে গেল। গহন গোটা ঘটনাটা সবিস্ময়ে দেখছিলেন। এবার মুখ খুললেন—

—'তুই কি সাক্ষরতা অভিযানে নেমেছিস শুঁটকি!'

—'আরে, নাঃ।' শুঁটকি মৃদু হাসে—'ঠিক তা নয়। ব্যাটাকে পুষ্যি নিয়ে নিলাম, বুঝলি?'

—'কিন্তু হঠাৎ...।'

—'হঠাৎ নয়। হিস্ট্রি আছে। গত বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে ফিরছি, চোখে পড়ল ব্যাটা রাস্তার ওপরে বস্তা পেতে ঘুমোচ্ছে।' সে আড়চোখে দেখে নেয় যে গোপাল ধারে-কাছে আছে কিনা। তারপর দরজা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। গোপাল রাস্তার ওপরে ঘুমোচ্ছিল। আর ওর ঠিক পাশেই কি যেন একটা চিকচিক করছে। রাস্তার আলোয় দেখি চকচকে জিনিসটা অল্প অল্প নড়ছেও।'

—'তারপর?'

—'তারপরই তো কেলো! সন্দেহ হল! কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে যা দেখলাম, তুই জাস্ট ভাবতে পারবি না।' শুঁটকি চোখ বড়ো বড়ো করেছে—'একটা আস্ত গোখরো সাপ! কলকাতার রাস্তার কোথা থেকে এল কে জানে। কিন্তু দিব্যি ফণা গুটিয়ে গুঁড়িসুড়ি মেরে গোল হয়ে শুয়ে আছে! একবার ভেবে দেখ, বাচ্চা ছেলেটা ঘুমিয়ে আছে। তার পাশে একটা গোখরো সাপ! একটু নড়াচড়া করলেই কামড়ে দিত।'

কলকাতার যীশুদের হেঁতালের লাঠির দরকার পড়ে না!

ভাবতেই গা শিরশির করে ওঠে গহনের। দৃশ্যটা তিনি কল্পনাও করতে চান না!

—'তাড়াতাড়ি গিয়ে সাবধানে গোপালকে ডেকে তুললাম। প্রথমে তো উঠতেই চায় না। তারপর ঘুম ভেঙে পাশের প্রাণীটিকে দেখেই 'আই বাবা' বলে চেঁচিয়ে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরল।' শুঁটকি বিষণ্ণ হাসল—''বাবা' শব্দটা এই প্রথম শুনলাম জানিস। বুবাই কখনও বলেনি। বড়ো ছোট্ট শব্দ। কিন্তু মায়াবী। মায়ায় জড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম আমিও একা, ওরও জগতে কেউ নেই। দুই কপালপোড়া মিলেই না হয় একসঙ্গে থাকি। ভাতেভাত, ডাল-ভাত আমার যা জোটে, ওরও দুটো যা হোক করে জুটে যাবে। ব্যস, তারপর থেকেই গোপাল বাবাজির এখানে অধিষ্ঠান। সব ভালো, শুধু পড়তে বললেই হাই ওঠে—এই যা দোষ।'

গহন আপন মনে কী যেন ভাবছিলেন। ঠিক গোপালের অর্ধেক বয়সেই গোখরো সাপের চেয়েও বিষাক্ত কিছুর ছোবল খেয়েছিলেন তিনি। শুঁটকির দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে রুধির জমছিল। যেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জানতে চাইছেন—'আমাকেও তো সাপে কামড়েছিল! তখন তুই কোথায় ছিলি শুঁটকি!'

boierpathshala.blogspot.com

‘যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায়

আমি তাকে ঘৃণা করি

যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে

আমি তাকে ঘৃণা করি

যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি

প্রকাশ্য পথে হত্যার প্রতিশোধ চান না

আমি তাকে ঘৃণা করি’...

সকাল থেকেই দিনটা থমথমে। বাবা সাত দিন হল বাড়ি ফেরেননি। বাড়িতে একা মা, যুবতী মেয়ে আছে আর ছ-বছরের ছেলে। বাচ্চাটা জানে না বাইরে ঠিক কী হচ্ছে! বাবা কেন বাড়ি ফেরেন না তা-ও তার জানার কথা নয়! মাঝেমধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মা আর দিদি কেন চমকে ওঠে, সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই। সে শুধু জানে, কিছুদিন যাবৎ একটা বন্দিজীবন তাকে ঘিরে ধরেছে। স্কুলে যাওয়া বন্ধ। বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে খেলতে যাওয়া বারণ। শুধু স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালের চৌহদ্দির মধ্যেই তার দিন কাটছে।

এ বাড়ির ভেতরে রোদ ভুলেও উঁকি মারে না। সবসময়ই একটা স্থির শীতলতা। কেন যেন তার মনে হয়—শীত শীত ভাবটা এ ক’দিনে আরও বেড়েছে। আগে এই চত্বরটা সরগরম থাকত। ফুচকাওয়ালার দোকানের ভিড়ে, পানের দোকানে, চায়ের ঠেকের জমজমাট আড্ডায় গমগম করত চতুর্দিক।

কিন্তু বেশ কিছুদিন হল দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়েছে। কার অদৃশ্য ইশারায় যেন সন্ধে সাতটার পরই চুড়িসারে পড়ে যায় দোকানের ঝাঁপ। শুনশান হয়ে যায় রাস্তা। দু-একটা বেওয়ারিশ কুকুরের ‘ভৌ ভৌ’ নিস্তব্ধতাকে আরও বেশি প্রকট করে তোলে।

কখনো-কখনো অবশ্য গভীর রাতে কিছু বিজাতীয় শব্দ শুনতে পায় ছেলেটা। হঠাৎ করেই রাতের থমথমে নৈঃশব্দ্যকে চিরে বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ বাঁশি। দুমদাম করে কান ফাটানো আওয়াজ! বারুদের উৎকট গন্ধ! দুপদাপ করে কয়েক জোড়া ভারী বুট শব্দ তুলে ছুটে যায়। তারপরই ‘দুড়ুম’ করে আরও একটা শব্দ!

ছেলেটা চমকে ওঠে। জানলা দিয়ে উঁকি মারতে চায়। কিন্তু মা তাকে বাধা দেন।

—‘ওটা কীসের শব্দ মা?’

ছেলের উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে মা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেন—

—‘কিছু না বাবা। ছেলেরা বাজি ফাটাচ্ছে।’

—‘বাজি ফাটাচ্ছে! আজ কি পুজো?’

—‘হ্যাঁ।’

—‘আমি পুজো দেখব মা...।’

মা অদ্ভুত আতঙ্কে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছেন—‘না খোকা। এ পুজো দেখতে নেই!’

পুজো কেন দেখতে নেই এ প্রশ্নটা খোকার মাথায় বারবার ধাক্কা মারতে থাকে। মা তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, এটা বড়োদের পুজো। ছোটোদের দেখতে নেই। ছোটোরা

boierpathshala.blogspot.com

দেখলে ঠাকুর পাপ দেয়। ছেলেটা মায়ের বুকে মাথা রেখে মশারির দিকে তাকিয়ে কতকিছুই না ভাবে।...বড়ো হয়ে সে বাবার সঙ্গে বড়োদের পুজো দেখতে যাবে। বাবা ফিরে এলে বলবে রাত্রে মাঝে মাঝে যে বাঁশি বাজে, সেইরকম বাঁশি কিনে দিতে...দিদিকে মেলা থেকে লাল কাচের চুড়ি কিনে দেবে। লাল রং পরলে দিদিকে খুব সুন্দর লাগে...।

ঘুমে দু-চোখ বুজে আসার আগে ক্ষীণভাবে কানে আসে জানলার বাইরে কাদের যেন ফিসফাস। কিছু একটা ঘষটে টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ! তার ঘুমে অসাড় হয়ে আসা মস্তিষ্ক তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না।

এমন করেই কেটে যাচ্ছিল দিন। ছেলেটার জীবনে তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। তবে তার কৈশোরের স্বভাবজাত কৌতূহলে মনে কিছু প্রশ্ন এসে ভিড় জমাচ্ছিল। বাবা কোথায়? কবে বাড়ি ফিরবে? মধ্যরাত্রে কারা যেন এ বাড়ির চতুর্দিকে লঘু পায়ে হেঁটে বেড়ায়। ফিসফিস করে কথা বলে। ওরা কারা? মা আর দিদি হাসে না কেন? বাইরে বেরোনো বারণ কেন?

অনেক জিজ্ঞাসা করেও প্রশ্নের জবাব কখনও পায়নি সে। তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে, এ আসন্ন প্রলয়ের ইঙ্গিত! কখনও অনুভব করতে পারেনি আজকাল হাওয়াও বড়ো সাবধানে বয়। গাছের পাতাও খুব সন্তর্পণে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে। চতুর্দিক গুমোট হয়ে এসেছে। অবধারিতভাবে ঝড়ও আসবেই।

আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছেলেটা তখন সূর্যোদয়ের ছবি আঁকছিল! কমলা রঙের সূর্য পাহাড়ের মাথায় উঁকি মারছে। সাদা বরফে ঢাকা পাহাড় সোনালি হয়ে উঠেছে। তার পায়ের কাছে একটা রুপোলি নীল রঙের নদী। নদীর জলে সোনা রঙের আভা!

সে রাতেও সে বড়ো যত্ন নিয়ে ছবিটা আঁকছিল। কমলা, গোলাপি আকাশে হালকা কালো রং দিয়ে একঝাঁক পাখির উড়ে যাওয়া চিহ্নিত করছিল ছেলেটা।

হঠাৎ নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে প্রচণ্ড বোমার শব্দ! বন্ধ দরজার বাইরে কয়েকজোড়া ভারী বুটের কর্কশ আওয়াজ! পরক্ষণেই কড়া নাড়ার পুরুষ শব্দ!

মা আর দিদি চমকে উঠে পরস্পরের দিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিপাত করছে। ছেলেটা ভাবে, ওরা এত ভয় পাচ্ছে কেন? বাবা হয়তো ফিরে এসেছে। সে উল্লসিত হয়ে ওঠে। বাবা এলে তাকে এই নতুন ছবিটা দেখাবে। জানতে চাইবে—কেমন হয়েছে?

দরজায় ফের প্রবল কড়া নাড়ার শব্দ। মা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কে'?

—'পুলিশ। দরজা খুলুন।'

মা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই বাড়িতে যেন ঝড় বয়ে গেল! একদল উর্দিপরা লোক ভেতরে ঢুকে পড়ে গোটা বাড়ি তছনছ করতে লাগল। জলের কলশি ভেঙে, বাবার বইয়ের টেবিল উলটে ফেলে, তক্তপোশের চাদর ছিঁড়ে, বালিশ ছুড়ে ফেলে দিয়ে অসম্ভব প্রতিশোধস্পৃহায় কী যেন খুঁজছে।

মুহূর্তের মধ্যে বাড়িটাকে লন্ডভন্ড করে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল তারা। কিন্তু যা খুঁজছিল তা হয়তো পেল না। ভীষণ আক্রোশে মুখ লাল করে এসে মাকে বলল—'মাস্টার কোথায়?'

ছেলেটা দেখল মায়ের মুখ শক্ত। কঠিন দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ। জোরালো গলায় বললেন —'জানি না।'

boierpathshala.blogspot.com

প্রচণ্ড একটা শব্দ! সে বিস্ফারিত চোখে দেখে যে, উর্দিপরা একটা লম্বা-চওড়া লোক মাকে চড় মারল। দাঁতে দাঁত পিষে বলল—'হারামজাদি! ছেনালিপনা হচ্ছে! মাস্টার কোথায়? কোথায় লুকিয়ে আছে?'

মায়ের গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। ব্যথায় চোখে জল এসে গেছে। তবু সেই জলেই যেন আগুন জ্বলল। রুদ্রাণীর মতো অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়েছেন তিনি।

—'জানি না। জানলেও বলব না।'

—'খানকি মাগী!'

আবার একটা জোরালো থাপ্পড়! লোকটা মায়ের চুলের মুঠি চেপে ধরেছে। হিড় হিড় করে টানতে বলল—'চল থানায় চল। বেশি চর্বি হয়েছে না? সব চর্বি নামিয়ে দেব শালি!'

মা কঁকিয়ে উঠলেন। অসহায়ভাবে চুলের গোছা ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। কিন্তু পাষণ্ড লোকটার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

আর-একটা লোক চেপে ধরল দিদিকে। সে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। তাকেও মেঝেতে ঘষটাতে ঘষটাতে টেনে নিয়ে চলল ওরা। অমানুষিক প্রতিশোধস্পৃহায় অশ্লীল সব গালিগালাজ দিচ্ছিল লোকগুলো।

—'ডবকা রান্ডি বাড়িতে পুষেছে শালা! গতরে এত গরম! তোর সব গরম আজ ঠান্ডা করব মাগী। নাঙ কোথায় জানো না! মুখ না খুললে চামড়া খুলে নেব! থানায় চল। মাস্টার পুলিশ খুন করে লুকিয়ে বেড়ায়। আর মাগীরা ছেনালিপনা দেখাচ্ছে!'

ছেলেটা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল। ঠিক যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে! এমন বাস্তবে হয় না! হতে পারে না! সে তো আজ সকালেও দেখেছে পায়রারা ঝাঁক বেঁধে আকাশে মনের সুখে উড়ে বেড়াচ্ছে। আজও কৃষ্ণচূড়া গাছটা ফুলে ফুলে লাল হয়ে আগুন ছড়াচ্ছিল! বিকেলেও তুলসীতলায় প্রদীপ স্নিগ্ধ নীল শিখায় জ্বলে উঠেছে, শাঁখ বেজেছে, ধূপের শান্ত সৌরভে চতুর্দিক 'ম' 'ম' করেছে। তার মধ্যে এই লোকগুলোর আসুরিক অস্তিত্ব কোথায়!

সে ছুটে গিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। যে লোকটা মাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মায়ের হাত টেনে ধরে কাতর গলায় বলে—'তোমরা আমার মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও।'

কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা! উদভ্রান্তের মতো সে একবার দৌড়ে যাচ্ছে মায়ের দিকে, আর-একবার দিদির দিকে। লোকগুলোর হাত ধরে টেনেও ছাড়াতে পারল না কাউকে। নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে কতগুলো পাশবিক লোকের উন্মত্ত গালিগালাজ, দুই অসহায় নারীর আর্তচিৎকার আর একটি বাচ্চা ছেলের কান্না ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল চতুর্দিকে।

ছেলেটা তখন একজনের পা চেপে ধরেছে। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল —'আমার মাকে, দিদিকে নিয়ে যেয়ো না...ওদের ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...।'

লোকটা এক লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে তাকে। শক্ত বুটের লাথিটা তলপেটে পড়েছে। একটা কাতর শব্দ করে ছিটকে পড়ল সে। ভীষণ ব্যথা লেগেছিল। মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি মরে যাবে। তবু সামনের পৈশাচিক দৃশ্য অমন শান্ত ছেলেটাকেও হিংসা শিখিয়ে দিল। সে

boierpathshala.blogspot.com

উন্মত্ত বনবিড়ালের মতো লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে-কামড়ে দিচ্ছে। যেন পারলে নখ-দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে তাদের!

—'ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও...আমার মাকে...দিদিকে...ছেড়ে দাও।'

—'শুয়োরের বাচ্চা!'

কানের তলায় একটা মোক্ষম ঘুসি। চোখে আচমকা অন্ধকার দেখল ছেলেটা! কান বেয়ে তরল, উষ্ণ কী যেন একটা চুঁইয়ে পড়ছে!

সম্পূর্ণ অচেতন হওয়ার আগে টের পেল কতগুলো শক্ত ভারী বুট তাকে নেড়ে-চেড়ে দেখছে। কেউ যেন ফিসফিস করে বলে—

—'মরে গেল নাকি স্যার!'

'থুঃ' করে তার মুখে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিয়ে বলল আর-একজন— 'হারামের পিল্লা! বেঁচে থাকলে তো বাপের মতো হারামি হত! মরাই ভালো।'

তারপর আর কিছু মনে নেই ছেলেটার! কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল জানে না।

শুধু মনে আছে, ভোর রাতে একটা জিপ বাড়ির সামনে ছুড়ে দিয়ে গিয়েছিল দুটো ছিন্নভিন্ন দেহকে! দেহ দুটো তখনও জ্যান্ত ছিল। কিন্তু প্রাণহীন।

মা তারপর থেকে আর কোনো কথা বলেননি। চোখের সামনে যে বীভৎস দৃশ্য দেখতে হয়েছিল তা বর্ণনা করার জ্বালা সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। সে রাতের পর থেকে তিনি মূক, স্থবির পাথরে পরিণত হয়েছিলেন।

ছেলেটা ঝাপসা চোখে দেখেছিল, দিদি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। তার শাড়ি ছিন্নভিন্ন, কপালে কালশিটে। গলায় জমাট রক্ত। কামড়ের দাগ! ঠোঁটের কোণ বেয়ে জমাট রক্তের ধারা শুকিয়ে আছে। চুল অবিন্যস্ত। ব্লাউজটা ছেঁড়া! শাড়ির নিম্নদেশ রক্তে ভিজে গেছে।

—'দিদি!'

কান্নাজড়ানো আর্তসুরে ডেকেছিল সে। তার সর্বাঙ্গে ব্যথা। তবু কোনোমতে দেহটাকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল দিদির কাছে। দু-হাতে দিদির ক্ষতবিক্ষত মুখ ধরে ব্যাকুল স্বরে ডেকেছিল—'দিদি...দিদি...দিদি...।'

দিদি কোনো উত্তর দেয়নি। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অন্যদিকে। ভাই তাকে ছেড়ে দিতেই কাত হয়ে পড়ে গেল!

ঠিক তার পাশেই সেই সূর্যোদয়ের ছবিটা পড়ে আছে! সে অসহায় জলভরা চোখে দেখল, কমলা রঙের সূর্য, সাদা সোনালি পাহাড়, রুপোলি নীল রঙের নদী, গোলাপি আকাশ—সব লাল হয়ে গেছে! সব লাল!...

দিদিকে লাল রঙে ভারি সুন্দর লাগত! সেই দিদিই দেহের লাল তরল অংশকে ভীষণ ঘেন্নায় ত্যাগ করেছিল। যে দিদিকে লাল চেলি পরলে ঊর্বশী মনে হত, সেদিন সে সাদা হয়ে গিয়েছিল!

'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না

এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ না

এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না

boierpathshala.blogspot.com

এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না।

বাবা, দরজাটা খুলে দাও—
চাবুকগুলো অনেকদিন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—
আমি এখনও অন্ধকার ঘরে অরণ্যদেব...অরণ্যদেব খেলি
সাদা ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পায়াভাঙা চেয়ারটাকে
সাদা ঘোড়া ভাবি।
দরজাটা খুলে দাও, ওরা ভিতরে আসুক
কশাঘাতে কশাঘাতে ফিরিয়ে দিক রক্তাক্ত সন্ধ্যা!

বাবা, আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলে।
'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা'—
যারা তোমার লাশ হয়ে যাওয়া মাংসের পিণ্ডটাকে
জুতোর তলায় চেপটে দিয়েছিল
তারা কি জানত 'জনগণমন' কাকে বলে?
যে মাছিগুলো ভনভন করে মুখের রক্ত চেটে খাচ্ছিল,
শুকিয়ে যাওয়া মৃত্যুকালীন রক্তবমি, আর তিন দিনের
পচা-বাসি লাশের দুর্গন্ধে
স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল তারা!

বাবা, তুমি জানো না, স্বাধীনতা মানে রোজ সকালে বমি করে
অম্ল-পিত্ত উগরে দেওয়া!
স্বাধীনতা মানে—রোজকার হাগু—মুতু,
এক নারীকে মন্থন অথবা ধর্ষণ করে বীর্যপতনের অধিকার।
অথবা নীলছবি দেখে উত্থিত শিশ্নসবল শীৎকারে হস্তমৈথুন!
ভডকা থেকে রাম, চুমু থেকে সিগারেট,—সব স্বাধীনতা!

শুধু যে বাঞ্চোত বলে 'আমি আমার মতন দেশে বাঁচতে চাই'
গুলি করে মারো তাকে।
যে লোকটা শেখায় স্বাধীনতার মানে সবার সমানাধিকার
ঠুঁসে দাও তার পোঁদে পয়েন্ট আটত্রিশ বা বাইশ!

boierpathshala.blogspot.com

যে হতভাগা তার সন্তানকে একটা
সুস্থ দেশে জন্ম দেওয়ার স্বপ্ন দেখে, তার
লিঙ্গ কেটে দাও—সন্তানের স্বপ্ন যেন সে না দেখতে পারে!
বেচুবাবুদের বলো, ঘর, আসবাবপত্র, এমনকি
নিজেদের মা-বোনকেও বিক্রি করতে;
তবু ভুলেও যেন স্বপ্ন বিক্রি না করে!
ধর্মশিক্ষা, যৌনশিক্ষা সব চলবে।
সবাই জানুক কীভাবে, ঈশ্বর বানাতে হয়
কীভাবে আর-একটা মূঢ় মানুষের বাচ্চা বানাতে হয়,
সাবান থেকে ন্যাপথলিন—সব বানাতে শেখাও।
কিন্তু যে হারামজাদা দেশ বানাতে শেখায়
তার গিলোটিনে চড়া নিশ্চিত!
বাবা, দরজাটা খুলে দাও—
তোমার দলামোচা শরীরটা ওরা আজও টেনে আনছে!
ওই পচা-গলা দুর্গন্ধময় লাশ
মাসের পর মাস, বছরের পর বছর...
গাধার মতো টেনেই চলে!
গলে গলে খসে পড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো
কেটে দেখে বারবার।
পচা হৃদয়, গলিত বৃক্ক, পাকস্থলীর পুতি দুর্গন্ধে গা গুলোয়,
তবু নষ্ট দেহটাকে হাতড়ে হাতড়ে তন্নতন্ন করে খোঁজে
—'আদর্শটা কোথায়! ফরেনসিক রিপোর্টে তার
কথা তো কেউ লেখেনি!'
বাবা, ওই দরজাটা খুলে দ্যাখো—
এক কিশোর ধানের খেতের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখছে।
কিংবা ওর চোখ দিয়ে তুমি দেখছ—
দু'চোখে তাচ্ছিল্য, গ্রীবায় ঔদ্ধত্য।
বুকের ভিতরে তাজা হাওয়া নিয়ে
অঙ্কুরে অঙ্কুরে ছড়িয়ে দিচ্ছে সাম্যবাদের ঘ্রাণ
একদিন তোমাদের মতো করেই সূর্যকে মুঠোয় ধরবে সে
ছুড়ে দেবে জ্বলন্ত প্রতিবাদ

boierpathshala.blogspot.com

স্টেনগানের তিলক মাথায় নেওয়ার জন্য জন্ম হয়েছে তার।

প্রতিটা বুলেট বুকে নিয়ে মৃত্যুর পরও প্রশ্ন রেখে যাবে—'আদর্শ কোথায়?'

শকুনগুলো ওর নিথর দেহ ঠুকরে ঠুকরে খুঁজবে আদর্শ!

আর মাটি ছুঁয়ে জেগে উঠবে আরও একটা স্বপ্নের চারাগাছ।

বাবা, দরজাটা খুলে দাও।

চারাগাছটা আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।'

ছ-বছরের ছেলেটার ব্যথিত চোখ আস্তে আস্তে পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে। গহন তখনও যেন একচল্লিশ বছর আগেকার দিনটাতে পড়ে আছেন। যে দিনগুলোর কথা বারবার ভুলে যেতে চেয়েছেন, যে কষ্টকর গ্লানিময় অভিজ্ঞতার কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন—এক টুকরো কাগজ তাঁকে আবার সেই দিনগুলোতেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

তিনি হলুদ কাগজটার দিকে তাকালেন। কবিতাটা লিখে নিজেই ফেলে দিয়েছিলেন। শুঁটকি কুড়িয়ে নিয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে নিজের কাছেই আগলে রেখেছিল। আজ ফেরত দিল।

—'দেখ গহন।' শুঁটকি বলেছিল—'যতই ক্যামোফ্লেজ করিস না কেন, এই হচ্ছিস আসল তুই। আমি এতদিন ধরে এটাকে সামলে রেখেছি একটাই কারণে। জানতাম, মুখোশ পরে থাকতে থাকতে একসময়ে নিজেই বিরক্ত হয়ে যাবি। তখন তোকে এটা দেখাব।' তার মুখে একচিলতে হাসি মিঠে রোদ্দুরের মতো ভেসে ওঠে—'আজ তোকে তোর সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিলাম। এবার ঠিক কর—কী লিখবি। স্লোগান না কবিতা!'

গহন চোখ বুজলেন। দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে লুকিয়ে রাখা বড়ো ক্লান্তিকর। যতই পালাতে চাও, কোনো-না-কোনোসময় অতীত সামনে এসে দাঁড়াবেই। এতদিন তিনি চোখ বুজে সূর্যটাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলেন। এবার সে তার গনগনে উত্তাপ নিয়ে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতের কাগজটাকে টেবিলের ওপর রেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছেন। জলের বিন্দু তাঁর মুখ চুঁইয়ে ঝরে পড়ে। সেই জলের ফোঁটাগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিন্দু বিন্দু রক্তের ঘ্রাণ পেলেন! এমন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিদির ঠোঁট বেয়ে পড়ছিল!

বুকের ভেতরে একটা অশান্ত উচ্ছ্বাস! ছ-বছরের ছেলেটার অনুভূতিগুলো আবার ফিরে এল গহনের মধ্যে। অনুভব করলেন, হাত-পা কাঁপছে। একটা তীব্র অসহায়তা, রাগ, কান্না গলার কাছে জমে উঠেছে। চোখটা কড়কড় করছিল। গহন চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। তবু জ্বলুনি কমল না। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জলের বোতল বের করে মাথায়, মুখে ঢেলে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও অনির্বাণ জ্বালা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায়—প্রশমিত হয় না। অশান্তভাবে হলঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। কণা যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই যথাসম্ভব নিঃশব্দেই হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

বুকের ভেতরে ভূমিকম্প হচ্ছিল। একাত্তর সালের সেই অভিশপ্ত দিনটা পুরোনো ক্ষতকে খুঁড়ে বের করেছে। বারবার মনে পড়েছে শুঁটকির কথাগুলো—

boierpathshala.blogspot.com

—'আজও তেমন একটা সময় আসছে গহন। আবার একটা অস্থির সময়! তার মধ্যে দাঁড়িয়েও চাঁদ-তারা-ফুল-পাখির সৌন্দর্যে নিজেকে জোর করে ডুবিয়ে রাখবি!...'

পাশের বাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক চিলচিৎকারে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল গহনের। ফের শুরু হয়েছে মারধর! এরপর কী হবে তা জানেন। কয়েকদিন আগে স্বচক্ষেই দেখেছেন। প্রথমে মার খাবে মেয়েটি, তারপর ধর্ষিত হবে একটা মদ্যপ পশুর হাতে!

দৃশ্যটা কোনোদিন দেখতে চাইতেন না গহন। চিরদিন এইসব কুৎসিত ছবিগুলো থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন। আজও তাই হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হল না!

গহন দ্রুত পায়ে চলে গেলেন ছাতে। সেখানে দাঁড়িয়েই গোটা দৃশ্যটা দেখলেন। অসম্ভব কষ্ট হচ্ছিল। অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন। তবু আগের দিনের মতো চোখ সরিয়ে নেননি। স্তম্ভিত, নির্বাক, যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে রয়েছেন জানলার দিকে।

অনেক রাতে, ঘরের আলো নিভে যাওয়ার পর মেয়েটি ফের এসে দাঁড়াল জানলার সামনে। ল্যাম্পপোস্টের আলো তার ফুলে ওঠা কপালের কালশিটে, রক্তাক্ত ঠোঁট ছুঁয়ে গেল। প্রাণহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

গহন এই প্রথম তার চোখে চোখ রাখেন। মনে মনে যেন স্পর্শ করতে চাইছেন তার ক্ষতবিক্ষত মুখকে। যেমনভাবে কচি কচি হাত দুটো ছুঁয়েছিল তার দিদির মুখ! মেয়েটির চোখে অবিকল দিদির দৃষ্টি! জাগতিক সবকিছু ছাড়িয়ে কোন অসীমের দিকে যেন অজ্ঞান বেদনায় তাকিয়ে আছে।

ও-প্রান্তে এক নির্বাক বিস্রস্তবসনা! এ-প্রান্তের মানুষটি কখন যেন পৌঁছে গেলেন একচল্লিশ বছর আগের দিনটায়। জলে ভরল তাঁর চোখ! সমস্ত প্রতিরোধ ছাপিয়ে বেরিয়ে এল অসহায় কান্না! দু-চোখে জল নিয়ে, চোয়াল শক্ত করে, দৃঢ় হাতের মুঠোয় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছ'বছরের ছেলে! নিজের দেহে অনুভব করছে দিদির ক্ষতগুলোর যন্ত্রণা! মনে মনে বারবার স্পর্শ করছে সেই নারীকে! আর ডাকছে—'দিদি... দিদি...দিদি...।'

'আ-বে শালা!'

সর্বশক্তি দিয়ে গাড়িতে ব্রেক কষল শুঁটকি। বরাতজোরে অল্পের জন্য গাড়ির তলায় চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে ছেলেটা। আর-একটু হলেই ওর আজকে 'রাম নাম সত্য' হত!

রোজকার মতোই চশমার দোকান থেকে রাতে ফিরছিল সে। গোপালের জন্য একবাক্স আইসক্রিম, চকোলেট, আপেল, আর চিপস কিনেছে। মহা ত্যাঁদড় ছেলে। কিছু খেতে ইচ্ছে করলেই চালের ড্রাম খুলে একমুঠো কাঁচা চাল মুখে চালান করে দেয়। অথবা ভাতের ফ্যান গিলে নেয়। যেন মহাসুস্বাদু জিনিস! শত বকেঝকেও তার এই অভ্যাস ছাড়াতে পারছে না। তাই এখন কূটনৈতিক রাস্তা ধরেছে শুঁটকি। বিকেলে প্রায়ই তাকে পিৎজা, এগরোল, চাউমিন ঘুষ দিচ্ছে। ভালো ভালো খাবার খেয়ে যদি তার এই বদভ্যাসটা পালটায়!

আগে শুঁটকির ফ্রিজে মদের বোতল, চানাচুর ছাড়া আর কিছুই থাকত না। এখন সেখানে শোভা পাচ্ছে কোল্ডড্রিংকস, ফ্রুট জুস, দুধের বোতল, কেক এবং অন্য রকমারি খাওয়ার জিনিস। গোপালের সৌজন্যে মদের বোতল বাড়িতে ঢুকছে না। বাচ্চাটা তাকে

boierpathshala.blogspot.com

মদ খেতে দেখলে বাজে শিক্ষা পাবে, এই কথা ভেবেই একদিন সকালবেলায় উঠে সিদ্ধান্ত নিল—'ধুত্তোর, আর মদ খাবই না।' সেদিন থেকে আর মদ স্পর্শও করেনি সে। এমনকি সিগারেট খেলেও বাথরুমে লুকিয়ে বা দরজা বন্ধ করে খায়। গোপালকে বিশ্বাস নেই। বাপ-মা মরা ছেলে। এতদিন মাথার ওপরে কেউ ছিল না। রাস্তার ছেলেদের সঙ্গেই মিশত। কে বলতে পারে, শুঁটকিকে দেখে হয়তো তারও শখ হল সিগারেটে টান মারার! অতএব 'সাধু সাবধান'। ছেলের বাপ হওয়ার ঝক্কি নেহাত কম নয়!

আজও নিয়মমতো মার্কেটিং করে ফিরছিল সে। গোপালের দেখাশোনা করার জন্য এক মধ্যবয়স্কা গভর্নেসকেও রেখেছে। শুঁটকির দোকানে থাকার সময়টুকু সেই ওকে স্নান করায়, খাওয়ায় দাওয়ায়, পড়ায়। শুঁটকি ফিরলে তার ছুটি।

আজ বেরোতে বেরোতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর রাস্তায় জ্যাম। কোনোমতে জ্যামটা কাটিয়েই গাড়ি ফুলস্পিডে চালাচ্ছিল। ন-টার মধ্যে তাকে বাড়িতে পৌঁছোতেই হবে। নয়তো গোপাল না খেয়ে বসে থাকবে। বাচ্চা হলে কি হবে, জেদ আছে ছেলের।

হয়তো সময়মতো বাড়ি পৌঁছোতে বিশেষ অসুবিধেও হত না। কিন্তু সব বিগড়ে দিল এই উটকো ছেলেটা। কোথা থেকে যেন হুড়মুড় করে এসে টপকে পড়ল গাড়ির ঠিক সামনে!

গাড়িটা কোনোমতে সাইড করেই সে একেবারে তেড়েফুঁড়ে ছুটে গেল ছেলেটার দিকে।

—'হারামজাদা! মরার জন্য আমার গাড়িটাই পেয়েছিলি তুই!' শুঁটকি তাকে এই মারে তো সেই মারে! ছেলেটা চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অল্প অল্প টলছেও!

—'অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে কী হত? তুই তো যমরাজের কোলে বসে হাওয়া খেতিস —আর আমি জেলখানায়!'

ছেলেটার বয়েস বেশি না। তাকে বেশ অপ্রকৃতিস্থও লাগছে। কোনোমতে বলল—'আই অ্যাম সররররি! দেখতে পাইনি।'

তার মুখ থেকে একটা পরিচিত গন্ধ পেল শুঁটকি। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলেটাকে মাপছে। ব্যাটার শরীর কাঁপছিল। 'দেখতে পাইনি' বলেই রাস্তার ওপর হড়হড় করে বমিও করে ফেলে।

শুঁটকি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। ঠিকই ধরেছে। মাতাল! কিন্তু একেবারে নবিশ! সদ্য সদ্যই মদ ধরেছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক। ছেলেটার মুখটা মিষ্টি। ভারি কচি কচি নিষ্পাপ। এ ছেলের মদ খাওয়ার কথা নয়!

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাতালরা জাতে রক্তবীজের বংশধর। একটা মরলে, আর-একটা জন্মাবে! শুঁটকি নিজে মদ ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিল—হয়তো দুনিয়ায় একটা মাতালের সংখ্যা কমাতে পেরেছে! কিন্তু কোথায় কী? সে ছেড়েছে, আর এই ব্যাটা ধরেছে।

—'নাম কী?' শুঁটকি এবার খানিকটা নরম সুরে জানতে চায়।

—'উশ্রী!'

সে ছেলেটার নামই জানতে চেয়েছিল। কিন্তু উদ্ভট উত্তর পেয়ে হিস্ট্রিটা বুঝতে অসুবিধে হল না তার। ছেলেটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—'টাইটেল?'

—'জানি না'।

boierpathshala.blogspot.com

—'থাকে কোথায়?'

—'জানি না।'

—'দিনে ক-বার খায়, কী দিয়ে ভাত মাখে, ক-বার পটি করে, কী সাবান ইউজ করে, ক-বার পার্লারে যায়, কি পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজে, চোখে পিচুটি হয় কি না, মাথায় কতটা খুশকি আছে, সর্দির ধাত, পাইরিয়া বা আমাশা আছে কিনা জানিস?'

ছেলেটা কেমন বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে দেখছে! যেন শুঁটকি এইমাত্র মঙ্গলগ্রহ থেকে খসে পড়ল! শুঁটকি কিছুক্ষণ চুপ করে তাকে দেখল। মনে মনে কিছু স্থির করছে! পরক্ষণেই সপাটে এক থাপ্পড়!

—'ফা-জ-লা-মি হচ্ছে! যার সম্বন্ধে আর কিছু তো দূর, টাইটেলটাও ঠিকমতো জানিস না তার জন্য মাল খেয়ে বাওয়ালি করছিস। গর্দভ। ইডিয়ট!'

চড়টা খেয়ে হকচকিয়ে গেল ছেলেটা। বিড়বিড় করে বলল—'ফের শনিদেব!'

—'কী!'

সে সামলে নেয়! চড় খেয়ে নেশাটা চটে গেছে। জেদি উত্তেজিত গলায় বলল—'আমি শুধু এইটুকু জানি যে আমি ওকে সত্যিই ভালোবাসতাম।'

—'বাল ভালোবাসতি!' শুঁটকি প্রায় তাকে তেড়ে মারতেই যায়—'সত্যিই ভালোবাসলে 'ভালোবাসতাম' বলতি না! বলতি 'ভালোবাসি'। ভালোবাসার কোনো অতীত-ভবিষ্যৎ হয় না। এ কি জুতো পেয়েছিস যে পুরোনো হলেই 'এককালে সত্যিই পরতাম' বলে অতীত করে দিবি!'

সে একটু থামল। কয়েক মুহূর্ত পর ফের নীচু স্বরে বলে—'বাবা জানে?'

—'কী?'

—'তুই মদ খাস।'

ছেলেটা প্রতিবাদ করে—'আমি মদ খাই না। খাইনি কখনও।'

—'তাহলে তোর মুখ থেকে কীসের গন্ধ আসছে? দুধের? আমায় ছাগল পেয়েছিস?'

—'না।' কচি কচি মুখটা দৃঢ় হল—'আজ খেয়েছি।'

—'কেন খেয়েছিস?'

—'আমি উশ্রীকে ভুলতে চাই...ওকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই...।'

—'গা-ড়ো-ল কোথাকার!' শুঁটকি ধমকে ওঠে—'কোথাকার অশিক্ষিত রে! মদ খেলে লোকে ভোলে? ছাতা ভোলে! মদ খেলে আরও বেশি মনে পড়ে! যত নেশা করবি, স্মৃতিগুলো বাস্তবকে ছাপিয়ে আরও কাছে আসবে। যা ভুলতে চাস, সেগুলোই যখন চোখের সামনে নাচবে—তখন ভালো থাকবি তুই? আর যখন তোর বাপ-মা দেখবে, ছেলে মাতাল হয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, তখন তারা খুব খুশি হবে—তাই না?'

ছেলেটা তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপরই কথা নেই বার্তা নেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্নার চোটে তার নাকের জল, চোখের জল, মুখের লালা সব মিলেমিশে শার্টে পড়ছে।

boierpathshala.blogspot.com

—'যা বাব্বা! এ তো টোটাল ইমোশনাল!' শুঁটকি রাগ ভুলে গিয়ে ছেলেটাকে বুকে টেনে নেয়। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে—'কাঁদছিস কেন বাবা! এইটুকুতেই ভেঙে পড়লে চলবে! অ্যাঁ?'

তার আলিঙ্গনের আন্তরিকতায় ছেলেটার বোধহয় আরও কান্না পেয়ে গেল। বুকে যখন ব্যথার পাহাড় জমে তখনই একটু উষ্ণ স্পর্শের প্রয়োজন হয়! তার কান্না আরও উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে। শুঁটকি তাকে কাঁদতে দিল। কাঁদুক। কান্না দুঃখকে অনেকটাই তরল করে দেয়। প্রাণ ভরে কেঁদে নিক।

বেশ কিছুক্ষণ কান্নার পর আস্তে আস্তে শান্ত হল সে।

—'হয়েছে? এবার মুখ মুছে নে। চোখ-মুখের কী অবস্থা করেছিস! জল খাবি একটু?' মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় ছেলেটা।

গাড়ি থেকে জলের বোতল বের করে এনে তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিল শুঁটকি। কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে সে একটু ধাতস্থ হয়।

—'নাম কী তোর?'

ক্ষীণস্বরে উত্তর এল—'মন্দার।'

—'মন্দার। বেশ নাম। বোস। তোর সঙ্গে একটু কথা বলি।'

বলতে বলতেই শুঁটকি রাস্তার ওপরে বসে পড়েছে। মন্দারও একদম বাধ্য ছেলের মতো তার পাশে বসল। পিচের মসৃণ রাস্তার একদিক আটকে রেখেছে দুটো লোক। পিছন থেকে একরাশ গাড়ির অধৈর্য ভোঁ ভোঁ-পোঁ পোঁ-পিঁপ পিঁপ ভেসে এল। হেডলাইটের তীব্র আলো চোখে এসে পড়ায় শুঁটকি বিরক্ত হয়—'ধুর মশাই, ভেঁপু বাজাচ্ছেন কেন? অতখানি রাস্তা ফাঁকা আছে দেখতে পাচ্ছেন না! ওদিক দিয়ে যান!'

একটি অল্পবয়সি মেয়ে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে আসে। আতঙ্কিত স্বরে বলে —'দাদা, এ রাস্তা দিয়ে কি যাওয়া যাবে না? কিছু হয়েছে নাকি?'

—'না মামণি কিছু হয়নি। এটা রাস্তা রোকো নয়। ছোট্ট একটা মিটিং...আইমিন গজল্লা।' সে কান এঁটো করা হাসি হাসে—'আসলে এখানে তো আর কোথাও বসার জায়গা নেই। সাইডে গাড়ি থামিয়ে গপ্পো মারলে পুলিশ প্রথমে টর্চ মেরে ভেতরের সিন দেখার চেষ্টা করবে। দুজন পুরুষ মিলে আর কী সিন করব! জড়াজড়ি-চুম্মাচাটি কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব ব্যর্থ হয়ে খেপে গিয়ে ফাইন করবে। তাই রাস্তাতেই বসে পড়েছি।'

মেয়েটির মুখে একটা কিম্ভূতকিমাকার এক্সপ্রেশন ফুটে ওঠে। যেন শুঁটকি নয়, এক্সহর্স্টিসের ভূত তার সঙ্গে কথা বলছে।

দুজন মানুষকে সাইডে রেখে হুশহুশ করে বিনাপ্রতিবাদে গাড়িগুলো চলে গেল। সবারই এখন বাড়ি ফেরার তাড়া। তাই ঝামেলা করতে চায়নি। শুঁটকি মন্দারের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে—'মেয়েটা রাপচিক ছিল—তাই না? বয়েসটা অল্প হলে ওর সঙ্গে একটু ফস্টিনস্টি করতাম।'

মন্দার বিষণ্ণ—'জানি না। দেখিনি।'

—'সে কী! তুই কী রে!' সে চোখ কপালে তুলে ফেলেছে—'রাস্তায় চলন্ত গাড়ি দেখতে পাস না! সামনে সুন্দরী মেয়ে দেখতে পাস না। পাগল না কবি!'

boierpathshala.blogspot.com

—'কবিদের সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করবেন না।' মন্দার ফোঁস করে ওঠে—'আমার ভালো লাগে না।'

শুঁটকি কুলকুল করে হেসে ফেলল—'শালা, জাতে মাতাল তালে ঠিক! বুঝেছি, তুই কবি। এবার বল ঘোঁটালাটা কী?'

মন্দার লোকটাকে চেনে না। জীবনে কখনও দেখেনি। আর কখনও দেখবে কিনা ঠিক নেই! তবু মনে হল ওর কাছে সব কথা বলা যায়। যা এখনও পর্যন্ত কাউকে মুখ ফুটে বলেনি, সেই আন্তরিক ব্যথার কথাও বলে ফেলা যায় এই মানুষটির কাছে। এই রাতের বেলায়, মেইন রোডের ওপর বাবু হয়ে বসে কী করছে সে জানে না! কেন বলছে, কীজন্য বলছে তাও জানা নেই। শুধু এইটুকুই জানে, এই লোকটির সঙ্গ তার এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন।

সব ঘটনাই ধৈর্য ধরে শুনল শুঁটকি। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—'বোঝো! যাকে জানলি না, চিনলি না, ভালোবাসলি না—তার জন্য মাল খেয়ে শহরের রাস্তার ল্যাদ খাচ্ছিস।'

—'ভালোবাসিনি। কে বলল আপনাকে?'

—'ভালোবাসার মানে জানিস তুই?' সে বলল—'ইন্টারনেটে একজন হরিদাস পাল নামের কবি দু-লাইনের একটা কবিতা পোস্ট করেছিলেন— 'ভালোবাসা স্বপ্নের মতো, জেগে গেলে মাপা যায় না/ভালোবাসা পটির মতো, বেগে এলে চাপা যায় না।' প্রেমের নিয়মই হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা। সে সবসময়ই চিৎকার করে বলতে চায়—'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। সেখানে তুই মেয়েটার কাছেই বেমালুম চেপে গিয়েছিস। তাহলে ভালোবাসলি কবে?'

মন্দারের মনে পড়ল স্বপ্নেও কখনও 'ভালোবাসি' শব্দটা বলতে পারেনি সে। যখনই বলতে চেয়েছে, তখনই কালো, মুষকো লোকটা থাপ্পড় মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। তবু নাছোড়বান্দা হয়ে বলে—'কিন্তু আমি তো সবসময়ই ওকে ভালো ভালো গিফট দিয়েছি, ওকে নিয়ে কবিতা লিখেছি...'

—'কবিতা যে বোঝে না, তাকে নিয়ে কবিতা লেখা, আর শুয়োরকে বিরিয়ানি খেতে দেওয়া—দুইই সমান।' শুঁটকি হাসল—'তা ছাড়া যতদূর শুনলাম, তাতে মনে হল মেয়েটার মাথায় গিফটের দামটা যত ভালোভাবে ঢুকেছে, কারণটা ততটাই মাথার ওপর দিয়ে গেছে। তুই তো কবি। যে এত সহজ ব্যাপারটাই বোঝে না,—এমন মাথামোটা মেয়েকে বিয়ে করতে যাবি কোন দুঃখে।'

মন্দার থমকে যায়। ব্যাপারটা এভাবে সে ভেবে দেখেনি।

—'কবি আর তার বউ হবে টেনিস প্লেয়ারের মতো।' সে হাসতে হাসতে বলে—'কবি এদিক থেকে 'ঠুক' করলে সে-ও ওদিক থেকে সমান তালে 'ঠাক' করবে। বিজনেসম্যান, কর্পোরেট কর্তারা 'শো-পিস' নিয়ে ঘর করতে পারে। কিন্তু তোর তো বাবা রক্তমাংসের মেয়ে দরকার। কাচের সুন্দর মূর্তি নিয়ে কাব্যি করতে পারিস, ঘর করবি কীভাবে?'

বলতে বলতেই সে সিগারেট ধরায়—'নিজের ওজনটা আগে বোঝ বাচ্চা। যে-কোনো শিক্ষিত বা অশিক্ষিত পয়সাওয়ালা লোকের পায়ে তেল মাখাতে অনেকেই চায়। পা টিপে দিতে পারে, এমনকি পা চাটতেও পারে। তবে সবের পিছনেই কিছু-না-কিছু স্বার্থ থাকে।

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু কবি, সাহিত্যিক প্রজাতিটা একটু আলাদা! লোকে তাদের পায়ের কাছে মাথা ঝোঁকায়। প্রণাম করে। এবং বিনা স্বার্থেই করে। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝিস?'

মন্দার চুপ করে শুনছিল। এতদিন কেউ তাকে এসব বলেনি। বাড়িতে বা শুটিংয়ের সেটে ঝাড় খেতে খেতে কখনও মনে হয়নি যে সে আলাদা! কেউ কখনও বলে দেয়নি —'মন্দার, তুমি স্পেশাল!'

সে কথা বলতেই শুঁটকি মুখ টিপে হাসে—'এখানেই কবি কেঁদেছেন! একজন বলেছে। কিন্তু তুই এমনই বুদ্ধু যে বুঝতেই পারিসনি। অথবা গুরুত্ব দিসনি।'

কার কথা বলছে লোকটা! মন্দারের মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

—'ভালোবাসা নয়, তুই একটা ধাক্কা খেয়েছিস। কচি বয়েসে একটা ব্যথা পেয়েছিস। সেই ব্যথাকে ব্যবহার কর। কবিতা লেখ।' সে হেসে ওঠে—'যন্ত্রণা ছাড়া কি সৃষ্টি হয়? মদ নয়, কবিতা ধর। মদ তোকে কষ্ট দেবে! আর কবিতা শক্তি। যাকগে, অনেক কথা বলেছি—এবার বল—! তোর বাড়ি কোথায়?'

—'কেন?'

—'সারারাত এখানে বসে আড্ডা তো মারতে পারি না। নিজে বাড়ি যেতে পারবি? না ড্রপ করে দেব?'

মন্দারের নেশা প্রায় কেটেই গিয়েছিল। সে মাথা নাড়ে—'না, আমি যেতে পারব।'

—'গুড। বিন্দাস বাড়ি যা! ভালো করে একটা ঘুম দে। তারপর কাল সকালে উঠে কথাগুলো মন দিয়ে ভেবে দেখবি।'

—'আচ্ছা।'

সে উঠে দাঁড়ায়। শুঁটকিও দাঁড়িয়ে পড়ে জামা-প্যান্ট ঝাড়ছে।

—'থ্যাঙ্কস দাদা।' মন্দার তার দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে চলে যাচ্ছিল। পিছন থেকে ডাক এল—'এই শোন।'

সে সচকিত হয়ে ওঠে—'কিছু বলবেন?'

—'মেয়েটার বোনটার নাম কি যেন?'

—'ঊর্মি।' মন্দার বিস্মিত—'কেন?'

শুঁটকি রহস্যময় হাসি হাসল—'ওর টাইটেল আর ঠিকানা জেনে নিস। পারলে বাকি ডিটেলসগুলোও। কাজে লাগবে। চল বাই।'

স্তম্ভিত মন্দারকে সেখানেই রেখে হনহন করে চলে গেল সে।

তার গাড়িটা এক সাইডেই দাঁড় করানো ছিল। ড্রাইভিং সিটে বসতেই আচমকা একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ তাকে ছুঁয়ে গেল। হাস্নুহানার গন্ধ!

—'রুমা!' যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ মেশানো কণ্ঠে ডেকে উঠেছে শুঁটকি! পাশের সিটে এক নারীর ছায়া ছায়া অবয়ব!

—'কখন এসেছ?' সে একটু অনুতপ্ত হয়ে বলে—'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ তাই না? সরি, আসলে ওই ছেলেটা...কি নাম যেন, তাকে জ্ঞান দিতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। আজকের ছেলেপুলেগুলোও পারে! শুধু অ্যাট্রাকশনকেই প্রেম ভেবে বসে থাকে। তারপর

boierpathshala.blogspot.com

ল্যাং খেয়ে কুপোকাত! আসল প্রেম যে কী জিনিস, তা বোঝার আগেই লাইফ বরবাদ করে ফেলে।'

বলতে বলতেই হাসল শুঁটকি—'আসলে কি জানো? আমার কাছে বুবাই, গোপাল—এইসব ছেলেগুলো, সবাই একরকম। যদি বুবাই কখনও এরকম কাণ্ড ঘটাত—তোমার, আমার ভালো লাগত? ওই ছেলেটার মা-বাবাও তো আমাদেরই মতো। তাই একটু বোঝাচ্ছিলাম।'

বলতে বলতেই তার চোখে স্বপ্নিল আচ্ছন্নতা ভেসে উঠেছে। দু-চোখে ঝলমলে আকাশ নিয়ে সে বলল—'দেখো রুমা, যেদিন ও সত্যিই প্রেমে পড়বে, সেদিন চতুর্দিক হাস্নুহানার গন্ধে ভেসে যাবে। সেদিন ওর রক্তে রক্তে মল্লার বাজবে। সেই মুহূর্তটা জীবনে ও কখনও ভুলতে পারবে না...কোনদিনও ভুলতে পারবে না...আমার মতো...যেমন আমি পারিনি...।'

শুঁটকির মনে হল নারীমূর্তিটা হেসে উঠেছে। তার ঠোঁটে ঝলমল করছে খুশির হাসি। একটা ছায়া ছায়া হাত শুঁটকির হাত জড়িয়ে ধরেছে। যেন বলতে চাইছে—'আমি আছি।'

—'এসো, তোমায় সিটবেল্ট পরিয়ে দিই।' সে ছায়ামূর্তিকে বেল্ট পরাতে পরাতে বলে—'তারপর চলো, বাড়ি যাই। আমাদের বাড়ি। যেখানে তুমি আছ, আমি আছি, বুবাই আছে আর গোপাল আছে।'

ছায়ামূর্তি আবার হাসল। হাস্নুহানার গন্ধে ভরে উঠল মুহূর্তটা!

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। আবহাওয়া বদলাল। বদলাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বাজারদর আরও কয়েক ধাপ চড়ল। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে সম্পর্কের দিশা বদলাল। জীবন নানা মোড় নিল।

বদলাল না শুধু কবিতা ডট কম। আর তার নিত্যনৈমিত্তিক কাদা ছোড়াছুড়ি।

—'কবিতায় অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের আমি বিরোধী নই। কলোকিয়াল শব্দ, খিস্তি ব্যবহার করেও দারুণ সব কবিতা লেখা যায়। কিন্তু এ আবার কী! কবি যেভাবে চ-কার শব্দটি অকারণে ব্যবহার করেছেন তাতে একটা ট্যাক্সিওয়ালারও উত্তেজনা হবে না!'

—'চ-কার শব্দটিকে কুবলাশ্ব অশ্লীল কেন বলতে চাইলেন বুঝতে পারলাম না। এটি যথেষ্ট ভালো শব্দ। বাংলা অভিধানে এর অর্থ, শারীরিক মিলন বা সঙ্গম।'

—'স্বর্ণাভদা, তাহলে 'মিলিত হত' লিখলেই তো ল্যাঠা চুকত। ওই শব্দটি ব্যবহার করার দরকার পড়ল কেন? সমস্ত কবিতাটির ভাষা প্রায় রাবীন্দ্রিক। হঠাৎ করে তার মধ্যে ফা;নী রায়, মলয় রায়চৌধুরীদের ঢুকে পড়ার কারণ কী! তা-ও আবার একটি শব্দের জন্য! একবারের জন্য ভেবেছিলাম, হয়তো ভুল করে শব্দটি লিখে ফেলেছেন। কিন্তু ষষ্ঠ লাইনটি পড়ে চক্ষু চড়কগাছ। ওই একই শব্দ ডেলিবারেটলি ফের ষষ্ঠ লাইনে লিখেছেন তিনি। এমনকি পরের লাইনেও! নগ্ন নারীর ছবি আঁকা দোষের নয়। শুধু পায়ে মোজা পরানোটা মেনে নিতে পারলাম না।'

কবিতা ডট কমে-এ আজ আবার খামচাখামচি শুরু হয়েছে। কবি 'অন্য কেউ' একটা কবিতা পোস্ট করেছেন। সে কবিতাটা আপাতদৃষ্টিতে বেশ নিরীহ। বেশ সুন্দর রাবীন্দ্রিক ছিমছাম রোমান্টিসিজম নিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চম লাইনে এসেই পিলে চমকে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

রবীন্দ্রনাথ যদি হঠাৎ জোববা-টোববা ছেড়ে, মাইকেল জ্যাকসনের পোশাকে মুন ওয়াক করতে শুরু করেন তাহলে যা হয় আর কী! রোমান্টিসিজম ও আতুর শব্দাবলি ছেড়ে কবি একেবারে সোজাসুজি চ-কার ব্যবহার করেছেন! আর সেটা নিয়েই স্বর্ণাভ গুপ্ত অ্যান্ড কোং-এর সঙ্গে কুবলাশ্বর অবধারিত ঠোকাঠুকি।

মন্দার নিজেও কবিতাটা পড়ে আঁতকে উঠেছিল। খিস্তি দেওয়া, গালিগালাজ দেওয়া বুদ্ধিদীপ্ত কবিতা সে অনেক পড়েছে। দেখেছে সে কীভাবে কলোকিয়াল, তথাকথিত 'অশ্লীল' শব্দকেও শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু এমন গোদা পদ্ধতিতে সুড়সুড়ি দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখে, সে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছিল না।

—'কুবলাশ্ব কি আগে কখনও কবিতায় অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ দেখেননি? তাঁকে হাংরি জেনারেশনের কবি মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা পড়ে দেখার অনুরোধ করছি। কবি ব্রাত্য রাইসুর একটি কবিতার লাইন যদি—'ঘরের ভিতর ভাউয়া ব্যাঙে করছে চোদাচুদি' হতে পারে, তবে 'অন্য কেউ' কি দোষ করেছেন?'

—'স্বর্ণাভদা, কবি মলয় রায়চৌধুরীর যে বিশেষ কাব্যগ্রন্থের দিকে ইঙ্গিত করছেন, সেই 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার', আমিও পড়েছি। সমস্যাটা মলয় রায়চৌধুরী বা ব্রাত্য রাইসুর কবিতা নিয়ে নয়। যে কবি লেখেন—'কেন আমি পিতার আত্মমৈথুনের পরে তার পেচ্ছাপে বয়ে যাইনি/কেন আমি রজস্রাবে মিশে যাইনি শ্লেষ্মায়' সেই কবি কখনোই দাবি করেননি যে তিনি মাইকেল মধুসূদনের বংশধর। কবি ব্রাত্য রাইসুর যে কবিতাটির কথা আপনি বলেছেন, সেই কবিতার কাব্যগ্রন্থটির নাম থেকেই কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি স্বভাব ফিচেল। যাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'আকাশে কালিদাসের লগে ম্যাঘ দেখতাসি', তিনি এমন কবিতা লিখবেন তাতে আর আশ্চর্য কী! যাঁর কবিতার লাইন এরকম—'কাউয়া বলে কা-কা/কলা বলে কলা খা' কিংবা 'চেয়ার বহনকারী দুইজন নারী/চেয়ারের চেয়ে তারা ভারী...' তিনি যতই কালিদাসের সঙ্গে মেঘ দেখুন, নিজেকে কালিদাসের রি-ইনকারনেশন বলেননি। তাই তাঁর ফিচেল মুড বা রাইটিং স্টাইলে 'ভাউয়া ব্যাঙের চোদাচুদি' চলে যায়। কিন্তু কবি 'অন্য কেউ' যেভাবে পাইরেটেড রবীন্দ্রনাথ হওয়ার ভণ্ডামি দেখান সেখানে হঠাৎ চ-কারের অনুপ্রবেশ সহ্য হয় না!'

মন্দার হাঁ! 'কুবলাশ্ব'-কে ভালো লাগত বটে। কিন্তু সে যে স্বর্ণাভ গুপ্ত'র মতো আঁতেলকেও শুইয়ে দেওয়র ক্ষমতা রাখে তা জানা ছিল না। এতদিন লোকটার প্রতি তার একটা অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি ছিল। এবার যুক্ত হল শ্রদ্ধা! লোকটা রীতিমতো শিক্ষিত। হয়তো মন্দারের চেয়েও বেশি পড়াশোনা করা মানুষ!

এবার উলটে পড়া গুরুদেবকে টেনেটুনে তোলার জন্য মগনলাল এসে হাজির হয়েছে —'কুবলাশ্ব আসলে কী বলতে চান? তাঁর কোনটায় আপত্তি? কবিতাটায় না শব্দটায়?'

কুবলাশ্ব নিশ্চয়ই উত্তর দিত। কিন্তু তার আগেই তাকে কভার করল 'একা মেঘ'।

—'মগনলাল, আপনি কি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন? না কুবলাশ্ব হিব্রুভাষায় কথা বলছেন? যে-কোনো রচনার একটা নিজস্ব ভাষা থাকে। এখানে প্রথম কয়েকলাইন এতটাই মসৃণ যে আচমকা বিশেষ পাঠক হোঁচট খাচ্ছে।'

মন্দারও আর থাকতে পারল না। সে 'রামহনু' হয়ে নেমে পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে—'মেঘদা আপনি শুধু হোঁচট খেলেন! আমি যে চেয়ার থেকে পড়েই গেনু!'

প্রতিপক্ষ ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে দেখে স্বর্ণাভ-র দলবলও তেড়ে আসে। স্বর্ণাভ-র অতিপ্রিয় ই-ভগিনী 'তুর্কি' এমনিতে মহা নাকউঁচু মহিলা! নিজের কবিতা দিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

আপামর জনগণকে ধন্য করাই তার স্বভাব। আর বেছে বেছে নিজেদের দাদাদের কবিতাতেই মন্তব্য করে। তথা পিঠ চুলকায়। অন্য কারুর কবিতা পড়েও দেখে না!

এই সাইবার কবিতা জগতে মেয়েদের বড়োই সুবিধা। মেয়ে কবির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে মেয়েরা কবিতা লিখলেই ছেলেরা প্রশংসা করার জন্য লাফিয়ে পড়ে। যতই 'ঝুলস্য ঝুল' লিখুক না কেন, সবাই মিলে 'বাঃ বাঃ' বলে হাওয়া দিতে থাকে।

তুর্কি তেমনই গরম হাওয়ায় ভরা ফানুস! মাঝেমধ্যে ওর ওই ফোলানো পশ্চাদ্দেশে পিন ফুটিয়ে দেওয়ার লোভ হয় তার। আজকে আচমকা সে সুযোগ জুটেও গেল।

—'কবির কি শব্দচয়নের স্বাধীনতা নেই! তিনি হয়তো মোলায়েম শব্দগুচ্ছ ছেড়ে এক্সপেরিমেন্টাল কিছু করতে চেয়েছেন। আমার মনে হয় এই প্রচেষ্টা যথেষ্টই গঠনমূলক।'

তুর্কি যে স্বর্ণাভদেরই সাপোর্ট করবে তা জানাই ছিল। মন্দার 'রামহনু' হয়ে লিখল —'তুর্কিদেবী, এক্সপেরিমেন্ট করতে হলে শুরু থেকেই সেটা করা উচিত। কবিতার মাঝখানের শুধু একটি শব্দের ওপরই তাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে হল? এ কেমন এক্সপেরিমেন্ট! বঙ্কিমচন্দ্র যদি এমন এক্সপেরিমেন্ট করে কখনও লিখতেন—প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিয়া, ভোজন পর্ব সমাধা করিয়া, অশ্বারোহণ পূর্বক অবন্তীনগরে প্রত্যাবর্তন মাত্রই ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে ধপ্পৎ কইরা হুইয়া পড়লাম,—তাহলে সেটা কি জাতীয় ইতিবাচক এক্সপেরিমেন্ট হত?'

তার কথাকে সমর্থন করেই কুবলাশ্ব দাঁত বের করা একটা স্মাইলি দিয়েছে। মন্দার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। মনে মনে বলে—'চলো গুরু একসঙ্গে লড়ি।'

এই নিয়েই বেশ কিছুক্ষণ আকচাআকচি চলল। কুবলাশ্ব চিরকালই ভালো লড়িয়ে। কিন্তু একা মেঘ আর রামহনুও যেন আজ রুদ্রমূর্তি ধরেছে। স্বর্ণাভ'র দল তখন পালানোর পথ পাচ্ছে না!

অবশেষে কবি 'অন্য কেউ' স্বয়ং আবির্ভূত হলেন। বললেন—'আসলে আমি বাংলা ভাষায় ঠিক সড়গড় নই। ইনফ্যাক্ট দীর্ঘ তিন বছর ধরে একটা বাংলা কবিতাও লিখিনি। ইংলিশ ইজ মোর কমফর্টেবল। ইংরেজির শব্দভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ। আমি কবিতাটায় রাফ রাস্টিক টাচ আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাংলা ভাষায় তেমন শব্দ খুঁজে পেলাম না'।

ন্যাকামি দেখে মন্দারের মাথা গরম হয়ে গেছে। সে খটখট করে টাইপ করে—'এটা কি জাতীয় ঢ্যামনামি? বাংলায় রাফ অ্যান্ড রাস্টিক শব্দ নেই! স্বর্ণাভদা একটু আগেই মলয় রায়চৌধুরীর রেফারেন্স দিচ্ছিলেন কুবলাশ্বকে। আপনাকে দেননি? আর বাংলা ভাষার প্রতি যদি এতই অনীহা তবে বাংলা কবিতা লিখতে আসেন কেন?'

এবার বোধহয় 'অন্য কেউ' কেঁদেই ফেলেছেন। লিখলেন—'ও খুড়ো, কেন আমায় বারবার লিখতে বলো! দেখছই তো আর কবিতা লিখতে পারি না। এ গালাগালি আর সহ্য হয় না!'

তুর্কি একেবারে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী—'ঢ্যামনামি! একজন কবিকে এ কি জাতীয় বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে! আমি অ্যাবিউস রিপোর্ট করছি।'

স্বর্ণাভ লিখল—'আমিও অ্যাবিউস রিপোর্ট করছি।'

যা! নালিশ কর। নালিশ করে বালিশ পাবি! মন্দার কম্পিউটারকে টার্ন-অফ করে দেয়। সে জানে এরপর কী হবে। 'অন্য কেউ' নাকে কেঁদে বেড়াবেন, আর মডারেটর ব্যাসদেব তাঁর পিছনে পিছনে টিস্যুর দলা নিয়ে ঘুরবেন।

boierpathshala.blogspot.com

বাইরে তখন ফটফটে রোদ আমগাছের পাতায় পাতায় লুকোচুরি খেলছিল। তার মধ্যে একটা লম্বা নারকেল গাছের শান্ত ছায়া ঝিরঝির করে এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল মন্দার। প্রায় একমাস হয়ে গেল সে স্ক্রিপ্ট-রাইটারের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন যে লোকটা মাঝপথে প্রায় দেবদূতের মতো এসে হাজির হয়েছিল, তার প্রতিটি কথা পরদিন মন দিয়ে ভেবে দেখেছে। ভাবতে ভাবতেই সে অদ্ভুতভাবে আবিষ্কার করেছিল নিজেকে। আবিষ্কার করেছিল এগারোশো স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাট, ব্যাংক ব্যালেন্স, গাড়ি—কোনোটাই তার নিজের স্বপ্ন ছিল না! এর কোনোটাই সে আসলে চায়নি। উশ্রীকেও ভালোবাসেনি। ভালোবাসার জন্য যতখানি চেনার প্রয়োজন, ততটা পরিচয় কখনোই উশ্রীর সঙ্গে তার হয়নি। সে শুধু একটা মোহ ছিল। যেমন ওয়ার্ল্ডকাপ জেতার উন্মাদনা। একটা সোনালি-রুপোলি কিংবা প্ল্যাটিনামের সুদৃশ্য কাপ! জেতার আগে মনে হয় কী দুর্মূল্য জিনিস! অথচ জেতার পর সেটার মূল্য শুধু শো-কেসই বোঝে।

উশ্রী মন্দারের কাছেও তেমনই। একটা সুদৃশ্য অধরা কাপ! যাকে জয় করার জন্য এগারোশো স্কোয়্যার ফিট, গাড়ির স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হয়েছিল সে।

ওই সিড়িঙ্গে লোকটা তার জীবনে এসে পড়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, প্রেম আর উন্মাদনা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস! জানিয়ে গেল যে কবির সবচেয়ে বড়ো মাহাত্ম্য এগারোশো স্কোয়্যার ফিটে নয়! তার ছোট্ট আসনে সে নিজেই মহান।

যেদিন মন্দার চাকরি ছাড়ল, ছেড়ে দিল উশ্রীকে—সেদিন মনে হয়েছিল বুক থেকে একটা বিরাট পাথর নেমে গেল! টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় দাঁড়িয়ে বুক ভরে উন্মুক্ত জীবনের শ্বাস নিয়েছিল সে। আর পৌঁছানোর তাড়া নেই, পান্ডা তথা পেন্ডুলামের দাঁত খিঁচুনি নেই, বোকা বোকা ডায়লগ লিখে আর আত্মধিক্কারে ভুগতে হবে না। 'কবি' বলে কেউ তাকে অপমান করবে না। কাউকে পাওয়ার জন্য টাকার পিছনে র‍্যাটরেসে নামার আর দরকার নেই।

তবে চাকরি ছেড়ে সে একেবারে হদ্দ বেকার হয়ে বসে নেই। চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার তিনদিন পরেই একটা অজানা নম্বর থেকে ফোন এল মন্দারের মোবাইলে।

—'হ্যালো।'

ও প্রান্তে রহস্যময়ী নারীকণ্ঠ—'বলো তো কে?'

মন্দার নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। এ গলা তার চেনার কথাই নয়! কারণ গলার মালিক কোনোদিন তাকে ফোন করেনি। কিন্তু এই দুষ্টু দুষ্টু হাসিমাখা গলাটাকে চিনতে তার কোনো অসুবিধেই হল না!

—'ঊর্মি! তুমি!'

—'ইয়েস স্যার।' ঊর্মি ওপ্রান্তে সজোরে হেসে উঠেছিল—'আমার টিফিনবক্সটা তোমায় খুব মিস করছে। তাই ভাবলাম, খবর নিই। কেমন আছ?'

—'চাকরি ছেড়ে একটা দামড়া ছেলে বাপের হোটেলে যেমন থাকে—তেমনই আছি।'

ঊর্মি ফের হাসল—'তার মানে তুমি খই ভাজছ!'

—'হ্যাঁ, ভাজছি। খাবে তো চলে এসো।'

সে যেন এই প্রস্তাবটার জন্য তৈরিই হয়েছিল। প্রায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল —'ঠিকানাটা বলো। এক্ষুনি আসছি।'

boierpathshala.blogspot.com

মন্দারকে স্তম্ভিত করে সত্যি সত্যিই সেদিন তার বাড়ি চলে এসেছিল ঊর্মি। তাকে দেখে প্রথমেই 'থ' হয়ে গিয়েছিল সে। চিনতেই পারেনি! বরং প্রথমে উশ্রী ভেবেই ভুল করতে যাচ্ছিল। অবিকল একইরকম দেখতে। শুধু চুলের স্টাইলটা অন্যরকম, আর চেহারাটা একটু বাল্কি! এ ছাড়া দুজনের চেহারায় কোনো বাহ্যিক তফাত নেই! এ মেয়েটা এমন সুন্দরী! তবে ওরকম বিটকেল জামাকাপড় পরে থাকত কেন?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল মন্দার। তাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে ফেলে ঊর্মি। মন্দার তখনই বুঝল—উশ্রীর পক্ষে এমন হাসি হাসাই সম্ভব নয়। চোখে সপ্রতিভ অথচ শান্ত গভীরতা, হাসিতে স্নেহ-মমতা ঝরে পড়ছে—ঊর্মিকে উশ্রীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী মনে হল তার!

অথচ এই মেয়েটা দিনের-পর-দিন মাথায় ওড়না বেঁধে, ভুরু ঢাকা মোটা ফ্রেমের চশমা পরে, ঢলঢলে আউটফিট পরে বসে থাকত! নিজের সৌন্দর্যকে একটা আবরণের পিছনে লুকিয়ে, সুন্দরী দিদির পাশে নিজেকে অসুন্দর প্রমাণ করার চেষ্টা করত।

—'তুমি তো একদম...।'

—'উশ্রীর মতো দেখতে। তাই না?' খিলখিল করে হেসে ওঠে ঊর্মি— 'আগেই তো বলেছিলাম, আমাদের দু-জনকেই একরকম দেখতে। শুধু বাইরের লোক বুঝতে পারে না।'

—'কী করে বুঝবে?' সে বলল—'মাথায় ফেট্টি বেঁধে, নাকে পাঁউরুটি ফ্রেমের চশমা চাপিয়ে, ভুরু ঢেকে, তাঁবুর মতো সালোয়ার কামিজ পরে বসে থাকলে বোঝাও সম্ভব নয়।'

উত্তরে ঊর্মি মুখ টিপে হাসে—'তাহলে দেখো, সৌন্দর্য ব্যাপারটা কতটা আপেক্ষিক। আউটফিটের সঙ্গে সঙ্গে রং বদলায়।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে দিব্যি মা, বাবা আর টিকলির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। আধঘণ্টা পর মায়ের তৈরি ব্রেড রোলে কামড় দিতে দিতে মন্দারের বিছানায় দিব্যি ঠ্যাং তুলে ঠাকুরানির মতো বসে বলল—'তারপর চাকরি-বাকরি ছেড়ে কী করবে ভেবেছ?'

—'আপাতত ঘাস সাপ্লাই করা ছাড়া আর তো কোনো অপশন দেখছি না।'

—'হুমমম...ব্রেড রোলটা দারুণ।' মন্দারের চোখের সামনেই গোটা প্লেটটাই একা সাবাড় করে দিয়ে বলে ঊর্মি—'ঘাস সাপ্লাইটা মেইন বিজনেস হিসাবে রাখতে পারো। তবে তার সঙ্গে একটা পার্ট-টাইম জব করলেও মন্দ হয় না। তোমারও খারাপ লাগবে না। আর-একজনেরও উপকার হয়।'

—'কীরকম?'

ঊর্মি তখনই তাকে অফারটা দিয়েছিল। তার এক কাকা নামকরা একটি পাক্ষিক পত্রিকার এডিটর। ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে বাংলা সাহিত্যে পারদর্শী ছেলে-মেয়ে লাগবে। সপ্তাহে পাঁচদিন অফিস। সময়ের তেমন কড়াকড়ি নেই। শনি-রবিবার ছুটি।

—'কিন্তু হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লে কেন...? তুমিও তো চাকরিটা করতে পারতে।' মন্দার বলে—'নাকি সারাজীবনই উশ্রীর সেক্রেটারির চাকরি করে যাবে!'

—'একদম না।' ঊর্মি হাসল—'আমি কারুর সেক্রেটারি নই, বরং হোম মিনিস্টার হওয়ার তালে আছি। তা ছাড়া ওসব চাকরিবাকরি আমার পোষাবে না।'

boierpathshala.blogspot.com

—'তাহলে কী পোষাবে?'

—'আপাতত আর-একটা ব্রেড রোল।' ঊর্মি ধনুকের মতো ভুরু নাচায়—'হবে?'

ঊর্মির ধাক্কা খেয়েই কপাল ঠুকে কাজটার জন্য অ্যাপ্লাই করে দিয়েছিল মন্দার। ছোটোবেলা থেকে বাংলা-ইংরেজি দুটো ভাষাই তার সমান দখলে। চাকরিটা পেতেও বিশেষ অসুবিধে হয়নি। দারুণ ইনটারভিউ দিয়েছিল।

আপাতত সেই কাজটাই করছে সে। স্যালারি খুব বেশি নয়। তবে ভদ্রস্থভাবে চলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু কাজটা করতে খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে কবিতার বইয়ের রিভিউ-এর দায়িত্বটা নিয়ে সে খুব খুশি। কত নামকরা কবি, সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হচ্ছে। তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হচ্ছে!

একমাস আগে যখন উশ্রীর প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত হয়ে মদ খেয়ে মাতলামি করছিল, তখন কি জানত জীবন এভাবে সুন্দর একটা বাঁক নেবে! ওই লোকটা আচমকা এসে থাপ্পড় না মারলে সে হয়তো আজও মাতাল হয়ে কোনো নর্দমার পাশে পড়ে থাকত। জীবন এমন সুন্দর—তা জানা হত না। বন্ধুত্ব এত সুন্দর তাও অজানা থাকত। ঊর্মির বন্ধুত্ব, নিজের মনের মতো কাজ করার আনন্দ—কোনোটাই পেত না সে।

আজকাল স্বপ্নে শনিদেব এসেও আর হামলা করছেন না। সব মিলিয়ে বড়ো শান্তিতে আছে মন্দার। সবকিছুই ভালো লাগছে। এমনকি টিকলির ভয়ংকর এক্সপেরিমেন্টাল ডিশগুলোও খুব সুস্বাদু মনে হয়। অফিস থেকে ছুটি হওয়ার পর ঊর্মির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা বা কুলফি খেতে ভালো লাগে। ভালো লাগে তার সঙ্গে পার্কে বসে চিনেবাদাম চিবোতে। সে বীরপুঙ্গবের মতো জানায় আজকে কোন কোন কবিকে রিভিউতে একহাত নিয়েছে। ঊর্মি মুখে সস্নেহ হাসি নিয়ে সব শোনে। আবার মন্দারের কথা শুনে সে 'কবিতা ডট কমের কবিতাও' পড়তে শুরু করেছে। সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

সব মিলিয়ে সময়টা বড়ো সুন্দর। যে কন্ডাক্টারটা রোজ রেজগি নিয়ে ঝামেলা করে, কখনো কখনো তাকেও চুমু খেতে ইচ্ছে করে মন্দারের! নেহাত সেটা সম্ভব নয় বলে চেপে গেছে।

নারকেল গাছের তিরতিরে ছায়াটার দিকে তাকিয়ে আপনমনেই নিজের কথা ভাবছিল সে। এত সুখ, এত আনন্দ হঠাৎ কোথা দিয়ে এল! একমাস আগেও যে জীবনটাকে ফ্যাকাশে মনে হচ্ছিল, সে কোথা থেকে এত রং নিয়ে এসে হাজির হল! জীবন কি এমনই! কোথায়, কোন বাঁকে কি লুকিয়ে রাখে—তা কেউ জানে না!

আরও কি কি ভাবত কে জানে, কিন্তু তার আগেই মোবাইল সশব্দে বেজে উঠেছে। মন্দার ডিসপ্লেতে চোখ রাখল। ঊর্মির ফোন।

—'হ্যাঁ, বলো।'

ওপ্রান্ত থেকে ঊর্মির উচ্ছ্বাসিত স্বর ভেসে আসে—'শিগগির হোটেল ব্লু স্টারে চলে এসো। দারুণ খবর আছে।'

—'কী খবর? তুমি বিয়ে করছ?'

—'ধ্যাৎ!' ঊর্মি ঝাঁঝিয়ে উঠেছে—'তুমি একটা গাগোল। তাড়াতাড়ি এসো বলছি।'

—'গাগোল!' মন্দার বিস্মত—'সেটা কী!'

boierpathshala.blogspot.com

—'গাড়োল আর ছাগলের মিক্সচার। তুমি আসছ কিনা! আমি আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। তারপর স্ট্রেট তোমার বাড়ি চলে যাব।'

—'কী এমন সুখবর যে আর তর সইছে না!' মন্দার ফিচেল হাসি হাসে— 'কোনো হতভাগা তোমার প্রেমে পড়েছে নাকি!'

—'ডোন্ট টক রাবিশ। আমি রাখছি। তোমার হাতে আর আধঘণ্টা সময় আছে। হারি আপ।'

'হারি আপ' শুনে মন্দার প্রায় হ্যারি পটারের ঝাঁটার মতোই দ্রুতবেগে 'ব্লু স্টারে' পৌঁছোল। ঊর্মির সব ভালো। কিন্তু বড্ড জেদি! সময়মতো না পৌঁছালে হয়তো সত্যি সত্যিই বাড়ি এসে হামলা করবে। আজ দুপুরে মা কষিয়ে চিকেন রান্না করেছে। সে আবার ভয়ানক খেতে ভালোবাসে। মাকে 'কাকিমা...কাকিমা' করে পটিয়ে-পাটিয়ে ঠিক মুরগির ঠ্যাংটা বাগাবে! মন্দার তার জাঙিয়াও লোকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে—কিন্তু মুরগির ঠ্যাং নয়।

অগত্যা 'ব্লু স্টারে' গেল সে। মানে যেতেই হল তাকে। হোটেলের বাইরে পিংক কালারের কুর্তি আর ব্ল্যাক জিনস পরে দাঁড়িয়ে আছে ঊর্মি। আজকে সে বেশ সেজেছে। চোখে লাইনার। গালে গোলাপি আভা। ঠোঁটে মেরুন রঙের লিপস্টিক।

—'কী ব্যাপার! এমন মাঞ্জা মেরেছো যে!'

—'বলছি...বলছি...' ঊর্মি আঙুল নেড়ে বলল—'তার আগে কাকিমাকে ফোন করে বলে দাও যে, তুমি আজ বাড়িতে লাঞ্চ করবে না।'

যাত্তারা! মন্দার মনশ্চক্ষে দেখতে পেল রান্না করা মুরগিটা তার আস্ত ঠ্যাং নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!

—'কেন?'

—'কারণ তুমি আর আমি আজ ব্লু স্টারে লাঞ্চ করব...।'

—'বাট...!'

—'নো বাট...নো ইফ...জাস্ট সেলিব্রেশন...।'

সেলিব্রেশন! কীসের সেলিব্রেশন! গোটাটাই মাথার ওপর দিয়ে গেল! মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেছে!

—'আর ইউ ও কে ঊর্মি?' সে ভয়ে ভয়ে জানতে চায়।

—'নো। আই অ্যাম নট ওনলি ও কে।' ঊর্মি দু-চোখ বুজে বলল—'আই অ্যাম ভেরি ভেরি মাচ ও কে।'

'ও কে'-র আগে এতগুলো 'ভেরি...ভেরি...ভেরি'-র ভেরী বাজছে কেন কে জানে! মন্দার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারে না! মেয়েটা বোধহয় সত্যিই পাগল হয়ে গেছে!

—'ব্যাপারটা কী একটু খোলসা করে বলবে?'

—'ব্যাপার এই...।' নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা চকচকে ম্যাগাজিন মন্দারের দিকে এগিয়ে দিয়েছে ঊর্মি। মন্দার দেখল সেটা 'স্বদেশ'-এর তাজা সংখ্যা।

—'হ্যাঁ। স্বদেশের এবারের সংখ্যাটা এখনও আমি পাইনি।' সে অবাক হয়ে বলে —'কিন্তু এটা দেওয়ার জন্য এমন তাড়া মেরে আমাকে টেনে আনলে। আমি তো কাল-

boierpathshala.blogspot.com

পরশুই এটা পেয়ে যেতাম...।'

বলতে বলতেই মন্দার বিরক্তিমাখা মুখে 'স্বদেশের' প্রথম পাতাটা খোলে। ঊর্মির এ কী জাতীয় রসিকতা! শুধু এই পত্রিকাটা দেওয়ার জন্য এমন হুড়ো মারল।...পাগল না...

ভাবতে ভাবতেই সে থমকে গেছে! একি! পত্রিকাটার মাথায় লেখা 'কমপ্লিমেন্টারি কপি!' ভেতরে একটা খাম গোঁজা।

—'এটা কী?'

—'খুলে দ্যাখো।'

মন্দার তখনও বুঝতে পারেনি ঘটনাটা ঠিক কী ঘটছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো খামটা খুলে দেখল তার ভেতর পাঁচশো টাকার একটা চেক! পাঠিয়েছে 'স্বদেশ' কর্তৃপক্ষ। প্রাপকের নাম মন্দার ভট্টাচার্য!

সে স্তম্ভিত! তার আঙুল কাঁপছে। 'স্বদেশ' তাকে চেক পাঠিয়েছে! কেন? কীজন্য?

দ্রুত হাতে কবিতার পাতা খুলে ফেলেছে ঊর্মি। কবিতার পাতার প্রথম কবিতাটার ওপর আঙুল রেখে বলল—'দ্যাখো।'

মন্দারের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়! সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। পাতার প্রথমেই জ্বলজ্বল করছে কবিতার নাম—'ছেঁড়া রামধনু'! তার নীচেই কবির নাম—'মন্দার ভট্টাচার্য!'

যখন হিরের মতো জ্বলেছিল দ্যুতি
তোমার ও মুখে পানপাতা ধোয়া জল
কোথাও শিশির কেঁদেছিল সারারাতে
তাকেই দু-চোখে ধরেছি যে নিষ্ফল।
এ পাকদণ্ডি ধোঁয়া দিয়ে আজও ঢাকা
পাকে পাকে শুধু তুমি গিয়েছিলে উঠে
সারে গা ডোরেমি ডুবে মরেছিল ঝিলে
যখন সে গান গেয়েছিলে অস্ফুটে।

আজও ছেঁড়া তারে বাজাব কি রামধনু?
আজও কি বর্ষা নেমে আসে এলোচুলে?
তুমি কি এখনও মেঘ রঙে ডুবে থাকো,
অস্তরাগের অলকার উপকূলে?

তুমি কি জেনেছ কেউ রোজ মরে যায়—
ফের বেঁচে ওঠে স্মৃতির পদক্ষেপে!
লাল তিল আজ অন্য সোহাগমালা...

boierpathshala.blogspot.com

থির বিদ্যুতে তেমনই কি ওঠে কেঁপে?

যদিও অতীত ছাপিয়েছে সেই দ্যুতি

আমার এ বুকে বাঁধভাঙা নোনাজল

তবুও মেঘের ঠিকানাটা রাখি চোখে

বৃষ্টিহীনের এটুকুই সম্বল।

—'ঊর্মি!...ঊর্মি...এটা কে পাঠাল! এটা...!' মন্দারের ভীষণ কান্না পেয়ে যায়। এই সেই কবিতা যেটা সেই কষ্টের রাতে লিখেছিল! লোকটা বলেছিল মদ শুধু কষ্ট দেয়, আর কবিতা শক্তি। তাই বুকের যন্ত্রণাকে মুক্তি দিয়েছিল শব্দে শব্দে।

—'সরি, তোমায় জানাতে পারিনি।' ঊর্মি হাসতে হাসতেই বলল—'কবিতা ডট কম-এ কবিতাটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। কপি করে প্রিন্ট আউট নিয়ে স্ট্রেট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম 'স্বদেশ'-এর ঠিকানায়। তখন তোমার ঠিকানা জানতাম না। তাই নিজের বাড়ির ঠিকানাই দিতে হল। আর আজই এটা এসে পৌঁছেছে। কেমন সারপ্রাইজ বলো?'

মন্দার ভেতরে ভেতরে কাঁদছিল। এ তার স্বপ্ন! এ তার বহুদিনের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা! আজ সফল হল।

—'তুমি অনেক বড়ো কবি হবে মন্দার।' ঊর্মির দু-চোখে যেন মন্দারের স্বপ্ন ডানা মেলে দিয়েছে—'একদিন সব বড়ো জায়গায় তোমার কবিতা ছাপা হবে। কিন্তু এই দিনটার কথাই সবাইকে গর্ব করে বলে বেড়াব। বলব যে মন্দার ভট্টাচার্যকে গড়ে উঠতে আমি দেখেছি।'

মন্দার এবার কান্নামাখা হাসি হাসল। ভীষণ সুখে তার চোখে জল এসে গেছে। চোখ নীচু করে চোখের জল লুকোতে লুকোতে বলল—'হোটেলে লাঞ্চ করবে ঊর্মি? কিন্তু হোটেলের কুক যে তোমার পছন্দ-অপছন্দ জানে না। তবে আমি জানি, আজকে আমাদের বাড়িতে চিকেন কষার একটা জব্বর লেগপিস আছে। আর তার সঙ্গে তুমি লুচি খেতে ভালোবাসো—তাই না?'

ভোরবেলায় হঠাৎ লোকজনের সন্ত্রস্ত কোলাহলে ঘুম ভেঙে গেল গহনের! তার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের হুটারের আর্তস্বর!

আজকাল সকালে ঘুম ভাঙতে চায় না তাঁর। রোজ রাতে জেগে থাকাটাই রুটিন হয়ে গেছে। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলোও জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত পিঙ্গল আভা ছড়াতে শুরু করে, তখন তিনি চুপিসারে ছাতে উঠে যান। নির্বাক তাকিয়ে থাকেন উলটোদিকের বাড়ির দিকে। ও বাড়ির জানালায় এক নারীমূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মুখোমুখি দাঁড়ান এক কবি। আর প্রতিরাতে নিজেকে চাবুক মারেন। অসহায়ভাবে ক্ষমা চেয়ে যান সারারাত ধরে। উলটোদিকে বস্তি থেকে কালো ধোঁয়া ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে দেয় চাঁদের ঔজ্জ্বল্য। ঘুরতে ঘুরতে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে।

মেয়েটির নাম জানেন না গহন। কণার কাছে জানতে চাইতে পারতেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করেননি। ওর নাম, বয়েস, যোগ্যতা কোনোটাই জানার দরকার নেই—শুধু আসল কথাটা প্রতি রাতেই অমোঘভাবে জানতে পারেন তিনি। যখন সে ক্ষতবিক্ষত শরীরটাকে

boierpathshala.blogspot.com

টেনে এনে জানলার সামনে দাঁড়ায়, কী এক ব্যাকুল প্রার্থনায় চেয়ে থাকে অনির্দিষ্টের উদ্দেশে—তখন তার ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা হয়ে যায়।

মেয়েটি কখনও গহনকে লক্ষ করেনি। সে জানেও না যে এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি রোজ তাকে দেখার জন্য ছাতে এসে দাঁড়ান। তবু গহন অপেক্ষা করেন, যদি সে একবারও তার দিকে তাকায়! যেমন একটা ছ-বছরের ছেলে আকুলভাবে তাকিয়েছিল তাঁর দিদির নিথর দেহের দিকে। মনে ক্ষীণ আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, যদি দিদির দৃষ্টি একবার তার দিকে ফেরে...!

সে আশা অধরাই থেকে গিয়েছিল। দিদি আর কখনও তাকায়নি তার দিকে। এই মেয়েটিও তাকায় না। গহন মরিয়া হয়ে শুধু কাতর প্রার্থনা করে গেছেন। কিন্তু সে প্রার্থনা সফল হয়নি।

গতকালও দেখা হয়েছিল দুজনের। কাল মেয়েটির হাবভাব অন্যরকম ছিল। অন্যদিনের মতো উদাস, ব্যথিত দৃষ্টিতে শূন্যে তাকিয়ে থাকেনি। বরং তার চোখে আগুন জ্বলছিল। কাল সে কাঁদেনি। বরং ল্যাম্পপোস্টের আলো তার চোখে পড়ে ধিকি ধিকি স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তুলেছিল। একটা হাত তলপেটে রেখে কী যেন অনুভব করার চেষ্টা করে সে। তার মুখ অদ্ভুত এক সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

গহন ভয় পেয়েছিলেন। ও কাঁদছে না কেন? তবে কি চোখের জলও বুকের আগুনে বাষ্প হয়ে গেছে! তলপেটে হাত দিয়ে কী অনুভব করতে চায়! তবে কী...!

প্রায় তিনটে অবধি ওভাবেই দাঁড়িয়েছিল সে। তারপর জানলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানলার পাল্লা বন্ধ হওয়ার আগে একঝলক তার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন। বিস্মিত হয়ে দেখেছিলেন, কান্না নয় এই প্রথম সে হাসছে! অদ্ভুত একটা বঙ্কিম হাসি! হাসিটা যেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ নিয়ে এসে বিঁধল! এমন হাসি লোকে চরম প্রতিশোধ নেওয়ার আগে হাসে।

গহনের বুক দুরু দুরু করে উঠেছিল। সেই হাসিটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। বিছানায় শুয়ে ক্রমাগতই এপাশ-ওপাশ করতে করতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তবু অবচেতনে একটা আশঙ্কা ছিলই।

সেই নিরাকার আশঙ্কাই আজ সকালে রূপ নিল লোকজনের কোলাহলে আর অ্যাম্বুলেন্সের হুটারে!

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন তিনি। হুটার বাইরে নয়, যেন তাঁর বুকের ভেতরে বাজছে। সাইরেনের বিপদসংকেত!

দ্রুত পায়ে বিধ্বস্ত অবস্থায়, উশকোখুশকো চুলে উদভ্রান্তের মতো ছুটে গেলেন বারান্দার দিকে। কণা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। উদবিগ্ন কণ্ঠে তাঁকেই প্রশ্নটা করলেন—'কণা, কী হয়েছে?'

কণা স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখে উদবেগের ছাপ পড়ল—

—'তুমি এত সকালে উঠে পড়েছ যে! চা দেব?'

—'কথা ঘুরিও না। কী হয়েছে?'

কণা চোখ নামিয়ে নিয়েছেন—'তেমন কিছু নয়। বোধহয় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যাই, তোমার চা...!'

তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালেন গহন। দৃঢ় স্বরে বললেন—'কী হয়েছে?'

boierpathshala.blogspot.com

কণা মুখ নীচু করেছিলেন। যখন মুখ তুললেন তখন তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। চোখে রক্তিমাভা। কোনোমতে বললেন—'ওই মেয়েটা আজ ভোর রাতে সুইসাইড করেছে... গলায় দড়ি দিয়ে...মেয়েটা প্রেগন্যান্ট ছিল...!'

শেষ কথাটা যেন তিরের মতো বিঁধল বুকে। কণার দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে। উদগ্র কান্নাকে দমন করার চেষ্টা করছেন।

গহন কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। অ্যাম্বুলেন্সে মৃতদেহ তোলা হচ্ছে। ক্ষিপ্ত জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছে! মেয়েটির স্বামীকে পেড়ে ফেলে এলোপাথাড়ি মারছে। লোকটা মার খেয়েই মরে যেত। কিন্তু তার আগেই পুলিশ এসে তাকে কোনোমতে বাঁচাল।

সমস্ত ঘটনাই চুপচাপ দেখলেন গহন। তারপর নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসমতো প্রাতরাশও সারলেন। কিন্তু সবটাই নিশ্চুপে। আজ শব্দেরা হারিয়ে গেছে। বলার কিছু নেই। শব্দ তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। নরম লিরিক্যাল শব্দে কতবার সাজিয়ে দিয়েছেন পঙক্তির-পর-পঙক্তি।

কিন্তু আজ মনে হল, সেসব শব্দের মানে কি! কতগুলো মূঢ় ফ্যান্টাসি! যে লাশটা ঘাড় মুচড়ে সাদা চাদরের তলায় পড়েছিল—তার কাছে শব্দের কোনো অর্থই নেই। যে ছোট্ট প্রাণটাকে আর জীবনের দায়ভার বইতে হল না, মাতৃগর্ভের নৈঃশব্দ্যকে সম্বল করেই ফিরে গেল অনন্ত অন্ধকারে—সে শব্দের কী বোঝে! তাঁর মধ্যেও কোথাও যেন একটা অন্ধ রাগ জন্ম নিচ্ছিল। কেন রাগ, কীসের রাগ তা নিজেও জানেন না। একটা অন্ধকার সমুদ্র পাঁজরের ওপর প্রচণ্ড রোষে ঝাঁপিয়ে পড়ছে! ভেতরে ভেতরে পাড় ভাঙার শব্দ পাচ্ছিলেন গহন।

—'কোথায় যাচ্ছ?'

প্রাতরাশ শেষ করে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। কণা সভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন—'কোনো জরুরি কাজ...?'

—'শুঁটকির কাছে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। দুপুরে ওর বাড়িতেই খেয়ে নেব। চিন্তা কোরো না।'

তিনি স্বামীর দিকে তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। যেন আরও কিছু বলার আছে। কিন্তু ইতস্তত করছেন।

—'কিছু বলবে?'

—'না...।' কণা ইতস্তত করতে করতেই জবাব দেন—'মানে...'স্বদেশ'-এর সম্পাদক ফোন করেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। ওঁদের এবার একটা স্পেশাল সংখ্যা বেরোবে। তোমার লেখা চাইছিলেন...।' কথাটা বলে ফেলেই আস্তে আস্তে বাকি শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন তিনি—

—'তুমি কি কথা বলবে?'

—'না।'

এত রূঢ় ও স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি, যে কণাও চমকে ওঠেন। গহন একবারে সপাটে 'না' বলার লোক নন। গত পাঁচ বছর ধরে তিনি কোনো ম্যাগাজিনেই লিখছেন না। আক্ষরিক অর্থেই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ সবসময়ই সম্পাদকদের সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

কথা বলেছেন। সবিনয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে নিরস্ত করেছেন তাঁদের। কিন্তু 'না' শব্দটা এত তীক্ষ্ণভাবে কোনোদিন বলেননি।

কণা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাঁকে একবার দেখে নিলেন। তারপর আরও নম্র সুরে বললেন —'তাহলে কি ওঁকে বারণ করে দেব? বলব যে, তুমি লিখতে পারছ না...।'

—'না।' দ্বিতীয়বার আবার সেই শব্দটাই উচ্চারণ করলেন তিনি। শার্টের বোতাম আটকাতে আটকাতে বললেন—'জেনে নাও কবে দিতে হবে। কবিতা দেব আমি।'

কণাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। এক্ষুনি শুঁটকির কাছে পৌঁছোতে হবে। তাকে এই মুহূর্তে ভীষণ দরকার।

শুঁটকি তখন বাড়িতেই ছিল। আজ সে দোকানে যাবে না। তার কবিতার কোটা প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। আর একটা লিখলেই ছাপ্পান্নটা হয়ে যাবে। তাহলেই একটা চার ফর্মার বইয়ের মালিক হবে সে। কবি হবে। শুঁটকি তার পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো সযত্নে গুছিয়ে নিচ্ছিল। আর তার পায়ের কাছে বসে গোপাল গড়গড় করে 'বীরপুরুষ' কবিতাটা আবৃত্তি করছে।

কিন্তু আবৃত্তিতে বাধা পড়ল। গহন দ্রুত পায়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেছেন। শুঁটকি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে নেয়। তিনি একটা কথাও না বলে সোজা সোফার ওপরে বসে পড়েন। কোনোদিকে খেয়াল নেই। চোখে-মুখে কাঠিন্য। নিশ্বাস দ্রুত। চোয়াল শক্ত করে কী যেন ভাবছেন।

শুঁটকি একবার শুঁটকির মুখের দিকে তাকাল। একবার গহনের দিকে। বুঝতে পেরেছে এই মুহূর্তে তার এখানে থাকা উচিত নয়। সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোপাল একবার কিছুক্ষণ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ফের কাগজ-পত্র গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পঞ্চান্নটা কবিতা একের-পর-এক ক্রমানুযায়ী সাজাচ্ছে। একটা আস্ত লোক যে সামনে 'থ' হয়ে বসে আছে— সেদিকে কোনো খেয়াল নেই!

নিজের বন্ধুকে সে খুব ভালোভাবেই চেনে। গহন এইমুহূর্তে কিছুক্ষণ একা থাকতে চান। কিছু একটার সঙ্গে মনে মনে মোকাবিলা করছেন। যখন তাঁর ইচ্ছে হবে তখন নিজেই কথা বলবেন।

প্রায় আধঘণ্টা এভাবেই কাটার পর অবশেষে গহনই মুখ খুললেন। এখন তিনি অনেকটা শান্ত।

—'কী করছিস?'

শুঁটকি হেসে আবৃত্তি করার ভঙ্গিতে বলল—'শূন্যের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরছিলাম আমি/আমার কৈশোর ছিল অর্থহীন/আমার যৌবন ছিল বেমানান—ফাঁকা।/ কীভাবে এত যে বিষ আমি চেয়েছিলাম জীবনে/আছে কি জীবন বলে আজও কিছু?—/ ছাই। শুধু ছাই।'

গহন বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুঁটকি কি ম্যাজিক জানে? অথবা সে অন্তর্যামী!

—'জল খাবি?'

তিনি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে আত্মমগ্নভাবে বললেন—'ভাস্কর চক্রবর্তী। তাই না?'

—'হ্যাঁ, জিরাফের ভাষা। 'ছয় নম্বর কবিতা'।'

boierpathshala.blogspot.com

গহন ফের অন্যমনস্ক! একটা ঝড় এতক্ষণ বুকের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন যেন অঝোরে বৃষ্টি নামল। শুঁটকি বেছে বেছে এই কবিতাটাই আবৃত্তি করল কেন?

—'জল খাবি কিনা বললি না তো!'

প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন গহন—'অতগুলো কাগজপত্র নিয়ে কী করছিস?'

সে রহস্যময় হাসি হাসছে—'কবিতার বই ছাপাব। তারই প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

—'তুই! কবিতার বই ছাপাবি!' বিস্ময়ে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন তিনি— 'আগে বলিসনি তো!'

—'বলে কী হবে?' শুঁটকি হাতের কাগজপত্র সরিয়ে রেখেছে—'তোকে তো বইয়ের কপি দিতে পারব না। কবিতা পড়াতেও পারব না। জানতে পারলে খিস্তি দিবি। তাই বেমালুম চেপে গিয়েছিলাম।'

—'কপি দিতে পারবি না মানে! বই ছাপাবি মানে মিনিমাম দুশো-তিনশো কপি বেরোবে। তার মধ্যে একটা কপি আমাকে দিবি না! ফাজলামি হচ্ছে!'

—'ওই দেখ। তুই কিছু না জেনেই ফের সেন্টু খেতে লেগেছিস!' সে বলে—! 'আসল ব্যাপারটা একটু আলাদা। এ বইয়ের দুশো, তিনশো কপি আদৌ হবে না! হবে মাত্র এক কপি।'

—'এক কপি!' পুরো ব্যাপারটাই মাথার ওপর দিয়ে গেল গহনের— 'এতগুলো টাকা খরচ করে তুই শুধু এক কপি বই ছাপাবি! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

—'মাথা আর কবে ঠিক ছিল? আমি হচ্ছি লগনচাঁদা ছেলে।' সে হো হো করে হেসে উঠেছে—'এক কপিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

গহনের মনে হল গোটা ব্যাপারটাই তাঁর মাথায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। শুঁটকির কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না।

শুঁটকিও বোধহয় বুঝতে পারে যে গহন কিছুই বোঝেননি। তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়। একজন প্রখ্যাত কবি কি করে বুঝবেন যে সে কেন পয়সা খরচ করে মাত্র এক কপি বই ছাপাবে? এই বইটা সবার জন্য নয়। শুধু রুমার কাছেই শুঁটকি কবি হতে চায়। রুমাকে না-বলা কথাগুলো সে কবিতায় সাজিয়েছে। তা বারোয়ারি হবে কেন? এ শুধু তার আর রুমার নিভৃত সংলাপ! অন্য লোকের পড়ার অধিকার নেই। এমনকি গহনেরও নেই!

শুঁটকি মনে মনে চিন্তা করে, বইটাকে সে বাঁধিয়ে রাখবে। সামনে লাল ভেলভেটের মলাটের ওপর সোনার জলে নাম লেখা থাকবে তার। প্রতিটি পাতা ল্যামিনেট্রেড হবে। যেদিন জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার ফটফটে রুপোলি আলো এসে পড়বে বিছানার ওপর, হুহু করে দখিনা বাতাস আছড়ে পড়ে তৈরি করবে অদ্ভুত মূর্ছনা, হাস্নুহানার মদির গন্ধ ছড়িয়ে রুমা চুপি চুপি এসে বসবে রকিং চেয়ারে, সেদিন তার খোঁপায় জুঁইফুলের মালা পরিয়ে দেবে শুঁটকি। জুঁইফুল বড়ো ভালোবাসে রুমা। আর সারারাত ধরে একের-পর-এক কবিতা শুনিয়ে যাবে। এ কবিতাগুলো শুধু তার আর রুমার। আর কারুর নয়।

—'আমার কথা ছাড়। নিজের কথা বল। নতুন কোনো কবিতা লিখলি?'

গহন মাথা নাড়ালেন। তাঁর চোখ যেন জ্বলে ওঠে—'এখনও লিখিনি। তবে এবার লিখব।'

boierpathshala.blogspot.com

—'এই তো চাই! সা-বা-শ!' শুঁটকি খুশি হয়ে চেয়ারের হাতলে চাপড় মারে—'এবার তবে অন্ধকারে যা গহন। অন্ধকারে যা। অন্ধকার তোকে ঠিক পথ চিনিয়ে দেবে। সঠিক পথ!'

পূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন গহন—'সেইজন্যই তোর কাছে এসেছি। একটু অন্ধকার দিতে পারিস আমায়? নিস্তরঙ্গ অন্ধকার?'

সে তাঁর দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক হাসি হাসে।

—'একটু বোস।'

'মিথ্যে দিয়ে ঘেরা এই পৃথিবীর শেষ সত্য দেখতে চাই আমি
যে হিংস্রতা আমাকে পোড়ায় প্রতিদিন
যে নিষ্ঠুরতার কাছে প্রতিদিন হেরে যাই আমি—
স্নায়ুহীন আলোর সমাজে
একটি ওঙ্কার ধ্বনি টের পেতে চাই আমি।
এই শুধু, শুধু মাত্র এই।'

সামনে নিঃসীম অন্ধকার। ঘরের সব জানলা বন্ধ। কোনোদিক দিয়ে সামান্য আলোর ক্ষীণ রশ্মিও আসছে না। চতুর্দিকে স্থির নিস্তব্ধতা। মাতৃজঠরের মতো শব্দহীন, আলোহীন শান্তি।

কবি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। অবশ্য দেখতেও চাইছিলেন না। অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অন্ধকারে। হোঁচট খাচ্ছেন। ঠোক্কর খাচ্ছেন। মাঝেমধ্যেই অপ্রয়োজনীয় কিছু কঠিন বস্তু ধাক্কাও মেরে যাচ্ছে। তবু সামলে নিচ্ছিলেন।

কবির ঠিক সামনে একটি কাচের আয়না ছিল। আর কিছু টের না পেলেও আয়নাটার মসৃণ অস্তিত্ব টের পেয়েছেন। দেখতে না পেলেও আন্দাজ করতে পারেন, সেই আয়নাটায় এখন এক নগ্ন অন্ধকারের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

হাত দিয়ে সেই অন্ধকারের প্রতিবিম্বকে স্পর্শ করতে চাইলেন গহন। অন্ধকার মানুষ চেনে। চেহারা নয়, কণ্ঠস্বর নয়, তাঁর অন্দরের উলঙ্গ সত্তাকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। গহনের মনে হল তার আঙুলগুলো সেই স্থির আঁধারে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। আঙুলগুলো স্পর্শ করছে এক অনাবিল বাস্তবকে। স্পর্শ করছে সেই শব্দগুলোকে যা আজ সকালেই শুনেছেন।

মেয়েটা প্রেগন্যান্ট ছিল!
এক ফিনিক্স পাখি জন্ম নিতে চেয়েছিল।
প্যান্ডোরার বাক্সে বন্দি অনুভূতির রাজ্যে
দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে চেয়েছিল সে।
রোজ চেতনার সতীচ্ছদ ছিন্নভিন্ন করে নপুংসকের দল—
বিষাক্ত ঔরস রক্তাক্ত যোনিবর্ত্মে অনুপ্রবেশ করে
জন্ম দিতে চায় আর একদল মেফিস্টোর!

boierpathshala.blogspot.com

তবু জন্মাতে চেয়েছিল ফিনিক্স পাখিটা
তখন কালীঘাটের বস্তিতে তাড়ি সহযোগে বিষ পান করেছে
ক্লান্ত অর্ফিয়ুস।
পার্কস্ট্রিটের আলোঝলমলে চোখে কখন যেন আচমকা
ভেসে উঠেছিল একলা হ্যামলিন!
তার জন্মক্ষণে কেউ বাঁশি বাজায়নি।
জলভরা থলিতে শুয়ে সে শুনেছিল মাতালের চিৎকার।

আর কতদিন রাংতা মোড়া আলেয়ায়
নিষ্ফল পদচারণা করে যাব!
আর কতদিন নেঁচে, কুঁদে মৈথুনিয়ে—ব্যর্থ শুক্রকীটের
মতো ভেসে বেড়াব নীল গহ্বরে!
স্বপ্নের সমাধিতে প্রস্রাব করে বলব—'আমি
পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত বাঁচতে চাই!'
রমানাথ মিস্তিরি, ছেদীলাল পিয়োনের ধর্ষকামী রিরংসার জ্বালায়
সিতিমার অশ্রু দেখে লাফিয়ে উঠব নিজের আবিষ্কারে—'আহা চাঁদে জল আছে!'
ফিনিক্স পাখিটা জন্ম নিতে পারত।
ঝলমলে ডানায় রোদের টুকরো নিয়ে
সাজিয়ে দিতে পারত পাতায় পাতায়।
অথচ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল নির্নিমেষে!
স্বপ্ন পুড়ে যাওয়ার আগে
নিজেকেই ভস্মীভূত করে গেল নীরব প্রতিবাদে।

এই দ্যাখো, সেই ভস্মে হাত রেখেছি আমি—
ভস্মাচ্ছাদিত হয়ে দাঁড়িয়েছি প্রশ্নের মুখোমুখি!
যে আঁধার অকুতোভয়ে সহ্য করেছে বীভৎস পাশবিকতা
আজ সেই অনঙ্গ অন্ধকার প্রশ্ন হয়ে ছাত থেকে ঝুলছিল
একা!
আমি দেখেছি তার গর্ভে ফিনিক্সের পচাগলা শব।
আমি মেখেছি তার ছাইভস্ম।

boierpathshala.blogspot.com

প্রশ্নটা মৃত মাছের দৃষ্টিতে দেখছিল আমায়

দেখো না—ভয় পাই!

গহন থামলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। একটা কান্না গলা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছিল বারবার। আর থাকতে পারলেন না। একটা ভাষাহীন কাঁপুনি তাঁকে ভেঙে দিচ্ছিল। টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিল।...

পুরো ছাপ্পান্নটা!

শুঁটকির আজ বড়ো আনন্দের দিন। গতকাল রাতেই শেষ কবিতাটা লিখে ফেলেছে। আজই পাবলিশারের কাছে যাবে। তার মনের ভেতরে অস্থিরতা! যতদিন লেখা সম্পূর্ণ হয়নি ততদিন ধৈর্য ছিল। কিন্তু এখন ধৈর্য জবাব দিয়ে দিয়েছে। সে মনে মনে ভাবছিল, কতদিনে বইটা হাতে পাবে। কেমন দেখতে হবে! বুবাইয়ের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনে ঠিক যেমন একটা ভয়—উৎকণ্ঠা মেশানো আনন্দ তিরতির করে কাঁপছিল, তেমনই একটা উত্তেজনা খেলে বেড়াচ্ছিল তার রক্তে।

—'গোপাল, বল তো আজ কোন দিন?'

গোপাল মাথা চুলকে জবাব দেয়—'বিষ্যুদবার।'

—'ধুর পাগল, আজ যে বৃহস্পতিবার তা আমিও জানি।' সে হেসে বলে—'আর কি বল তো?'

গোপাল বিমূঢ় হয়ে মাথা নাড়ে। আজ স্বাধীনতা দিবস নয়। হলে পাড়ার ছেলেরা মোড়ের মাথায় তিনরঙা পতাকা টাঙাত। আজ ভ্যালেন্টাইন ডেও নয়। তাহলে হোর্ডিঙে —ছেলেমেয়েরা মাথা, মুখ ঠোকাঠুকি করত। তবে আজ কী দিন?

সে আমতা আমতা করে বলে—'তালে?'

—'আজ আমার জন্মদিন।' শুঁটকি হাসল—'বল বিকেলে কী খাবি?'

গোপালের সপাট উত্তর—'মাছ-ভাত।'

—'বোঝো!' তার হাসি পেয়ে যায়—'মাছ-ভাত তো রোজই খাস। আজ কী খাবি? যা বলবি তাই খাওয়াব।'

গোপাল অনেক ভেবেচিন্তে উত্তর দিল—'মাছ-ভাত।'

শুঁটকি হাল ছেড়ে দেয়। গোপালের দোষ নেই। জীবন ওর গ্রামাফোনের পিন-টা মাছভাতের ওপরই আটকে রেখেছে। যতই জিজ্ঞাসা করা হোক রেকর্ডে 'মাছ-ভাত'-ই বাজবে।

সে মনে মনে ঠিক করে বিকেলে দোকান থেকে ফেরার পথে বিরিয়ানি কিনে আনবে। গোপাল কখনও বিরিয়ানির স্বাদ পায়নি। আজ একবার চোখই দেখুক।

—'ঠিক আছে। বিকেলে ভেবে দেখব'খন।'

কোনোমতে স্নান করার নামে কয়েক মগ জল গায়ে ঢেলে, নাকে-মুখে দুটো গুঁজে সে তৈরি হয়ে নিল। প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য চশমার দোকানে হাজিরা দেবে। তারপর সিধে কলেজ স্ট্রিট।

boierpathshala.blogspot.com

আজ রাস্তাতে ট্র্যাফিকের করুণ দশা! অন্যান্য দিনও যে খুব ভালো পরিস্থিতি থাকে তা নয়। কিন্তু আজকের চাপটা একটু অস্বাভাবিক। স্কুল-অফিসের তাড়া, সবই ঠিকঠাক আছে। তবু সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত একটা সন্ত্রস্ত ভাব!

কোনোমতে দোকানে পৌঁছোতেই থমথমে পরিবেশের কারণটা বোঝা গেল। তার এক কর্মচারী বিশু জানাল—'দাদা, আইজ আমি তাড়াতাড়ি ঘর ফিরুম। দুইটার আগে আমারে ছুটি দেন।'

শুঁটকি তখনও ভালোভাবে নিজের চেয়ারটাতে বসতে পারেনি। তার আগেই এ-হেন আবদার শুনে তার ভুরু কুঁচকে গেছে। আজ কি সকলেরই বিশেষ দিন নাকি!

—'কেন?'

—'টি.ভি.-তে দ্যাখেন নাই?' বিশু অম্লানবদনে জানায়—'সরকারি পাট্টির লোকেরা বিরোধীর তিনটারে মারসে। দুফর দুইটায় প্রতিবাদ মিছিল বাইরইবে। ম্যালা ঝকমারি। তায় আবার পায়ে বাত। যাইতে সময় লাগবেনে। আমি চান্স নিমু না। দুইটার আগেই শ্যালদা পারাইয়া যামু।'

সে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছিল। তিনটের সময় তার কলেজ স্ট্রিট পৌঁছোনোর কথা। পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হবে। 'শিয়ালদা' নামটা শুনে তার মাথায় তিনজন মানুষের খুন হওয়ার কথা মনে পড়ল না। মনে পড়ল না প্রতিবাদ মিছিল ও তার আনুষঙ্গিক সমস্যার কথা। শুধু মনে হল কতক্ষণে পৌঁছোতে পারবে! রাস্তায় যদি ট্রাফিকের চাপ থাকে তবে সময়মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারবে তো!

শুঁটকির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। অন্যমনস্কভাবে বিশুকে বলল—'ঠিক আছে, তুই আগেই বেরিয়ে যাস।'

—'আইচ্ছা।' সে খুশি হয়ে মাথা নেড়ে কাউন্টারে ফিরে যায়। সহকর্মীদের সঙ্গে দেশের হাল নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে।

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোকানে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছিল। সেদিকে মন নেই শুঁটকির। আজ কাউকে ধরে কবিতা শেখানোর ইচ্ছেও দেখা গেল না তার। অস্থির হাতটা মাঝেমধ্যেই ব্যাগের ভিতরের কাগজের তাড়াটাকে স্পর্শ করছে। ওদিকে ঘড়িটাও আজকে বড়ো আস্তে চলছে। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার কাঁটা যেন আর নড়তেই চায় না।

—'হ্যাঁ রে।' অনেকক্ষণ উশখুশ করে শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে, পাশে দাঁড়িয়ে আরেক কর্মচারীকেই জিজ্ঞাসা করে বসল সে—'ক-টা বাজে? আমার ঘড়িটা বোধহয় স্লো যাচ্ছে।'

কর্মচারীটি বিস্মিত দৃষ্টিতে তার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে—'বারোটা কুড়ি দাদা।'

—'এখনও সাড়ে বারোটা বাজেনি!'

এলাহাবাদ থেকে শুরু করে অক্ষরেখা-দ্রাঘিমারেখা সবার ওপরই বিরক্ত হল শুঁটকি। এ কী জাতীয় চক্রান্ত! আজ কি সময়টা একটু তাড়াতাড়ি এগোতে পারে না! না তারও পায়ে বাত ধরেছে!

সে অন্যমনস্কভাবে বলে—'তোরা দোকানটা দেখ, আমি একটু বেরোচ্ছি।'

boierpathshala.blogspot.com

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দোকান থেকে বেরিয়েই পড়ল শুঁটকি। বাইরে তখন কাঠফাটা রোদ্দুর। শোরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ রোদ নির্বিচারে উষ্ণতা ঢেলে যাচ্ছে শহরের ওপর। পিচের গরম রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ভুঁড়িওয়ালা ট্রাফিক পুলিশ নিরন্তর মূকাভিনয়ে ব্যস্ত। তার মধ্য দিয়েই কখনও রুপোলি, কখনও সোনালি, কখনো-বা চেরি রঙের ঝিলিক মেরে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি।

—'বাবা, শ্যালদা যাবে?'

সে তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবছিল কোথায় যাবে! শোরুমের এ.সি.র নিষ্প্রাণ শীতলতা ভালো লাগছিল না। চশমার কেনা-বেচা ফ্রেমের ডিজাইন, লেন্সের পাওয়ার, ক্যাশবাক্স, পাঁচশো, হাজার টাকার নোট—কোনোটাই এই মুহূর্তে অভিপ্রেত নয়। জাগতিক বস্তুর মোহ থেকে সে যে আজ বহুদূরে দাঁড়িয়ে, সে কথা কে বুঝবে!

তাই ভাবছিল যে এখন থেকে তিনটে অবধি কোথায় যাবে, কী করবে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই ভাবনায় ছেদ পড়ল।

এক বুড়ি পরনে জন্মের নোংরা কাপড়চোপড়! হাতে দগদগে একটা ভীষণদর্শন ঘা। হাতের পুঁটুলিটা তার জামাকাপড়ের চেয়েও নোংরা। চামড়া ওঠা বলিরেখাময় মুখে অসহায়তার ছাপ। কুঁকড়ে যাওয়া মুখটাকে কুণ্ঠায় আরও কুঁকড়ে বলল—'দশটা ট্যাকা নয় বেশি দেব! শ্যালদা যাবে বাবা?'

শুঁটকি প্রথমে অবাক হল। কথাটা বলেই পিচুটিমাখা পিটপিটে চোখে তার দিকে দেখছে বুড়ি। সর্বনাশ! ট্যাক্সি ড্রাইভার ভেবেছে নাকি! হঠাৎ মনে পড়ল যে, আজ সে অ্যাশ কালারের সাফারিস্যুট পড়েছে। আর চেহারাটাও ট্যাক্সি ড্রাইভারেরই অনুকূলে!

সে হেসে ফেলে। বুড়ির ভুলটা ভাঙিয়ে দিতেই যাচ্ছিল! তার আগেই সে খুনখুন করে বলল—'না হয় পনেরো ট্যাকাই বেশি নিয়ো। কিন্তু পৌঁচে দাও। আল্লা তোমার ভালো করবেন। আমি দোয়া করব।'

শেষ দুটো কথা শুঁটকির বড়ো ভালো লাগল। সে ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। কিন্তু পনেরো টাকা বেশি দেওয়ার মধ্যে যে দুনিয়াদারির ছোঁয়া ছিল, শেষ দুটো বাক্যের আন্তরিকতা তাকে আদ্যন্ত মুছে দিল। আপাতদৃষ্টিতে দোয়ার চেয়ে টাকাটা অনেক বেশি লোভনীয়। কিন্তু পরের জিনিসটার জন্য বড়ো লোভ হল শুঁটকির। প্রার্থনা কার কাছে করা হচ্ছে সেটা বড়ো নয়। কিন্তু তার জীবনেও প্রার্থনা করার কেউ আছে, তার জন্যও 'দোয়া' করতে একজোড়া হাত অসীমের দিকে উঠবে—এটা ভেবেই খুশি হল।

—'বেশ।' সে এক মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। নিজের গাড়ির পিছনের দরজা খুলে দিয়েছে—'এসো বুড়োমা।'

বুড়োমা গাড়ি দেখে হকচকিয়ে গেছে। সে একটা কালো-হলুদ রঙের ট্যাক্সি আশা করেছিল। তার জায়গায় একটা স্টিল কালারের জেন!

শুঁটকি তার মনোভাব বুঝল। শান্তস্বরে বলে—'আমার ট্যাক্সিটা গ্যারাজে গেছে। এটা মালিকের গাড়ি। তুমি উঠে এসো।'

বুড়ি ভয়ে ভয়ে পিছনের সিটে বসেছে। তার ছোট্ট শরীরটা আরও গুটিয়ে আছে। যেন সে অচ্ছুৎ! গাড়ির গায়ে তার হাত লাগলেই পুরো গাড়িটা অপবিত্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা।

—'আরাম করে বসো। অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

boierpathshala.blogspot.com

শুঁটকি তাকে আশ্বস্ত করে। একটু একটু করে বুড়োমার জড়তা কাটে। তারপর আস্তে আস্তে জানায় তার ইতিহাস।

সে ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে বসে ভিক্ষে করে। আগে তার এত দুরবস্থা ছিল না। তার বুড়ো শিয়ালদায় রিকশা টানত। একবার সেই যে মুখ থুবড়ে পড়ল, আর উঠল না। তারপর থেকেই এই দুর্দশা! আজ ঠা ঠা রোদে শরীর খুব খারাপ লাগছে। সকাল থেকে যে টাকা জমেছে তা সম্বল করেই ট্যাক্সি ধরার দুঃসাহস দেখাতে হয়েছে। কিন্তু কোনো ড্রাইভারই ঘেন্নায় তাকে গাড়িতে তুলতে চায় না। আল্লার অনেক মেহেরবানি যে শুঁটকির মতো মানুষও পৃথিবীতে আছে!

শুঁটকি তার ইপ্সিত জায়গায় তাকে নামিয়ে দিল। বুড়ি পুঁটুলি থেকে কয়েকটা নোট বের করে এনেছে।

—'বুড়োমা, টাকা তোমার কাছেই থাক।' সে হেসে বলল—'আমার দোয়াই যথেষ্ট।'

বুড়ির শুকনো চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। কী বলবে যেন ভেবে পায় না। কোনোমতে ধরা গলায় বলে—'তোমার সব খোয়াব সাচ্চা হোক বাবা। তোমার মধ্যে খোদা আছে। তোমায় খোদা ভালোবাসেন। তার প্যায়ার সবসময় সঙ্গে থাকুক।'

শুঁটকি তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই ফের টের পেল পরিচিত মিষ্টি গন্ধটা। সামনের আয়নায় দেখল বুড়োমা যেখানে বসেছিল, ঠিক সেখানেই বসে হাসছে রুমা। এখন আর সে ছায়া হয়ে নেই। বরং ঝাপসা ঝাপসা অবয়ব নিয়ে বসে। যেন ঘষা কাচের ওপ্রান্তে বসে আছে।

সে-ও তার দিকে তাকিয়ে হাসল। দিনটা আজ বড়ো সুন্দর। আজ রুমাকে সবচেয়ে বড়ো উপহার দেবে। রুমা আর রাগ করে থাকতে পারবে না। ফিরে আসতেই হবে তাকে। ফিরে আসতেই হবে...।

'ফুরায় না তার যাওয়া, এবং ফুরোয় না তার আসা,
ফুরোয় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা।
সারাটা দিন আপনমনে ঘাসের গন্ধ মাখে
সারাটা রাত তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে।
ফুরোয় না তার, কিছুই ফুরোয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়োয় না।
ভালোবেসে মেঘলা আকাশ দেবে,
কিংবা চোখে অনন্ত মৌসুমী?
ভালোবাসা কান্না ভালোবাসে
এ কথা কি জানতে আগে তুমি?'

কবিতা ডট কমের 'আকাশনীল' কবিতাটা আজ সকালেই পোস্ট করেছে। মন্দার একঝলক দেখেই চোখ সরিয়ে নেয়। তার আজ কিছুই ভালো লাগছে না। কবিতাও নয়।

boierpathshala.blogspot.com

সামনে বেশ কয়েকটা বই পড়ে আছে। ওগুলো পড়ে রিভিউ লিখতে হবে। ল্যাপটপে জ্বলজ্বল করছিল 'কবিতা ডট কম'। তবু কিছুতেই শান্তি নেই। আগে কখনও এমন হয়নি মন্দারের। শুধুমাত্র একটি মানুষের অনুপস্থিতি যে সমস্ত কিছুকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে, এ ধারণা তার ছিল না। এমনকি—উশ্রী যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তখন একটা চিড়বিড়ে জ্বালা তাকে জ্বালিয়ে মারছিল। কিন্তু এখন কোনো জ্বালা নয়, কোনো যন্ত্রণা নয়, ব্যর্থতা আর হতাশা এসে জমেছে বুকে। অদ্ভুত একটা ব্যথা যার বর্ণনা করা সম্ভব নয়—তেমনই একটা ব্যথা বারবার চিনচিন করে উঠছে।

এই নিয়ে সাতদিন হল ঊর্মি ফোন করেনি। তার ফোন তোলেনি। কথা বলেনি, দেখা করেনি। মেসেজের উত্তরও দেয়নি। এমনকি শুটিং-এও হানা দিয়েছিল সে। কিন্তু ঊর্মি সেখানেও নেই! মন্দারের মনে হচ্ছিল সারা দুনিয়ায় এখন আগুন লাগুক, সুনামিতে ভেসে যাক সমস্ত ভারতবর্ষ। ঊর্মির সাড়া না পেলে, সঙ্গ না পেলে সব অর্থহীন! ঊর্মি না থাকলে—সব ফাঁকা।

কী অন্যায় মন্দার? ঊর্মির সঙ্গে মিশতে মিশতে হঠাৎই তার মনে হয়েছিল জীবন বড়ো সুন্দর! একদিন আবিষ্কার করল, ঊর্মিকে তার প্রয়োজন। ভীষণভাবে প্রয়োজন! শুধু একঘণ্টা-দু'ঘণ্টায় তার মাধুর্যটুকু যথেষ্টভাবে উপভোগ করা হচ্ছে না। সারাজীবন ধরে সে তাকে পাশে চায়। ওই নরম হাত তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরুক। সারাজীবন পাশে পাশে হাঁটুক। ফুচকা, চিনেবাদাম খেয়ে টাইম পাস করুক—কিন্তু লাইফ টাইমের জন্য।

এক সুন্দর বিকেলে সাহস করে মনের কথাটা বলে ফেলেছিল সে। ঊর্মির স্পর্শ যে তার দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে, সে হাসলে মনে হয় সব জ্বালা ভুলে গিয়ে ঊর্মির নরম কোলে মুখ গুঁজে দেয়—সব বলেছিল। ভীষণ আবেগে তার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বলেছিল—'তুমি আমার জীবনে এসো ঊর্মি। আমি তোমাকে চাই।'

ঊর্মি তড়িদাহতের মতো চমকে ওঠে। হাত দুটো সজোরে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—'কী বলছ? পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

—'এখনও হইনি।' মন্দার তার হাত দুটো ফের জড়িয়ে ধরেছে—'কিন্তু একবার হ্যাঁ বলে দ্যাখো। আনন্দে সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাব। পার্কস্ট্রিটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলব—'আমি ঊর্মিকে ভালোবাসি।' দরকার পড়লে পেন্ডুলামকেও চুমু খেয়ে থ্যাঙ্কস জানাব। ঊর্মি, তুমি আমার জীবনে এলে আমি পাগল হতেও রাজি।'

ঊর্মির চোখে জল জমেছিল। সে দৃঢ় গলায় বলে—'তা হয় না।'

—'কেন?'

—'তুমি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানো?'

এ প্রশ্নটার জন্য তৈরি ছিল মন্দার। সেই লোকটা আগেই তাকে বলে রেখেছিল।

—'তোমার সারনেম চ্যাটার্জি, সাউথ সিটিতে মা, বাবা, দিদির সঙ্গে থাকো, ঝাল সহ্য করতে পারো না, কিন্তু খাদ্যরসিক। হলুদ আর কমলা রং পছন্দ, তোমার রাশি কন্যা, কবিতা পড়তে ভালোবাসো—এসব তো আমি জানি।'

—'না সবটা জানো না।' রাগে ঊর্মির নাকের পাটা ফুলে ওঠে—'আসল জিনিসটাই জানো না। তুমি জানো আমার অতীত কী?'

—'দরকার নেই ঊর্মি। আমি শুধু জানি তোমাকে ছাড়া আমি এক পাও এগোতে পারব না।'

boierpathshala.blogspot.com

ঊর্মি শুধু দৃঢ়স্বরে বলে—'না।'

মন্দার ব্যথা পেল। ব্যথিত স্বরে বলল—'না কেন? তুমি আমায় পছন্দ করো না? ভালোবাসো না?'

—'না, সে অধিকার আমার নেই।'

—'অধিকারের প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে?'

তার দিকে তর্জনী তুলে বলল ঊর্মি—'তুমিই তুলেছিলে প্রশ্নটা।'

—'আমি!'

মন্দার কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। ঊর্মি কি বলছে! ভালোবাসার অধিকার! প্রশ্ন!

—'জানতে চাও তুমি কাকে ভালোবাসো?' সে উত্তেজিত গলায় বলে— 'দেখে নাও তবে...।'

বলতে বলতেই নিজের মাথার চুল ধরে টানল! মন্দার স্তম্ভিত! গোটা চুলের গোছাটাই ঊর্মির হাতে! আসলে ওটা উইগ! ঊর্মির মাথায় একটা চুলও নেই! সম্পূর্ণ খাঁ খাঁ করছে।

সে চমকে উঠেছিল। কিন্তু আরও চমক বাকি ছিল। নিজের হাতেই তার ধনুকের মতো ভুরু দুটোও খুলে ফেলল ঊর্মি। সে দুটোও নকল। তার ভুরুও নেই! মন্দারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরলকেশ, ভুরুহীন নারী।

মন্দারের মুখে কোনো কথা জোগায় না। সে বাকশক্তিরহিত। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

—'ষোলো বছর বয়সে একটা রোগ হয়েছিল। 'অ্যালোপেশিয়া ইউনিভার্সালি' বলে রোগটাকে।' গলা কাঁপছে ঊর্মির—'খুব বড়ো ক্ষতি কিছু হয়নি। শুধু মাথার চুল, ভুরু, গায়ের লোম—সব ঝরে গিয়েছিল। আর কখনও গজায়নি।'

বলতে বলতেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ে—'রোগটা না হলে লোকে আমায় উশ্রীর মতোই সুন্দরী বলত। কিন্তু আমি একটা কুৎসিত বাস্তব! এক অসম্পূর্ণ নারী। ঘর-সংসার, সন্তানের স্বপ্ন দেখার অধিকার নেই আমার। কাউকে ভালোবাসতে পারি না, কবির কল্পনা হওয়ার যোগ্যতাও নেই। কখনও মাথায় ফেট্টি বেঁধে, ভুরুঢাকা চশমা পরে, কখনও বা বিদেশি উইগ, নকল ভুরু পরে একটা নকল জীবনযাপন করি। এবার বলো, কবির প্রেমিকা হওয়ার যোগ্যতা আছে আমার?'

ঊর্মি একটু থামল, মন্দার তখনও তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে তখন অন্যকথা ভাবছিল। স্বপ্নে একবার উশ্রীকে এমনই বিরলকেশ অবস্থায় দেখেছিল। চুল ছাড়া তাকে জঘন্য দেখাচ্ছিল।

কিন্তু ঊর্মিকে তো অত খারাপ লাগছে না! বরং অভিমানাহত ভিজে চোখের দৃষ্টিতে, স্ফুরিত অধরে তাকে আরও সুন্দরী মনে হচ্ছিল! মন্দারকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফুঁসে উঠেছিল ঊর্মি।—'এবার কথা বেরোচ্ছে না কেন মুখ থেকে? তুমিই তো আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলে যে 'কবির প্রেমিকার মাথায় ঘন চুল থাকাটা মাস্ট', প্রেমিকার মাথার ঘন চুলটাই কাব্যিক। মনে পড়ে?' তার চোখ কান্নায় লাল হয়ে গেছে। কোনোমতে বলল— 'আর কখনও আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো না মন্দার। আমি কবির প্রেমিকা হওয়ার যোগ্য নই।'

বলতে বলতেই সে ছুটে চলে গিয়েছিল। মন্দার নির্বাক হয়ে তার চলে যাওয়া দেখে। কী বলল ঊর্মি! এসব কথা মন্দার তাকে কবে বলেছে? সে তো এগুলো কবিতা ডট কমে

boierpathshala.blogspot.com

কুবলাশ্বকে বলেছিল! তবে ঊর্মি...। তার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। বিস্মিত স্বরে আপনমনেই বলে—'ঊর্মি কুবলাশ্ব!'

ঊর্মিই যে আসলে কুবলাশ্ব হতে পারে তা সে কখনও কল্পনা করতে পারেনি। যখন জানল তখন প্রথমে স্তম্ভিত হয়েছিল। পরে ঊর্মির ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকা, কবিতা সম্পর্কে গভীরতা, বিস্তারিত আলোচনা—সব একের-পর-এক মিলিয়ে দেখছিল। ঊর্মিকে সে ভালোবাসে, আর কুবলাশ্বকে শ্রদ্ধা এবং সমীহ—দুটোই করে। ঊর্মি কুবলাশ্ব না হলে তাতে ব্যথা পেত মন্দার। কিন্তু এখন হারানোর কথা ভাবতেই পারছে না!

সে আবার ডায়াল করল ঊর্মির নম্বর। ক্রমাগতই বেজে যাচ্ছে! তুলছে না কেউ। কেটে দিয়ে আবার ফোন করল। এবারও ফোন নিরুত্তর! মন্দারের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। আজই ব্যাপারটার এস্পার কি ওস্পার করে ছাড়বে সে। ঊর্মিকে তার সঙ্গে আজ কথা বলতেই হবে। সব সিদ্ধান্ত সে একা নিতে পারে না। মন্দারের কথাও তাকে শুনতেই হবে। শুনিয়েই ছাড়বে তাকে।

সে ঘড়ির দিকে তাকায়। প্রায় তিনটে বাজতে যায়। স্টুডিয়োতে এখন উশ্রীর সঙ্গে যায় না ঊর্মি। অতএব তাকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে।

অসময়েই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল মন্দার। তার মনে তখন অটুট সংকল্প! আজ ঊর্মিকে ছাড়বে না সে। মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। তার সব প্রশ্নের জবাব আজ সে পাবে। আজ মন্দার তাকে কোনো মূল্যেই ছাড়ছে না!

—'তুমি!'

দরজা খুলেই প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ঊর্মি। সে সপাটে মুখের উপর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। তার আগেই দরজার ফাঁকে পা গলিয়ে দিয়েছে মন্দার।

—'দাঁড়াও।'

ঊর্মির চোখে সেই পাঁউরুটি ফ্রেমের চশমা, মাথায় ফেট্টি। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে —'কেন এসেছ? তোমার এত বড়ো সাহস!'

—'সাহসের এখনও কিছুই দ্যাখোনি তুমি।' মন্দার অদ্ভুত রকমের বেপরোয়া! সে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলে জোর করেই ভেতরে ঢুকল—'কিন্তু আজ দেখবে।'

উশ্রী এখন শুটিংয়ে। ঊর্মির মা-বাবা এই সময়ে অফিসে থাকেন। ঊর্মিকে বাড়িতে একা পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। মন্দার দেখল, তার আন্দাজ সম্পূর্ণ সঠিক। বাড়ি একদম ফাঁকা। সে পিছন ফিরে দরজায় ছিটকিনি তুলে দেয়। ঊর্মি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে। কোনোমতে বলে—'কী করছ?'

—'যা অনেক আগেই করা উচিত ছিল।'

—'মন্দার, পাগলামি করো না।'

—'আমি বিন্দুমাত্রও 'পাগলামি' করছি না।' সে ঊর্মির দিকে এগোতে থাকে—'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। সেখানে পাগলামি নেই।'

মন্দারের চোখে অদ্ভুত জেদ! ঊর্মি ভয় পেয়ে পিছোতে থাকে।

—'আমি চ্যাঁচাব মন্দার...এগিয়ো না...।'

boierpathshala.blogspot.com

—'আজ স্বয়ং ঈশ্বর এলেও আমাকে ঠেকাতে পারবে না।' সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল —'চ্যাঁচাও...কত চ্যাঁচাতে পারো।'

বলতে বলতেই মন্দার জাপটে ধরেছে ঊর্মিকে। তার বাহুবন্ধনের মধ্যে বনবিড়ালের মতো খণ্ডযুদ্ধ করছে মেয়েটা। হাতের নখে ছড়ে গেল মন্দারের গাল। তবু সে তাকে বুকের ওপর আরও শক্ত করে চেপে ধরেছে।

—'ছেড়ে দাও...।' ছটফট করতে করতে বলল ঊর্মি...—'আমার লাগছে।'

—'চোপ!'

প্রেম মানুষকে হয়তো বন্য করে তোলে। করে তোলে শক্তিশালী। যে মন্দার আগে উশ্রীর সামনেই দাঁড়াতে ভয় পেত, সে যে কখন ছেলে থেকে পুরুষ হয়ে গেল তা কেউ জানে না! প্রেম শেখায় যে তার নিজের, তাকে যে-কোনো মূল্যে পেতে হবে। তার জন্য অল্প বলপ্রয়োগও দোষের নয়!

শান্তশিষ্ট হিসাবে পরিচিত মন্দারের উগ্র ধমক খেয়ে ঊর্মি হতভম্ব! মন্দার তখন মাথার ফেট্টি টান মেরে খুলে ফেলেছে। চশমাটাও একটানে চোখ থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

—'আর কতদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখবে?' সে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে—'নিজের আসল সৌন্দর্য কোথায় সেটা নিজেই জানো না! স্টুপিড কোথাকার! তুমি অসম্পূর্ণ? তোমার ভালোবাসার অধিকার নেই? তোমাকে আমি শিক্ষিত, ইনটেলেকচুয়াল, অসাধারণ ভাবতাম। কিন্তু তুমি তো একটা অশিক্ষিত, মধ্যযুগীয় মেয়ে ছাড়া কিছুই নও!'

সে ঊর্মিকে ছেড়ে দিল। উত্তেজনায় তার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে। ঊর্মি দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। ভুরুহীন কেশবিরল কুৎসিত মুখ কাউকে দেখাতে চায় না।

—'মুখ ঢেকেছ কেন?' মন্দার তার হাত দুটো জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। নিজের দুই হাতে তার মুখ চেপে ধরে—'ভুরু থাক বা না থাক, চুল থাক বা না থাক এ মুখ এখন আমার। দেখতে দাও আমায়।'

দু-মিনিট সব চুপচাপ। মন্দারের চোখে অদ্ভুত মুগ্ধতা! ঊর্মির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেও যেন তার সাধ মেটে না। এমন গভীর নদীর মতো চোখ, স্নেহক্ষরা দৃষ্টিতে অদ্ভুত বিস্ময়, প্রেম আর কান্না! চোখের জলেও এত সুখের রং থাকে তা সে আগে কখনও দেখেনি। ঊর্মির ঠোঁটজোড়া প্রজাপতির মতো থিরথির করে কাঁপছে। এ নারী কুৎসিত নয়! এ নারী অন্য প্রজাতির! সম্পূর্ণ আলাদা।

—'কবির প্রেমিকারা কেউ নারী নয় ঊর্মি। আমি বুঝতে পেরেছি, আসলে তারা শুধু একটা আইডিয়া। তারা কারুর নয়। তারা আসলে কেউ নেই। কিন্তু তুমি আছ। তুমি আমার রক্তমাংসের নারী।' মন্দার চিবুক ধরে তার মুখ সামান্য তুলে দেয়—'মন্দার ভট্টাচার্যকে গড়ে উঠতে দেখেই খুশি! গড়ে ওঠার পথে সঙ্গ দেবে না?'

ঊর্মি কেঁদে ফেলছিল। জীবনে এত সুখ কখনও সে পায়নি। আজ পর্যন্ত জেনে এসেছে কোনো পুরুষের ভালোবাসা পাওয়া তার ভাগ্যে নেই। সংসার, সন্তান, নিজের পুরুষ কোনোটাই তার জন্য নয়। কিন্তু আজ মন্দারের প্রেমসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল—ও আমার!...ও শুধুই আমার! ওকে ঈশ্বর আমার জন্যই পাঠিয়েছেন।

মন্দারের মুখ তার মুখের কাছে ঘন হয়ে এসেছে। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট। বাধা দিল না। পরম সুখে তার চোখ বুজে এসেছে। ঠোঁট ঠোঁট ডুবিয়ে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে মন্দার। তার হাত দুটো বড়ো সযত্নে খুলে ফেলেছে নাইটি। আঙুলগুলো এমনভাবে স্পর্শ করছে

boierpathshala.blogspot.com

যেন সে বড়ো দামি জিনিস। ঊর্মি বড়ো আনন্দে দুজনেই অধীর। দুটো হৃদপিণ্ড বড়ো কাছাকাছি, একসঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে। যেন বলছে—

'আমার কাছে আসতে বোলো
আমায় ভালোবাসতে বোলো
বাহিরে নয়, বাহিরে নয়
ভিতর জলে ভাসতে বোলো
আমায় ভালোবাসতে বোলো
ভীষণ ভালোবাসতে বোলো

বিছানায় মন্দারের বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়েছিল ঊর্মি। আজ প্রমাণিত হয়েছে সে নারী। সেও ভালোবাসতে পারে। অন্য মেয়েদের মতো রতিক্রিয়াতেও পারদর্শী। জীবনের এই নতুন আবিষ্কারে বারবার রোমাঞ্চিত হচ্ছিল সে।

—'হাতটা দাও তো।'

মন্দারের কথা শুনে মুখ তুলে তাকায় ঊর্মি—'কেন?'

—'যোগ্য হাত যখন পেয়েছি, তখন এটাও পরিয়ে দিই।'

তার হাতে এককণা নীলাভ আগুন দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলে উঠল। এই সেই হিরের আংটি। তার অনামিকায় অতি যত্নে আংটিটা পরিয়ে চুমু খেল মন্দার—

—'আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত অনুভব তোমায় দিলাম। নিজের করে নেবে ঊর্মি।'

ঊর্মি লাজুক হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

—'ম্যায় করু তো শালা, ক্যারেক্টার ঢিলা হ্যায়।'

কফি হাউসে বসে শুঁটকি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কবি অনুপম মিত্রের দিকে মন্তব্যটা ছুড়ে দিল। কথাটা বলেই সজোরে হেসে উঠেছে। অনুপম অপ্রস্তুত—'কী বলতে চাইছ?'

—'কী আর বলব?' সে চিকেন স্যান্ডউইচে আলতো কামড় বসায়—'তুই তো বাবা, দিব্যি দোকান খুলে বসেছিস। এখনও আঁতেলগুলো ছাড়া কবি হিসাবে আর কেউ তোর নাম জানে না! শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে দশটা লোককে 'অনুপম মিত্র'র নাম বললে ভাববে —তল্লাটে নতুন কোনো টিকিট চেকার এসেছে।'

অনুপমের মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে। কিন্তু রেগে গিয়েও কিছু বলার উপায় নেই। ইনফ্যাক্ট বলার ক্ষমতাই নেই। শুঁটকিকে সমস্ত কবিই অল্পবিস্তর চেনে। কথার ঝাঁঝের জন্যও কুখ্যাত। বেশি কথা বললে এমন ডোজ দেবে যে পালাবার পথ পাওয়া যাবে না।

তাই সে মুখ বুজেই থাকল।

boierpathshala.blogspot.com

—'অথচ এখনই বগলে মামণিদের নিয়ে ঘুরছিস। পরশু রাখি। তরশু মল্লিকা। কাল মুন্নি, আজ...?'

শুঁটকি কিছু বলার আগেই অনুপমের পাশের মেয়েটি নিজের নাম বলে দিল—'শীলা। শীলা ভাদুড়ি।'

—'বাঃ। শীলাও চলে এসেছে!' কৌতুকে তার চোখ নেচে ওঠে—'উইদ হার জওয়ানি!' শুঁটকির দৃষ্টি মেয়েটির দিকে ফিরল—'তা মামণি, এত লোক থাকতে এই ভামটার সঙ্গে ঘুরছ কেন? দেখে তো বাচ্চা মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কবিতা লেখো। আর এই মাকড়াটা বলেছে যে ওর সাথে ঘুরলে বড়ো বড়ো পত্রিকায় লেখার স্কোপ দেবে। তাই না?'

মেয়েটি অবাক হয়ে একবার শুঁটকির দিকে, আর একবার অনুপমের দিকে তাকায়। সে কী করে জানবে যে মার্কেটে সকলেই অনুপমকে হাড়ে হাড়ে চেনে! বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়েছে। ঘরে স্ত্রী-ছেলে সবই আছে। তবু তার চুলকানি কমেনি। মহিলা কবি দেখলেই তাকে প্রোমোট করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বলে— 'আমার সঙ্গে লেগে থাকো। তোমার ব্যবস্থা করে দেব।' সে লেগে থাকার প্রসেস যে কেমন, আর শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা কী হয় তা কারুর অজানা নেই।

শুঁটকি মেয়েটির দিকে তাকায়। রীতিমতো সুন্দরী। সুন্দরীরা আবার কবি হলে নাক উঁচু হয়। এই মেয়েটির হাবভাবও তেমন। একটা অদ্ভুত 'সবজান্তা...সবজান্তা' ভাব!

তার মেয়েটিকে নিয়ে একটু মজা করার ইচ্ছে হল। সে আস্তে আস্তে বলে—'তা মামণি, কতদূর পড়াশোনা করা হয়েছে?'

—'ইংলিশে এম. এ. করেছি।' সপ্রতিভ উত্তর।

—'তারপর? ফিউচারে কী করার ইচ্ছে আছে?'

—'লেখালেখিই করব। কবিতা আমার প্যাশন।'

—'কীরকম প্যাশন?' শুঁটকি মুচকি হাসে।

মেয়েটি কফি হাউসের ছাতের দিকে তাকিয়ে বলে—'আই ইট পোয়েট্রি, ড্রিংক পোয়েট্রি, ড্রিম পোয়েট্রি,...।'

—'ওরে বাবা! তুমি তো দেখছি কবিতা গুলে খেয়ে ফেলেছ। বেশ, বেশ। তা বাংলা কবিতা লিখবে না ইংলিশ?'

—'দুটোই।' মেয়েটা শুঁটকির সামনেই ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। 'আই ওয়ান্না বি আ বাইলিঙ্গুয়াল পোয়েট।'

'বাইলিঙ্গুয়াল! আ-হা।' সে কী যেন ভাবছে—'তুমি নিশ্চয়ই প্রচুর পড়াশোনা করেছ। বাইলিঙ্গুয়াল পোয়েট হওয়া সহজ কথা নয়। তা বলো তো মা—এই লাইনগুলো কার?'

শুঁটকি আবৃত্তি করল—'I saw her as a sailor after the storm/rudderless in the sea, spies of a sudden/the grass green heart of the leacy island/where were you so long? she asked...'

মেয়েটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অনুপমের দিকে তাকায়। অনুপমেরও 'সসেমিরা' অবস্থা। কবিতাটা সে-ও চিনে উঠতে পারেনি। গুরু ও শিষ্যার দ্বৈত কনফিউশন দেখে শুঁটকির হাসি পাচ্ছিল। তবু সে হাসি চেপে গম্ভীর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

boierpathshala.blogspot.com

—'টেনিসন?'

টেনিসন! শুঁটকি এবার হেসে ফেলেছে। হাসতে হাসতেই বলল—'নাঃ।'

—'তবে? শেলী? বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ?'

পাশ থেকে অনুপমও জানতে চায়—'কীটস?'

—'বেচারা বায়রন বাদ গেল কেন?' সে অনুপমের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে —'আফটার অল লোকটা 'ডন জুয়ান' লিখেছিল। যাকে এককথায় তোর বায়োগ্রাফি বলা যায়!'

অনুপম অপমানিত বোধ করে। বিরক্ত গলায় বলে—'রহস্য ছেড়ে বলবে এটা কার লেখা? আমি কস্মিনকালেও পড়িনি...।'

—'শিয়োর যে কস্মিনকালেও পড়িসনি?' তার মুখে একটা রহস্যময় হাসি, চোখে কৌতুক—'দাঁড়া, এটার বাংলা ভার্সানটা বলি। এবার দ্যাখ পড়েছিস কিনা!'

বলেই সে গড় গড় করে বলে গেল—....'হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা/সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর/তেমনই দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন?...'

অনুপম প্রায় লাফিয়ে ওঠে—'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন! জীবনানন্দ!'

—'তাহলে দেখ কস্মিনকালেও পড়িসনি কথাটা ঠিক নয়!' শুঁটকি বলল— 'প্রথমটা চিদানন্দ দাশগুপ্তের অনুবাদ ছিল। ইংরেজি শব্দগুলোর মানে ভালো করে বুঝলেই বনলতা সেন'কে ধরতে তোর দু-মিনিটও লাগত না। কিন্তু তোরা তো কবিতা পড়িস না—মুখস্থ করিস। মুখস্থ বিদ্যা গাল ভরে আওড়াতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেই ফুসসস।'

বলতে বলতেই তার সহাস্য দৃষ্টি মেয়েটির দিকে ফেরে—'বুঝেছ মামণি? কবি হতে গেলে সিগ্রেট, মদ, দাদা, মামা, কিস্যু ধরার দরকার নেই। স্রেফ কবিতাকে ধরো। তাকে জলে গুলে খাওয়ারও দরকার নেই। শুধু বোঝো, অনুভব করো। কবিতাই পারে তোমাকে কবি বানাতে, দাদারা নয়। বিনে পয়সায় জ্ঞান দিলুম। নিলে নাও, নয়তো 'শীলা কি জওয়ানি'র চর্চা ই করো। আটকাচ্ছে কে?'

দুই বিমূঢ় নরনারীকে রেখে সে হাসতে হাসতে কফি হাউস থেকে বেরিয়ে গেল। এখন ঘড়ির কাঁটা পৌনে তিনটের ঘর ছুঁইছুঁই। আর পনেরো মিনিট এদিক-ওদিক ঘুরে কাটিয়ে দেবে। কফি হাউসে বসলেও হত। কিন্তু অনুপম আর ওই কচি মেয়েটার ঢলাঢলি দেখার ইচ্ছে তার বিন্দুমাত্রও নেই।

কফি হাউসের সিঁড়ির ঠিক নীচে একটা সিগারেট-চুইংগাম-চকোলেটের ছোট্ট দোকান আছে। সেখান থেকেই এক প্যাকেট সিগারেট কিনল শুঁটকি। কী ভেবে যেন গোপালের জন্য একটা চকোলেট বারও নিয়ে নিয়েছে। ব্যাটাকে আজ রাতে বিরিয়ানি খাইয়েই ছাড়বে।

আপাতত হাতে যখন সময় আছে তখন বিরিয়ানিটাও এই বেলাই কিনে নেওয়াই যাক। পরে মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিলেই চলবে।

boierpathshala.blogspot.com

ভাবতে ভাবতেই বেরিয়ে পড়েছে সে। কিন্তু এগোতে গিয়েই বাধা পেল। ভেড়ার পাল লাইন করে চলেছে আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে। যেন ঠিক শেভিংক্রিমের ফেনা মেখে, গম্ভীর মুখে গুটগুটিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা শুঁটকির প্রায় গায়ের ওপরই উঠে পড়ছিল। কোনোমতে লাফ মেরে সরে গিয়ে এড়িয়েছে। তার বিরক্ত লাগে! এ কী রে বাবা! যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আর-একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না!

বিরক্ত হয়ে সে আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিল—তার আগেই একটা কানফাটানো আওয়াজ; প্রচণ্ড কোলাহল। তীব্র তীক্ষ্ণ সমবেত ভয়ার্ত চিৎকার! যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল গোটা এলাকা। গাছে গাছে বসে থাকা কাকগুলো কর্কশস্বরে মহা শোরগোল ফেলে দিল। এবার ভেড়াগুলো দুড়দাড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে! তার পিছনেই মানুষের দল। ভেড়ার পালের মতোই দৌড়ে আসছে এদিকে। চোখে-মুখে আতঙ্ক। হল কী!

—'কী হয়েছে দাদা?'

সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা একটি লোককে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু লোকটা উত্তর দেবে কি? সে শুঁটকিকে এক ধাক্কা মেরে বেরিয়ে গেছে সামনের দিকে। অসহায়ভাবে খুঁজছে একটা নিরাপদ আশ্রয়!

শুঁটকি দেখল ঝপঝপ করে সব দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! একদল যুবক-যুবতি তার পাশে দিয়ে দৌড়ে গেল। তাদেরই একজনের ভীত কণ্ঠস্বর শুনল শুঁটকি—'পুলিশ এসেছে...ফায়ারিং চলছে!'

ওর মনে পড়ে আজ সকালেই বিশু বলেছিল একটা প্রতিবাদ মিছিলের কথা। সম্ভবত সেই মিছিল এখানে এসে পৌঁছেছে। কফি হাউসে থাকাকালীন কোনো শব্দ পায়নি সে। কিন্তু বেরিয়ে একটা হালকা স্লোগানের শব্দ পেয়েছিল। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা প্ল্যাকার্ড ফেস্টুন হাতে নিয়ে একটু আগেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে। সে তো কত কারণেই যায়। কলেজ স্ট্রিট এলাকায় প্রায়ই স্লোগান, ভাষণ, জমায়েত লেগে থাকে। নিতান্তই পরিচিত দৃশ্য। তাই বিশেষ পাত্তা দেয়নি শুঁটকি!

এখনও যে গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝল, তাও নয়। তবু আন্দাজ করতে পারল, হয়তো প্রতিবাদ মিছিল কোনো কারণে জনবিক্ষোভে পরিণত হয়েছিল। অথবা হত্যার বদলে হত্যার রাজনীতি। বোধ হয় দুই রাজনৈতিক দল হিংসাত্মক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ পুলিশের এই পেশি প্রদর্শন!

পিলপিল করে লোক দৌড়োচ্ছে। শুঁটকি ধাক্কার পর ধাক্কা খেতে খেতে জনস্রোতের উলটো দিকে চলল। তারও পালানোই সমীচীন ছিল। কিন্তু অদ্ভুত কী এক কৌতূহলে সে অকুস্থলের দিকেই এগোল। একের-পর-এক ফায়ারিঙের শব্দ কানে আসছে! প্রবল চিৎকার-চ্যাঁচামেচি! তার মধ্যেই স্লোগানের আওয়াজ।

একটু এগোতেই গোটা দৃশ্যটা চোখে পড়ে তার। কে কোন দলের তা এই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব নয়! রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছে ফেস্টুন! ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। আতঙ্কিত মানুষের পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে প্ল্যাকার্ড। খাকি উর্দি পরা একদল মানুষ এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে। বাইশ-তেইশ বছরের এক যুবক রক্তাক্ত দেহে এলিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপরে। তবু স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে! তার হাতের দৃঢ় মুঠি তখনও আকাশের দিকে অভ্রান্ত লক্ষ্যে স্থির। পুলিশের নিষ্ঠুর লাঠিও তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি।

শুঁটকি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, এ কোথায় এসে পড়েছে! লাঠির বাড়ি খেয়ে কতগুলো তাজা মুখ রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে, ঢলে পড়ছে মাটিতে! কেউ নির্বিবাদে মার

boierpathshala.blogspot.com

খাচ্ছে, কেউ পালাচ্ছে! মিছিল ছত্রভঙ্গ। তবু পিছন থেকে কয়েকজন এসে পুলিশকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। দু-একটা ইট-পাটকেল উড়ে এল উর্দিধারীদের লক্ষ্য করে। লাগল হেলমেটে। প্রতিশোধস্পৃহায় যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

মেয়েদের ওড়না, সালোয়ার কামিজ ছিঁড়ে গেছে। জমে আছে চাপ চাপ রক্ত। সেই অবস্থাতেই তাদের চুলের মুঠি ধরে রাস্তার ওপর দিয়েই ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে চলল পুলিশ ভ্যানের দিকে। উদভ্রান্ত, আতঙ্কিত জনতা দিগবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োচ্ছে। চতুর্দিকে শুধু আর্তনাদ, রক্ত, মৃত্যুর বিভীষিকা!

হঠাৎ মনে হল সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না! কিছু দেখতে পাচ্ছে না! মুহূর্তের জন্য যেন সময় থমকে দাঁড়াল।

শুঁটকি বিস্ফারিত চোখে দেখল ওই আতঙ্কিত মানুষের ভিড়, ক্ষতবিক্ষত দেহগুলোর মধ্যেই রাস্তায় বসে আছে এক দু-তিন বছরের পথশিশু!! যে-কোনো মুহূর্তে তাকে পদপিষ্ট করে চলে যাবে বিভ্রান্ত মানুষের দল! সে কিছুই বুঝছে না! ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজছে। আর চিৎকার করে অসহায়ের মতো কাঁদছে!

সে কান্নার ভাষা কী ছিল তা জানে না শুঁটকি। কিন্তু তার মনে হল ওই অসহায়, বিপন্ন বাচ্চাটা—'বাবা...বাবা...' বলে কাঁদছে। একদিকে জনতার রাশ। অন্যদিকে মারমুখী পুলিশের লাঠি! যে-কোনো মুহূর্তে ওর নরম খুলি দু-টুকরো হয়ে যাবে যেমন দিঘার বোল্ডারে বুবাইয়ের মাথাটা!

সে দেখল—বুবাই রাস্তায় বসে দু-হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে। ও আর কেউ নয়! তার বুবাই! বুবাই কাঁদছে 'বাবা...বাবা...' করে, অসহায় ভাবে ডেকে চলেছে। তাকেই খুঁজছে।

একমুহূর্তেই মাটিতে লুটোল এতদিনের পরিশ্রম! এতদিনের স্বপ্ন-কবিতার পাণ্ডুলিপি রাস্তাতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে! শুঁটকি ছুড়ে ফেলে দিল সবকিছু। উন্মাদের মতো সবলে জনস্রোতের বুক চিরে ছুটতে লাগল বাচ্চাটার দিকে! বুবাইয়ের মাথা লক্ষ্য করে উদ্যত হয়েছে শক্ত লাঠি! আবার চলে যাবে ও! বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে!

যেতে দেব না তোকে...আর যেতে দেব না বাবা!

সে চিৎকার করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চাটাকে আড়াল করে। পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে এলোপাথাড়ি লাঠি চালাচ্ছিল। এক বাড়িতেই ওইটুকু শিশুর মাথা চুরমার হয়ে যেত। হয়ে গেলেই বা কী হত! কত ভিখিরি মায়ের শিশু এভাবেই বছরের-পর-বছর মারা যায়। মৃতের সংখ্যা একটা বাড়ত বই তো কিছু নয়।

অথচ তার আগেই কোথা থেকে এক খ্যাপা এসে লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে। বুকে জড়িয়ে ধরেছে বাচ্চাটাকে। লাঠির মোক্ষম বাড়ি থেকে বাঁচল শিশু। কিন্তু লোকটা নিজেকে বাঁচাতে পারল না। জোরালো আঘাত পড়ল একেবারে মাথার পিছন দিকে। মস্তিষ্কের সবচেয়ে অরক্ষিত অংশে!

বাচ্চাটা দেখল তাকে যে মানুষটা বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তার মাথা দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে। নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল শিশুটির মুখের ওপর। তা সত্ত্বেও লোকটা তার দিকে তাকিয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে হাসছে। দু-হাত শক্ত করে ধরে তাকে বুকের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে, সে নিজে অবশভাবে কাত হয়ে পড়ল। ভয়ার্ত মানুষেরা

boierpathshala.blogspot.com

তাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার কোনো সাড়া নেই! সে স্থির দৃষ্টিতে কী যেন দেখছে!

শুঁটকি কেমন যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল! তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। কত রক্ত...কত রক্ত! অথচ রক্তের গন্ধ নেই তো! বরং হাস্নুহানার গন্ধে ভরে যাচ্ছে চতুর্দিক!

শুঁটকি মুগ্ধ হল। তার রক্তে এত হাস্নুহানার গন্ধ মিশে ছিল! শিরায় শিরায় এতদিন ধরে বয়ে চলেছিল রুমার সৌরভ! আজ সেই সুগন্ধ শুঁটকির দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায় হাওয়ায়; সমস্ত কলেজ স্ট্রিট জুড়ে আজ রুমার গন্ধ!

সে জানে মৃত্যু আসছে। সবাই বলে মৃত্যু বড়ো কষ্টকর। কিন্তু মৃত্যু কি রুমার মতো? নয়তো সামনে এসে ও কে দাঁড়িয়েছে! সাদা শাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। উড়ছে খোলা চুল। সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে এ নারীকে ভেনাসের মতো দেখায়। এই মুহূর্তে ছায়া ছায়া নয়। নয় ঘষা কাচের পিছনের আবছায়া—একেবারে স্পষ্ট রুমা। হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছে!

শুঁটকি হাসতে চাইল। বলতে চাইল—'এসেছ?'

তার মুখটা হঠাৎ একটা হেঁচকি তুলেই শক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু চোখ দুটো তখনও হাসছে, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। বুকের ভেতর শিশুটাও টের পেলে না মানুষটার বুকের ওঠাপড়া থেমে গেছে!

শুঁটকি দেখতে পেল না তার বড়ো সাধের কবিতার পাণ্ডুলিপিকে পিষে দিয়ে চলে গেল পুলিশের জিপ! সেই ভিখারিনি জানতে পারল না যে তার প্রার্থনা ঈশ্বর এত তাড়াতাড়ি কবুল করে নিয়েছেন। মন্দার জানল না, যে মানুষটি তাকে বাঁচতে শিখিয়েছিল, সে আজকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। আর কবিতা ডট কমের সদস্যরা কোনোদিনই হয়তো জানবে না যে, সাইটের মডারেটর ব্যাসদেবের প্রোফাইলটা থেকেই গেল, কিন্তু লোকটা নেই!

—'তুই নাকি আবার কবিতা লিখছিস?'

ঘুঁটু চায়ের কাপে আলতো চুমুক দেয়। তার বহরের জন্য সে সবসময়ই ঘামে। তার কপালে ঘাম জমছিল। গহন সেটা লক্ষ করেই এ. সি. চালিয়ে দেন।

—'কবিতা লিখছি কিনা জানি না—কিন্তু কিছু একটা লিখছি।'

—আমাকে 'স্বদেশ'-এর সম্পাদক বললেন তুই ওঁদের স্পেশ্যল ইস্যুতে কবিতা দিবি বলেছিস।'

—'ঠিকই শুনেছিস।' গহন শান্ত স্বরে বললেন—'তবে কবিতা লিখব বলিনি। বলেছি কিছু একটা লিখব।'

—'তুই কবিতা ছাড়া আর কী লিখবি!' ঘুঁটু অবাক।

তিনি স্মিত হাসলেন—'এর আগেও কি আদৌ কবিতা লিখছিলাম! যাইহোক, এবার অন্তত কিছু লেখার চেষ্টা করব।'

—'তাহলে আমাদের ম্যাগাজিনে একটা কবিতা দে গহন। অনেকদিন তোর লেখা পড়িনি।'

boierpathshala.blogspot.com

ঘুঁটুর চোখ আমেজে বুজে আসে—'আহা, কী জলতরঙ্গের মতো শব্দ, কী রোম্যান্টিসিজম, কী অদ্ভুত ছন্দ!...ভীষণ মিস করি তোর লেখা।'

গহন তার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

—'ঘুঁটু, তুই কি সত্যিই আমার লেখা চাস? না ফরমায়েশি লেখা চাইছিস?'

—'ফরমায়েশি লেখা কখন চাইলাম!' ঘুঁটু আকাশ থেকে পড়ে।

—'এই যে বললি জলতরঙ্গের মতো শব্দ, রোম্যান্টিসিজম, ছন্দ—এটসেট্রা, এগুলো যদি বাদ দিয়ে দিই—তবেও কি আমার কবিতা চাইবি?'

সে অবাক হয়ে গহনের দিকে তাকিয়ে আছে। গহন আপনমনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এরা তাঁকে রোম্যান্টিক কবির ট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে। এ ট্যাগ ভেঙে বেরোতেই হবে তাঁকে। তিনি প্রসঙ্গ পালটালেন—'অসিতদা কেমন আছেন?' ঘুঁটুর মুখে হতাশার ছাপ পড়ল—'আছেন একরকম। কথাবার্তা বলেন না। ঠিকমতো চিনতেও পারেন না। হাতটা হয়তো ফিজিয়োথেরাপিতে খানিকটা ঠিক হবে। কিন্তু মানসিক অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার বলছে— ডিপ্রেশন।'

গহনের মনে পড়ল অসিতদার বলা কথাগুলো। কথা নয়, যেন হাহাকার! তবে কি তাঁর মনের অবচেতনে কোথাও অন্য কোনো সুপ্ত বাসনা ছিল? আদর্শের জন্য তাকে অবহেলা করেছেন? আর তাই হয়তো এই শেষ বেলায় অবহেলিত ইচ্ছেগুলো তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে অবচেতনে। ঘিরে ফেলেছে নিরন্তর হতাশায়।

—'এখন আর কবিতা লেখেন না?'

—'ওটাই শুধু আছে।' ঘুঁটু বলে—'হাতের কাছে কাউকে পেলেই তাকে ইশারায় খাতা-পেন আনতে বলেন। তারপর লাইন-বাই-লাইন বলে যান। কবিতা শেষ হয়ে গেলে ফের কী চিন্তায় যেন ডুবে যান। আর কিছু বলেন না। এই তো কালই এই কবিতাটা আমি কপি করেছি।'

সে ব্যাগ থেকে একটা নোটবুক বের করে আনে। গহন কবিতাটা পড়লেন—

আমাকে দিয়েছ তুমি বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়নিচয়;
শ্রেষ্ঠত্বের যত পরিচয়—
বিবেকের কশাঘাত, বুদ্ধির আলো
মনুষ্যত্ব বিকাশের সুবর্ণসুযোগ—
শব্দে শব্দে সন্ধির যোগ!
মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়নি আমার
জীবনের গুরুভার বইতে পারিনি আর
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে ভরেছিল আকাশ
তখন বসন্ত মাস।
অহো! কী অবর্ণনীয় শোভা!
ভাতের চেয়েও কি সে বেশি মনোলোভা!
যে বালক উঠোনে বাঘবন্দি খেলত

boierpathshala.blogspot.com

বসন্ত তার জীবনে এসেছে কখনও....

কবিতা-আজ তুমি শোনো—

মনুষ্যত্ব ছিল আমার,

সুযোগ ছিল, ইন্দ্রিয় ছিল,

ছিল বিবেক, বুদ্ধিও ছিল

শুধু বিষ...বিষে ভরেছি অণু-পরমাণু

আমি অমানুষ

তিনি কবিতা পড়া শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নোটবইটা ঘুঁটুকে ফেরত দিয়ে বলেন —'তুই আমার কবিতা চাইছিলি না? তার জায়গায় এই কবিতাটা ছেপে দে।'

—'খেপেছিস!' ঘুঁটু প্রায় লাফিয়ে ওঠে—'অসিতদা চিরকাল প্রতিষ্ঠানবিরোধী! আমি যদি পত্রিকায় এই কবিতা ছাপাই তাহলে উনি আত্মহত্যা করবেন!' এমনিতেই মানুষটা আধমরা হয়ে আছে। তুই কি ওঁকে পুরোপুরি মারতে চাস গহন?'

গহন স্মিত হাসলেন। ঘুঁটুর কাঁধে হাত রেখে বলেন—'আমি আমার কথা বললাম। তুই ভেবে দেখ। তবে আমার মনে হয় না অসিতদা আত্মহত্যা করবেন!

ঘুঁটু আরও কিছুক্ষণ থেকে, কিছু চানাচুর আর কুকি ধ্বংস করে অবশেষে উঠে পড়ল। তাকে ফের অফিসে ফিরে যেতে হবে।

ঘুঁটুকে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন গহন। টেবিলের ওপরে বইপত্র অগোছালো ভাবে পড়েছিল। শুঁটকির কাছ থেকে বেশ কিছু বই নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলোকে সকাল থেকে পড়ছেন। কিন্তু নিরুপদ্রবে পড়তে পারছেন না। কী করে যেন চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে, কবি গহন দত্তগুপ্ত ফের লেখালেখি শুরু করেছেন।

ব্যস, তারপর থেকেই একের-পর-এক ফোন। একের-পর-এক আবদার। কারুর পাঁচটি প্রেমের কবিতা চাই, কারুর নিশিগন্ধা সিরিজের নতুন কবিতা লাগবে, কারুর-বা আবার বক্তব্য—'দাদা, প্লিজ একটা কবিতা দিন। আপনার নামে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছি। এখন কবিতা না পেলে নাক কাটা যাবে!'

কতজনের নাক রক্ষা করবেন গহন? মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। আশ্চর্য আক্কেল এদের! বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে একবার জিজ্ঞাসা করে নেয় না কেন? অনুমতি ছাড়াই তাঁর নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসে আছে! যেন ওদের নিজের ওপর নিঃশর্ত জোতদারি দিয়ে দিয়েছেন তিনি!

আলগোছে বইগুলো টেবিলের ওপর থেকে শোকেসে তুলে রাখছিলেন গহন। শুঁটকির বই বলে কথা! একটা আঁচড় লাগলেও সে গহনের মুন্ডু চিবোবে।

কণা তখন বেডরুমে বসে টি.ভি দেখছিলেন। রোজ বিকেলে খবরটা দেখা তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস। কোথায় কী হচ্ছে তা না দেখলে রাতের খাবার হজম হবে না তাঁর।

আজও চ্যানেল বদলে বদলে প্রাত্যহিক খবর দেখছিলেন তিনি। ফিলমের গসিপ, নায়ক-নায়িকার ইন্টুপিন্টু রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করছে উপস্থাপিকা। তিনি চ্যানেল বদলালেন। এসব চটুল খবর শুনতে ভালো লাগে না।

boierpathshala.blogspot.com

পরের চ্যানেলে যেতেই টিভিতে ভেসে উঠল চতুষ্কোণ পর্দায় মারপিটের দৃশ্য। প্রতিবাদ মিছিলের ওপর অন্যায়ভাবে পুলিশের লাঠিচার্জ! পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে, প্রতিবাদ মিছিল সহিংস হয়ে উঠেছিল। তারা গাড়ি ভেঙেছে, বাস জ্বালিয়েছে, বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে পরিচিত মানুষদের মেরেছে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ঠেকানোর জন্যই পুলিশের এই পদক্ষেপ।

পুলিশের দাবি, তারা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করেছে। সরাসরি গুলি চালায়নি। অথচ সাংবাদিকের ক্যামেরায় বুলেটের আঘাতে নিহত যুবকের দেহ! কণা দেখলেন রাস্তার ওপরে রক্তাক্ত দেহের ভিড়! অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে তাদের।

দেখতে দেখতেই তাঁর চোখ বিস্ফারিত! এ কী দেখছেন! হঠাৎ যেন শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করল। সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন—'গহন...'

তাঁর আর্ত চিৎকার শুনেই গহনের হাত থেকে বইগুলো পড়ে গেছে। তিনি প্রায় দৌড়ে এসেছেন। কণার মুখ উত্তেজনায় লাল! দমকে দমকে উঠে আসছে কাশি। কিছু বলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারছেন না।

—'কণা...।' গহন ব্যাকুলভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরে মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে শান্ত... করার চেষ্টা করছেন। কণা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লে এরকম শ্বাসকষ্ট আর কাশি হতে থাকে। তিনি তাঁকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন—'কণা...কণা কী হয়েছে? জল খাবে?'

কণা জোরে জোরে শ্বাস টানছেন। কোনোমতে আঙুল তুলে নির্দেশ করলেন টি.ভি-র দিকে।

'—জল খাও।'

বিছানার পাশেই জলের গ্লাস ছিল। সেটা কণার হাতে ধরিয়ে টি.ভি.-র দিকে তাকালেন তিনি। কী দেখে কণা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সেটাই দ্রষ্টব্য বিষয়।

কিন্তু যা দেখলেন তাতে তাঁরও চেতনা যেন কয়েকমুহূর্তের জন্য বিলুপ্ত হল! কলেজ স্ট্রিটের রাস্তায় অনেকের মধ্যেই পড়ে আছে একটা পরিচিত মানুষের নিথর দেহ। তখনও বুকের মধ্যে বাচ্চাটা সুরক্ষিত! চোখ দুটো স্থির!

তিনি ধপ করে বসে পড়লেন বিছানার ওপর। চোখে জল এল না। মনে হল চতুর্দিকের আলো নিভে গেছে। পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। অনাবিল অন্ধকার...! এখন শুধু অন্ধকার...! কোনো শব্দ নেই....শব্দ নেই...!

বৃষ্টির ফোঁটা হতে চেয়েছিল, ভাসানে বৃষ্টি নয়
দু-এক পশলা ইলশেগুঁড়িতে একমুঠো পরিচয়।
যেমন বর্ষা ফিরে ফিরে আসে, শ্রাবণ আকাশ জানে
মন কেমনের মেঘ জমে ওঠে বাউলের গানে গানে
তেমনই মেঘে সে বুকে ধরেছিল—অলীক রূপান্তর!
বৃষ্টি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে আমার বারিশকর।
লোকে বলে 'খ্যাপা' বৃষ্টি কি আসে নাগরিক চিন্তনে?

boierpathshala.blogspot.com

পাগলটা তবু জল ছুঁয়ে যায় বর্ষার ইন্ধনে।
ছাতের উপরে মই লাগিয়েছে, মেঘ থেকে জল পাড়ে।
কখনো-সখনো গান গেয়ে ওঠে আবিষ্ট মল্লারে।
চালচুলো নেই, নেই কোনো দাবি; হতভাগা এমনে
কখন শিরায় মেঘ নেমে আসে, শুধু সে প্রহর গোনে।
ছেড়ে যায় সুখ, কুয়াশায় ঢাকা নিভৃত বন্দর;
দুঃখের সাথে কানামাছি খেলে আমার বারিশকর।

আমরা দালাল—হিরের মূল্যে বৃষ্টির কণা বেচি,
কত হাঁকেডাকে শূন্য কুম্ভ, কত ভাঁটে চেঁচ্যামেচি!
ঝরিয়ে, ডুবিয়ে, ভাসিয়ে দেওয়ার নানাবিধ কারিকুরি
আসলে সবাই বৃষ্টির নামে জলের আত্মা খুঁড়ি।
আমরা দেশের কৃতীসন্তান, অনোখা যুগন্ধর!
ভিড় থেকে দূরে একা একা হাসে আমার বারিশকর।

যে লোকটা মারে তার রং লাল—যে লোকটা মরে নীল।
এ শালার দেশ শুধু রং চায়, রঙিন মুখ মিছিল!
লাল, নীল, কালো কমলা হলুদ—পরিচয় রঙে বাঁধা!
বারিশকরের কোনো রং নেই—আসলে সে এক ধাঁধা।
নয় সে মানুষ, নয় সে ক্যাডার। দেবতা কদাপি নয়—
নেই তার গুলি মারার সাহস, নেই মৃত্যুর ভয়।
কী জাতীয় লোক? মুখোশের ভিড়ে মুখ হয়ে কেন আসে?
এত কিছু ছেড়ে মানুষটা কেন বৃষ্টিকে ভালোবাসে!
সত্যি পাগল? অথবা কি কোনো হারামি ধুরন্ধর?
পরিচয় শুধু একটাই তার, আমার বারিশকর!

অস্ত্রকে যারা বাগিয়ে ধরেছে ঢ্যামনা সাপের রাগে
নিজের পাছায় চালালে হত না, ধান্দাবাজির আগে?
আপনাদের লাঠি চেনে না মানুষ, শোনে না কান্না হাসি—
দমনকারীর হাতে ফণা তোলে বিমূঢ় খুনপিয়াসী—
বারিশকরের গ্রহে লাঠি নেই, আছে নির্জরা ফুল

boierpathshala.blogspot.com

লাঠির প্রহারে হেসে উঠেছিল, আঘাতের এ কী ভুল!
ফেটে গেল তার বুকের ধমনি ফেটে গেল হৃদশিরা!
বুক ভাঙা শ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে জলের বিষম ব্রীড়া!
লোহিত গন্ধী প্রতিঘাতে তার বৃষ্টির ছল ছল
রক্ত কোথায়! মানুষ কোথায়! এ যেন গভীর জল!
হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে বড়োই স্বার্থপর
বর্ষায় আজ দু-চোখে নেমেছে আমার বারিশকর!

রামহনু মন্তব্য করল—'এ কী লিখেছেন দাদা! কম্পিউটার স্ক্রিন ঝাপসা দেখছি! হ্যাটস অফ! টুপি বিয়োজন!'

কুবলাশ্ব লিখেছে—'অসম্ভব মর্মস্পর্শী। ভীষণ মানবিক। অপূর্ব কবিতা। স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিলাম।'

মুমতাজ জানাল—'এটা বোধহয় এই সাইটে আমার পড়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কুডোস।'

মন্তব্যগুলো পড়তে পড়তে চোখ সজল হয়ে উঠছিল গহনের। বুকের মধ্যে অদ্ভুত অপরাধবোধের ওঠাপড়া। ঘন অন্ধকার ঢেকে রেখেছে তাঁর অবয়ব। গভীর রাতের নৈঃশব্দ্যে নিজের হৃদস্পন্দনের আওয়াজও পাচ্ছিলেন তিনি।

একটু দূরেই সোফার ওপরে ঘুমিয়ে আছে গোপাল। গত তিন দিন ধরে সে একটা কথাও বলেনি। শুঁটকির মুখাগ্নি ওই বাচ্চা ছেলেটাই করেছে। ইলেকট্রিক চুল্লি যখন ওর দেহটা গিলে নিল, তখনও গহন একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন সেইদিকে। ভাবছিলেন, তাঁর জীবনসঙ্গী আজ তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

শুঁটকির চশমার শোরুম আপাতত বন্ধ। ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে এসেছেন গহন নিজেই। তার জিনিসপত্র কিছুই নাড়াচাড়া করেননি। শুধু গোপালকে সঙ্গে এনেছেন। ছেলেটা শুঁটকির মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেনি। কেমন যেন হতভম্বের মতো 'থ' হয়ে বসেছিল। মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি সে। সকালে যে মানুষটা হাসতে হাসতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, রাত্রে সে এমন নিথর হয়ে ফিরল কেন—এই জিজ্ঞাসা তার মনের মধ্যে নিরন্তর ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এই প্রশ্নের উত্তর বোঝার বয়েস ওর এখনও হয়নি। গহন তাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টাও করেননি। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর চুপচাপ তার হাত ধরে এনে তুলেছিল নিজের বাড়িতে। কণা তাকে এ ক-দিন বুক দিয়ে আগলিয়েছেন। গোপাল নীরবে নতুন পরিবেশে, নতুন মানুষদের সঙ্গে মানিয়েও নিয়েছে। কিন্তু একটা কথাও বলেনি। যেন সে বোবা হয়ে গেছে!

কণা তার এই নীরবতায় শঙ্কিত—'ও কাঁদছে না কেন গহন? কথা বলছে না কেন?'

গহন নিজেও আশঙ্কিত হচ্ছিলেন। ওইটুকু ছেলের মনের ভেতরে কী হচ্ছে কে জানে! শোকের এ প্রকাশ বড়োই গভীর। আশঙ্কাজনকও বটে।

boierpathshala.blogspot.com

তিনি কম্পিউটার শাট ডাউন করে গোপালের পাশে গিয়ে বসলেন। ছেলেটা শরীরটাকে কুঁকড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কী মনে করে তার মাথায় হাত রেখেছেন। স্নিগ্ধস্বরে ডাকলেন —'গোপাল।'

গোপাল আধো তন্দ্রায় একবার নড়ে ওঠে। কিন্তু চোখ মেলে তাকাল না।

—'গোপাল।'

এবার সে মিটমিট করে তাকায়। গহন তাকে হাত ধরে টেনে তোলেন।

—'আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাই।'

নীরবে তাঁর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বাচ্চা ছেলেটা। গহন কোনো কথা না বলে ওকে ছাতে নিয়ে এলেন। চতুর্দিক এখন নিস্তব্ধ। একটা জোলো হাওয়া শিরশির করে বয়ে যাচ্ছিল দুজনকে ছুঁয়ে। আকাশে আজ মেঘ নেই। তারাগুলো ঘুম ঘুম চোখে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

—'ওই দেখ।' গহন আঙুল দিয়ে একটি বিশেষ নক্ষত্রকে নির্দেশ করলেন। নক্ষত্রটা কৃশ। তার চোখ ধাঁধানো জ্বলজ্বলে দ্যুতি নেই। কিন্তু অদ্ভুত এক নীলাভ আভায় উজ্জ্বল করে রেখেছে চতুর্দিক। সেই তারাটাকে দেখিয়ে বললেন—'ওই দেখ, তোর বাবা।'

গোপাল অবাক হয়ে গহনের দিকে তাকায়। তারপর নক্ষত্রটার দিকে। নক্ষত্রটা তখনও মায়াময় প্রভা ছড়িয়ে স্নিগ্ধ হাসছে। ঠিক যেন গোপালের দিকেই তাকিয়ে সকৌতুকে চোখ পিটপিট করছে। অবিকল শুঁটকির মতন!

এই প্রথম তার অধর স্ফুরিত হল। তারাটার দিকে তাকিয়ে অভিমানে গাঢ় হয়ে এল দৃষ্টি! একটা অস্ফুট ফোঁপানির শব্দ পেলেন গহন। কয়েক মুহূর্ত পরেই বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল গোপাল। গহনকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদছে। অন্তর থেকে একটা ভীষণ আন্দোলন নিয়ে উঠে আসছে যন্ত্রণাকাতর গোঙানি!

গহন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ বেয়েও অশ্রু টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে। মনে হল, কে যেন কানে ফিসফিস করে বলল—'দেখলি শালা! আমায় নিয়ে সেই কবিতা লিখতেই বসলি।'

তিনি নক্ষত্রটার দিকে তাকিয়েছেন। মনে মনে বললেন—'আমায় ক্ষমা করে দিস, শুঁটকি। আমি কবিতা না লিখে পারলাম না!'

'একা মেঘ ও বারিশকর!'

বইটার নাম দেখেই চমকে উঠল মন্দার। কবির নাম গহন দত্তগুপ্ত! লোকমুখে আগেই শুনেছিল যে তিনি আবার লিখতে শুরু করেছেন। কিন্তু দু-মাসের মধ্যেই যে তাঁর নতুন বই রিলিজ করবে তা জানা ছিল না।

চমকটা সেখানে নয়! 'একা মেঘ' এবং 'বারিশকর' দুটো শব্দই তার ভীষণ পরিচিত। ঠিক দু-মাস আগেই কবিতা ডট কম-এ 'একা মেঘ' 'বারিশকর' নামের একটা কবিতা পোস্ট করেছিল!

সে বইটা আগাপাশতলা পড়ে ফেলল। পড়তে পড়তে তার বিস্ময় ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। এই বইটার অন্তত চারটে কবিতা ডট কম-এ 'একা মেঘ' পোস্ট করেছিল! 'মধ্য ভগবান' 'চারাগাছ' 'ফিনিক্সের জন্ম' এবং 'বারিশকর!'

boierpathshala.blogspot.com

মন্দার স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তার মাথায় সব তালগোল পাকাতে শুরু করেছে। 'একা মেঘ' তবে....!

সে মোবাইল ফোনের ফোনবুক থেকে গহন দত্তগুপ্ত-র ল্যান্ডলাইন নম্বর বের করে ডায়াল করল। কিছুক্ষণ একঘেয়ে রিংটোন। তারপরই একটা মোলায়েম শান্ত পুরুষ কণ্ঠস্বর —'হ্যালো।'

মন্দারের বুক ঢিপঢিপ করে। এ কণ্ঠস্বর তার পরিচিত। গহন দত্তগুপ্ত'র বাড়ির জমায়েতে আগে শুনেছে। তবু সংকোচে জানতে চায়—

—'কবি গহন দত্তগুপ্ত...?'

—'বলছি।'

তার গলাটা একটু কেঁপে যায়—'আপনার নতুন বইটা পড়লাম। একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

—'বলুন।'

—'আপনি কি কখনও 'কবিতা ডট কম-এ' কবিতা লিখতেন? মানে আপনিই কি...'একা মেঘ?'

ও-প্রান্তে হাসির শব্দ। গহন দত্তগুপ্ত হাসছেন। হাসতে হাসতেই বললেন— 'হ্যাঁ, আমিই। আপনি?'

—'আমি...মানে!' মন্দারের তখনও বিশ্বাস হয় না। সে তখন নিজেকে রীতিমতো চিমটি কাটছে—'আমি রামহনু!'

গহন ফের হেসে ফেললেন—'হ্যাঁ, রামহনু। বলুন।'

—'আমায় আবার বলুন কেন দাদা? তুমি করেই তো ডাকতেন।'

—'বেশ। বলো।'

—'ইয়ে...মানে।' সে জিভ কেটে বলল—'আপনার সঙ্গে বড্ড অন্যায় করেছি। অনেক উলটো-পালটা কথা বলেছি...।'

—'উপকার করেছ ভাই।' মোলায়েম স্বরে উত্তর এল— এর আগে আমার 'ঝুলস্য ঝুল' কবিতাগুলোকে কেউ এভাবে মুখের ওপর 'ঝুলস্য ঝুল' বলতে পারেনি। তুমি পেরেছ। থ্যাঙ্কস টু ইউ।'

মনে মনে আর-একবার জিভ কাটে মন্দার—'আমি কি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি? জাস্ট একবার 'সরি' বলার জন্য।'

—'সরি বলার জন্য এসো না। বরং এক কাপ চা খেতে আসতেই পারো।'

—'তাহলে কবে আসব? আজ কি আপনার সময় হবে...?'

—'নিশ্চয়ই।' এককথায় রাজি হয়ে গেলেন গহন—'এখনই চলে এসো। আমিও দেখি 'রামহনু' কীদৃশ জীব!'

মন্দারও এবার হাসল।'—'ইয়ে...আর একটা রিকোয়েস্ট ছিল।'

—'বলো।'

boierpathshala.blogspot.com

—'আপনার ডিডাকশনটা একদম ঠিক। 'কুবলাশ্ব' কোনো ব্যাটা নয়, বেটিই। আর... মানে...।' সে একটু লজ্জিত ভাবে বলে...'আমরা দিন পনেরো আগেই বিয়ে করে ফেলেছি। তাই যদি অনুমতি দেন তবে ওকেও...।'

—'কুবলাশ্ব আর রামহনু!' এবার অট্টহাসির শব্দ—'চমৎকার জুটি। সস্ত্রীক চলে এসো। চায়ের নেমন্তন্ন রইল।'

ফোনটা কেটেই ঊর্মির নম্বর ডায়াল করে মন্দার। ঊর্মি তখন খুব মন দিয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ পরছিল। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠতেই চমকে উঠেছে। ফলস্বরূপ টিপটা ধেবড়ে গেল।

হাতের শাঁখা-পলা, সোনার চুড়ি ঝনঝনিয়ে ফোনটা ধরল সে—'বলো।'

—'তুমি এখনই তৈরি হয়ে নাও।' ও-প্রান্তে মন্দার উত্তেজিত—'আমি দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি আসছি। তারপর তোমায় নিয়ে একজনের বাড়ি যাব।'

—'কার বাড়ি?'

—'এখন অত এক্সপ্লেইন করার সময় নেই। তাড়াতাড়ি রেডি হও। যেতে যেতে সব বলব। এখন সব কথা বলার সময় নেই সোনা।' মন্দার ফোন রাখার আগে ফোনেই একটা চুমু ছুড়ে দেয়—'ভালোবাসি।'

ঊর্মি লাজুক হয়ে বলে—'আমিও।'

'গহন দত্তগুপ্তের নতুন বই 'একা মেঘ' ও 'বারিশকর' সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। কবির স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। অন্তত সেক্ষেত্রে তাঁকে কবি হিসাবে লোকে মনে রাখত!'

—দৈনিক খবর

'একা মেঘ' ও 'বারিশকর' বইটি পড়ে অবাক হলাম। কবি গহন দত্তগুপ্ত প্রায় পাঁচ বছরের স্বেচ্ছা-অবসর ভেঙে এই জাতীয় কবিতা লিখতে কেন ফিরে এলেন বুঝলাম না! তাঁর কবিতায় চিরকালই অদ্ভুত এক বিমূর্ত রোমান্টিসিজম থাকত। কিন্তু 'একা মেঘ' ও 'বারিশকরের' প্রত্যেকটি কবিতাই যেন ঝান্ডা তুলে চলেছে! কবি কি সম্প্রতি কোনো রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন?

—ভোরের কাগজ

''একা মেঘ' ও 'বারিশকরের' প্রতিটি কবিতাই প্রায় আখ্যানধর্মী। গহন দত্তগুপ্ত-র কলমে যেমন আতুর, নরম শব্দ গুচ্ছ পাওয়া যায়, এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কবিতাগুলিকে কবিতার চেয়ে স্লোগান বলেই বেশি মনে হয়।'

—তাজা সংবাদ

''একা মেঘ' 'বারিশকর' কাব্যগ্রন্থের কোনো কবিতাতেই গহন দত্তগুপ্ত তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করেননি। বরং কবিতার রহস্যময়তার সর্বনাশ করেছেন।

—পাক্ষিক কুরুক্ষেত্র

আজও বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। এই কয়েক মাসে বৃষ্টির চেহারায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু প্রথমদিকে বেশ ছিপছিপে তরুণীর মতো সুললিত পায়ে আসত। টুপুর-টাপুর

boierpathshala.blogspot.com

শব্দে সলজ্জ ভঙ্গিতে ঝরে পড়ত। আর এখন যেন ঘুসি পাকিয়ে পালোয়ানের মতো হুড়মুড়-দুড়দাড় করতে করতে আসে।

কণার বিছানার পাশের জানলা আজও খোলা ছিল। কিন্তু তিনি আজ বৃষ্টি দেখছেন না। বরং মেজাজটা বেশ বিগড়ে আছে। মুখ থমথমে। একপাশে খবরের কাগজ ও পত্রিকাগুলো অযত্নে পড়ে। এইমাত্রই ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।

—'কী হল?' গহন নম্রপায়ে এসে বসলেন বিছানার ওপরে। কণার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন—'গোটা আকাশটাকেই নিজের মুখে টেনে এনেছ যে!'

কণা উত্তর দিলেন না। রাগের আঁচ তাঁর মুখে। নাকের পাটা ফুলছে। গহন কাগজপত্রগুলো সযত্নে গুছোতে শুরু করেছেন দেখে রাগত স্বরে বললেন—'ওগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দাও!' তাঁর গলায় বিরক্তি ফুটে ওঠে— 'এই সমালোচকগুলো নিজেদের কি ভগবান ভাবে! যা খুশি তাই বলবে! কবিতার কী বোঝে ওরা?'

গহনের মুখে স্মিত হাসি—'অন্যায় কী বলেছে?'

—'তোমার কবিতাকে স্লোগান বলে গাল দিয়েছে!' কণা অবাক—'আর তুমি হাসছ?'

—'শুধু স্লোগানই তো বলেছে।' তিনি হাসতে হাসতেই বললেন—''ঝুলস্য ঝুল' বলেনি। কবিতার ভয়ংকর প্যারোডিও বানায়নি।'

কণা রাগতে গিয়েও পারলেন না। বরং উলটে তাঁর মুখেও হাসির রেখা ভেসে ওঠে।

—'ওই দুটো বদমাশ আজ আমাদের বাড়ি আসছে।' গহন বলেন—'কুবলাশ্ব আর রামহনু। ওদের জন্য তোমার স্পেশাল পকোড়া বানিয়ে দেবে প্লিজ?'

—'কথা ঘুরিয়ো না।' কণা তীব্রদৃষ্টিতে মাপছেন কবিবরকে—'এতদিন ধরে কবিতা লিখে এলে। এতদিন ধরে জেনে এলাম তুমি কবিতা লেখো। আর ওই লোকগুলো তোমার লেখাকে স্লোগান বলছে...।'

—'বেশ করেছে।' কবি শান্ত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালেন—'হয়তো সত্যিই আমি স্লোগান লিখেছি। অথবা লিখিনি। এতদিন ধরে কবিতা লিখে এলাম। এবার না হয় স্লোগানই লিখি।' তাঁর চোখজুড়ে স্বপ্ন পাখা মেলে দিয়েছে, নতুন কোনো স্বপ্ন—'স্লোগান লিখতে লিখতে একদিন স্লোগানকেই গান করে দেব, কবিতা করে দেব। দেখো কণা, আমি আরও লিখব। স্লোগানই একদিন কবিতা হবে। শুধু লিখেই যাব...যতদিন না এই লোকগুলোই 'সাধু সাধু' করে উঠবে। দেখো...আমি পারব...আমি লিখব...আরও লিখব...।'

বলতে বলতেই হো হো করে হেসে উঠেছেন তিনি। কণার দিকে তাকিয়ে বললেন —'এ তোমার কবিবরের নতুন লড়াই!'

কণা গর্বমাখা দৃষ্টি ছুড়ে দিলেন স্বামীর দিকে। গহন তখন বেডরুম থেকে বেরিয়ে হলঘরে যাচ্ছিলেন। চোখে পড়ল গোপাল হলঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দু-হাতে বৃষ্টির জল ধরছে। তার চোখেমুখে উপচে পড়ছে কৈশোরের আনন্দ।

গহন তার পাশে এসে হাঁটুগেড়ে বসলেন। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন— 'ভিজবি গোপাল?'

কণার ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বৃষ্টিতে ভিজছেন গহন! যে মানুষটা কিছুদিন

boierpathshala.blogspot.com

আগেও বৃষ্টিকে ঘৃণা করত সেই মানুষটাই আজ জলে ভিজছে! কবি ভিজে ঘাস পায়ে মাড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো ছুটোছুটি করছেন গোপালের পিছন পিছন। দু-হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরছেন। তাঁর মুখ, মাথা, চিবুক চুঁইয়ে হাজার হাজার জলবিন্দু ঝাঁপিয়ে পড়ছে পরম আনন্দে।

‘আরো বেদনা আরো বেদনা,
প্রভু, দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান।।
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে...।’

ঠিক তখনই বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকছিল মন্দার আর ঊর্মি। তারাও দেখল কবি ভিজছেন....! কবি ভিজছেন!...কবি ভিজছেন...’!

—

boierpathshala.blogspot.com

ছদ্মবেশী ফুল

১

হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ল্যাবের অ্যালার্ম বেজে উঠল!

এতক্ষণ ল্যাবরেটরির ভিতরে কোনো আওয়াজ ছিল না। অন্যদিনও বিশেষ থাকে না। শুধু মাঝেমধ্যে টেস্টটিউবের টুংটাং আর বিকারে জল গরম করার খলবল শব্দ অস্ফুট ভাবে শোনা যায়। ভিতরের মানুষগুলো ক্বচিৎ কদাচিৎ কথা বলে। তাদের কথা বলার সময় কোথায়? সবাই সাদা অ্যাপ্রন পরে কাজ করতেই ব্যস্ত!

আজ সকালেও এমন শান্ত পরিবেশ ছিল। ল্যাবের মুখ্য বিজ্ঞানী ডঃ হিঙ্গোরানি একটি গোপন আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত আছেন! ঐ ঘরে সবার প্রবেশ নিষিদ্ধ। একমাত্র ডঃ হিঙ্গোরানিই প্রাইভেট পাসওয়ার্ড দিয়ে ও ঘর খুলতে পারেন। ব্যাপারটার সাথে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলেই এত কড়াকড়ি! এত গোপনীয়তা! নতুন আবিষ্কারটা নিয়ে একাই দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি আমাকেও সাহায্য করতে দেননি।

আজও প্রায় সকাল আটটায় এসে সোজা ঢুকে গেছেন নিজের ল্যাবে। আর তাঁর প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডঃ অনুপম সেন, তথা আমি আমার নিজস্ব কেবিনে বসে কয়েকটা প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করছি।

এমন সময়ই অ্যালার্মের পরিত্রাহি চিৎকার! ক্যাঁও...ক্যাঁও করে সমস্ত ল্যাবরেটরিকে চকিত করে তারস্বরে বেজে উঠল!

উপস্থিত সবাই চমকে ওঠে! অ্যালার্ম বাজছে কেন? আওয়াজটা সবচেয়ে বেশি জোরে আসছে ডঃ হিঙ্গোরানির ল্যাব থেকে!

বুকের ভিতরটা প্রায় লাফিয়ে উঠল! কী হল? ডঃ হিঙ্গোরানির কিছু হল না তো! নতুন আবিষ্কারটা ঠিক আছে.....?

তখন কিছু বলার বা ভাবার মতো অবস্থা ছিল না। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে ডঃ হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাবের দিকে! আমার সহযোগী গৌতম উল্টোদিক থেকে পড়িমড়ি করে ছুটে এল। বেচারা অ্যালার্মের শব্দে ঘাবড়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কোনোমতে বলে, 'স্যার...! কি হল? অ্যালার্ম বাজছে...!'

কোনোমতে উত্তর দিই, 'জানি না।'

'ডঃ হিঙ্গোরানি...' সে ভয়ার্ত ভাবে বলে, 'ওনার ঘরেই তো অ্যালার্ম বাজছে মনে হয়...'

প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, চলো শিগগিরি...দেখি কি হল...'

অন্যান্য দিন ডক্টরের প্রাইভেট ল্যাবের লোহার দরজা পাসওয়ার্ড সিস্টেমে বন্ধ থাকে! আজও তেমনই থাকার কথা। কিন্তু দরজায় হাত রেখেই এক নতুন ট্রেনি গবেষকের ভুরু কুঁচকে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

‘ডঃ সেন...’ সে একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছে। তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়;‘দরজাটা খোলা!’

দরজা খোলা! ভাবাই যায় না! এই দরজা দিনে দুবারই খোলে। যখন ডঃ হিঙ্গোরানি ল্যাবে ঢোকেন তখন একবার, আর যখন বেরিয়ে যান স্রেফ তখন! এর মধ্যে ল্যাবের দরজা কোনোমতেই খোলা সম্ভব নয়! এ দরজা শুধু পাসওয়ার্ডে খোলে।

আর পাসওয়ার্ড ডক্টর নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না!

কিছু গোলমাল হয়েছে...কী ঘটেছে জানি না...কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা ভীষণ অমঙ্গলের ছায়া সবার মুখেই ছাপ ফেলে সরে সরে যাচ্ছিল।

‘ডঃ সেন...স্যার, আপনি দেখুন।’ গৌতম ফিসফিস করে বলে, ‘আমি সাহস পাচ্ছি না!’

সাহস তো আমিও পাচ্ছিলাম না! দরজাটা খোলা দেখেই ভয়ে ঘামছি। ভিতরে রয়েছেন ডক্টর আর তাঁর গোপনীয় ও অমূল্য আবিষ্কার! ঘরে ঢুকে কি দেখব সেই আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে ছিলাম। তবু...কাউকে তো এগোতেই হবে...!

ভিতরে তখনও ফুলদমে এসি চলছে! চিলড এসির স্পর্শে শরীর ছ্যাঁত করে উঠল। চতুর্দিকে সারসার সাজানো কেমিক্যালের শিশি। কাচের বাক্সে রাখা স্পেসিমেন। কোনটা কেমিক্যালে ডোবানো। কোনটা আবার এমনিই রাখা!

‘ডঃ হিঙ্গোরানি...ড-ক্ট-র...।’

কোনো সাড়া নেই! ল্যাবের ভিতরের টিউবটা শুধু দপদপ করে জ্বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুরোপুরি জ্বলছে না। থেকে থেকে জ্বলছে নিভছে।

আমরা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম ভিতরের দিকে। ডানদিকে আর বাঁদিকে বইয়ের সেলফ। বইগুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে! যেন ওগুলোর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে!

অথচ এমন হওয়ার কথাই নয়। ডক্টর ভীষণ গোছালো প্রকৃতির। বিশেষ করে বইয়ের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ভীষণ খুঁতখুঁতে। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির একটু অযত্ন হলেই আমায় পাঁচ কথা শুনিয়ে ছাড়েন। কোনো বইয়ের পাতা সামান্য ছেঁড়া দেখলেই সারা অফিস মাথায় তোলেন।

সেই লোকের ঘরে বইয়ের এই অবস্থা!

‘ডক্টর.....ডক্টর হিঙ্গোরানি...স্যা—র...!’

‘অ-নু-প-ম!’

এবার উত্তর এল। কিন্তু একদম অস্বাভাবিক উত্তর! ডক্টরের কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। আরেকটু এগিয়ে যেতেই যা চোখে পড়ল তা দেখে আঁতকে উঠি.....

ডক্টর প্রায় বেহুঁশের মতন পড়ে আছেন মাটিতে। মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে।...

‘স্যার...স্যার...।’

ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ধরে কোনোমতে তোলার চেষ্টা করি। ডক্টর নির্জীবের মতো আমার বুকের উপর এলিয়ে পড়লেন। প্রায় সর্বহারার মতো আঙুল তুলে সামনের কাচের বাক্সটা

boierpathshala.blogspot.com

নির্দেশ করলেন, 'ঐ দ্যাখো!'

কী সর্বনাশ! বাক্সটা ফাঁকা! সেখানে ক্যামোফ্লেজিয়া নেই!

২

'ক্যামোফ্লেজিয়া মিসিং? হাউ ক্যান ইটস পসিবল?'

মন্ত্রীর ভুরু দুটো ঠিক শুঁয়োপোকার মতন দেখাচ্ছিল! মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট।

'আমি জানি না।' ক্লান্ত স্বরে বলছিলেন ডঃ হিঙ্গোরানি। মাথায় তিনটে স্টিচ নিয়ে তাঁকে আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ব্যান্ডেজ করা কপালে হাত রেখে চুপ করে বসেছিলেন।

'কীভাবে এরকম হয়? এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার!' রেগে গিয়ে বললেন মন্ত্রী, 'আপনাদের সুরক্ষাপ্রণালীই কাঁচা! এবার আমি উপরমহলকে কী জবাব দেব?'

অনেক যুক্তি দিয়েও কিছুতেই তাঁকে বোঝানো গেল না যে ক্যামোফ্লেজিয়াকে যথেষ্ট কড়া নজরেই রাখা হয়েছিল। ডঃ হিঙ্গোরানির সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় নিশ্ছিদ্রই বলা যায়। তা সত্ত্বেও দুষ্কৃতী কোথা দিয়ে ঢুকল তা বুঝতে পারছি না কেউই!

'এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার!' তিনি আরও চটে গিয়ে বলেন, 'ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কয়েক কোটি টাকা ঢেলেছে এটার পিছনে। ডঃ হিঙ্গোরানি, আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।'

'হ্যাং ইওর কয়েক কোটি টাকা!' এবার ডক্টরের ধৈর্যও জবাব দিয়েছে,'আপনি কয়েক কোটি টাকা দেখছেন? কয়েক কোটি মানুষের কথা ভাবছেন না? ওটা কোনো সাধারণ জিনিস নয়। দ্যাট ইজ আ মার্ডার ওয়েপন। আ ভেরি ডেঞ্জারাস ব্লাডি মার্ডার ওয়েপন... এত কোটির দেশে সেটা একবার বাইরে পড়লে কেউ বাঁচবে না। নট আ সিঙ্গল ওয়ান.....বুঝেছেন?'

মন্ত্রী কটমট করে ডক্টরের দিকে তাকাচ্ছেন, 'জানি। তাই তদন্ত দরকার। এভাবে ওটাকে বাইরে ছেড়ে দিতে পারি না আমরা। এ চোর জানে যে জিনিসটা কোথায় রাখা ছিল। আপনার পাসওয়ার্ড ভেঙে সে ঘরে ঢুকেছে, অথচ এখানকার কোনো স্টাফ, সিকিউরিটি গার্ড কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেননি।'

সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ল।

'তাহলে সে কোনো বাইরের কেউ নয়। ঘরেরই লোক। এই ল্যাবেরই কোনো কর্মী।' মন্ত্রীজি আমাদের সবার দিকে রক্তচক্ষু করে তাকালেন, 'আপনারই কোনো লোক!'

একেই অমন মারাত্মক জিনিসটা চুরি যাওয়ার আতঙ্ক তো ছিলই। তার উপর আবার নতুন আপদ জুটল! সন্দেহ!

ক্যামোফ্লেজিয়া জিনিসটা বারদুয়েক স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। একটা সামান্য ঘাসফুলের মতো দেখতে জিনিসটাকে। কেউ দেখলে ভাববেই না যে জিনিসটা অমন মারাত্মক!

ঘাসফুলের একটি প্রজাতির জেনেটিক কোড ব্রেক করে বিশেষ ভাবে ডি এন এ তৈরি করার পর ক্যামোফ্লেজিয়া জন্মেছে। মূল ফর্মুলাটা গুপ্ত। ডঃ বিবেক টোডি, ডঃ হিঙ্গোরানি ও ডঃ সুকুমার বসু ছাড়া আর কেউ জানে না। জিনিসটা তৈরি হওয়ার পর একঝলক

boierpathshala.blogspot.com

দেখেছিলাম। সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা ফুল। ঘাসফুলই বলা যায়। কিন্তু তিন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন যে, যতই নিরীহ হোক না কেন—এ ফুল মারাত্মক। এ ফুলের গন্ধ এতটাই বিষাক্ত যে একটা ফুলই দশটা মানুষ মারার পক্ষে যথেষ্ট। অ্যাকোনিটামের বিষাক্ত ডি এন এ-র সাথে মিলিয়ে যেহেতু তৈরি তাই এর গন্ধে অ্যাকোনাইটের মতো মারাত্মক বিষ আছে! একবার নাকে গেলে রক্ষা নেই। কোমা অবধারিত! এবং পরে মৃত্যু।

ক্যামোফ্লেজিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক বৈশিষ্ট্য যে এটি রং পাল্টাতে পারে! এটা কী করে করলেন তিন বৈজ্ঞানিক তা জানা যায়নি। কিন্তু ক্যামোফ্লেজিয়ার ডেমোনস্ট্রেশনের সময়েই দেখেছি যে এই ফুলটা অদ্ভুতভাবে রং পাল্টায়!

প্রথমবার যখন দেখি তখনই প্রায় চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল! ভাবতেই পারিনি যে এমনও হতে পারে! ডেমোনস্ট্রেশনের আগেই কনফারেন্স হলে উপস্থিত ছয় দর্শককে গ্যাস মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল,যাতে নাকে গন্ধ না যায়! সেই ছ'জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। বাকি পাঁচজন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির হোমরাচোমরা।

দর্শকাসনে বসেই বিস্ফারিত চোখে দেখলাম ডঃ হিঙ্গোরানি একটা গিনিপিগের বাক্সে ক্যামোফ্লেজিয়া রেখে দিলেন! এক মিনিটও লাগল না! গিনিপিগগুলো পটাপট মরে গেল!

শুধু এইটুকুই নয়, ডক্টর ফুলটা হাতে তুলে নিয়ে তার পেছনে একের পর এক রঙের জিনিস রাখতে লাগলেন। কখনও ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো, কখনও নীল, কখনও লাল!

আমরা বোকার মতো হাঁ করে দেখলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে রং পাল্টাচ্ছে ক্যামোফ্লেজিয়া! একদম মিশে যাচ্ছে পেছনের জিনিসটার সাথে!

এ এক অদ্ভুত অস্ত্র। একরাশ যে-কোনো ফুল, গাছ বা অন্যকিছুর মধ্যে একটা রেখে দিলে সেটাকে কেউ আলাদা করে চিনতেই পারবে না। রং পালটিয়ে সে মিশে যাবে পিছনের বস্তুটির সাথে। এবং সেখান থেকেই বিষ মাখা সুগন্ধ দিয়ে যাবে এই অদৃশ্য ফুল। তার সামনে বসে থাকা হতভাগা জীবটি বুঝতেও পারবে না যে কখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ছদ্মবেশী শমন! বোঝার আগেই শেষ!

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল ডক্টরকে। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম! ভেবেছিলাম, এইরকম ভয়ংকর অথচ নিরীহ চেহারার মারণাস্ত্র তৈরি করে কী সর্বনাশই না করলেন ডক্টর! কত নিরীহ মানুষের প্রাণ নেবে এই সাধারণ চেহারার ছদ্মবেশী ফুল, ক্যামোফ্লেজে সিদ্ধহস্ত—ক্যামোফ্লেজিয়া!

কিন্তু ডিফেন্স মিনিস্ট্রির কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার আগেই লোপাট হয়ে গেল ক্যামোফ্লেজিয়া। সঙ্গে সঙ্গেই গোপনে চলল কড়া তদন্ত। আমাদের সবার বাড়ি তোলপাড় করে সার্চ করা হল। কিন্তু কারুর বিরুদ্ধেই কিছু পাওয়া গেল না।

তখন অন্য রাস্তা ধরল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিটা দূতাবাসে খোঁজ রাখল, সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের ফলো করল। সেখানেও কিছুই পাওয়া গেল না। শুধু একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হল তারা। ক্যামোফ্লেজিয়া যে চুরি করেছে, সে সেটা অন্য কোনো দেশকে বিক্রি করার জন্য চুরি করেনি। হয়তো তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।

কিন্তু কী?

boierpathshala.blogspot.com

উদ্দেশ্যটা বুঝতে অবশ্য এক সপ্তাহও সময় লাগল না!

প্রথমেই মারাত্মক কার্ডিয়াক অ্যাটাকে মারা গেলেন ডঃ বিবেক টোডি!

তখনও ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বয়েসও হয়েছিল। তার উপর ডাক্তারদের বারবার বারণ করা সত্ত্বেও অ্যালকোহলের নেশাকে অতিক্রম করতে পারছিলেন না। তাই তাঁর মৃত্যুটা খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়। দুঃসংবাদটা শুনে আঘাত পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু বিস্মিত হইনি।

কিন্তু ডঃ সুকুমার বসুও যখন হঠাৎ একদিন তাঁর বাড়িতেই পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তখন ব্যাপারটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ডঃ বসুকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে ডাক্তাররা বলল যে তিনি কোমায় আছেন। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া এবং সঙ্গে ভয়ানক ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিদমিয়াস!

এই সবগুলো লক্ষণ শুনেই বুকের ভিতরটা কেমন কেমন করতে লাগল। এর সবক'টাই অ্যাকোনিটামের লক্ষণ! মন বলতে লাগল, এ ঠিক সমাপতন নয়! এর পিছনে গুরুতর কোনো চক্রান্ত আছে। ক্যামোফ্লেজিয়ায় অ্যাকোনিটামের পার্সেন্টেজ যথেষ্ট!

প্রথম মৃত্যুটাকেও তখন আর স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না আমাদের। ডঃ বিবেক টোডি ও ডঃ বসু; দুজনেই এমন মারাত্মকভাবে হৃদযন্ত্রের অসুখে আক্রান্ত হলেন! তাও মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে! কী করে হতে পারে? এ কি নিতান্তই কাকতালীয়? না অন্য কিছু? দুজনেই ক্যামোফ্লেজিয়ার আবিষ্কারে যুক্ত ছিলেন। এই দুজন আর ডঃ হিঙ্গোরানি; এই তিনজনই তার জন্মদাতা। মূল ফর্মুলাটা এঁরাই জানেন। তারপর আর কেউ যদি সামান্য কিছুও জেনে থাকে, সে আমি! প্রথম তিনজনকে সরিয়ে দিতে পারলে এই মারাত্মক অস্ত্রটি দ্বিতীয়বার আর আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সেক্ষেত্রে যে চুরি করেছে, তার কাছে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না ক্যামোফ্লেজিয়ার নমুনা! সমস্ত বৈদেশিক শক্তি, তার সাথে ভারতও টাকার থলে নিয়ে তার পেছনে অসহায়ের মতো ছুটবে।

বেশ বুঝতে পারছি যে এ আমাদের মধ্যেই কারুর কীর্তি। কিন্তু কে? কে হতে পারে? এখানে প্রথম তিনজনের পরই আমার স্থান। আমি নই। তবে? গৌতম...?

কয়েকদিন গৌতমকে খুব চোখে চোখে রাখলাম। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। সে স্বাভাবিক ভাবেই কাজ করছে। এবং যতদূর জানি এতবড় দুঃসাহসিক কাজ করার সাধ্যও তার নেই। সত্যি বলতে, এ অফিসের কারুর আদৌ আছে কিনা সন্দেহ!

তবু কেন জানি না কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। যাকেই দেখছি, মনে হচ্ছে, এই সে নয় তো!

থাকতে না পেরে একদিন ডঃ হিঙ্গোরানিকে কথাটা বলেই ফেললাম। মনে হচ্ছিল স্যারকে সতর্ক করাটা সত্যিই দরকার।

ডঃ হিঙ্গোরানির টেবিলের উপর একটা ফুলের বোকে রাখা ছিল। সম্ভবত গোলাপ ফুলের। তিনি আমায় একটা গ্যাস মাস্ক এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'পরে নাও অনুপম, গোলাপের গন্ধে তো তোমার আবার মারাত্মক অ্যালার্জি হয়। এইমুহূর্তে তুমিই আমার ডানহাত। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মুশকিল।'

গোলাপের গন্ধে সত্যিই আমার ভয়াবহ অ্যালার্জি। তাই বিনাবাক্যব্যয়ে গ্যাস মাস্ক পরে নিই।

boierpathshala.blogspot.com

'হ্যাঁ, বলো কী বলছিলে?'

নিজের থিওরি ও সন্দেহের কথা স্পষ্ট করেই বললাম। শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেমে থেকে বললেন, 'তোমার সন্দেহ সঠিক কিনা জানি না। ডঃ বসু এখনও কোমায়। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রেই অ্যাসফিক্সিয়া বা অক্সিজেন ডেফিশিয়েনসির লক্ষণ দেখা গেছে। তোমার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'সেক্ষেত্রে স্যার, আপনার সাবধান হওয়া উচিত।'

তিনি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান, 'শুধু আমারই নয়, তোমারও সাবধানে থাকা উচিত অনুপম।'

'আমি!' অবাক হয়ে বলি, 'কিন্তু আমি তো খুব অল্পই জানি এ সম্বন্ধে!'

'সে তো তুমি আর আমি জানি।' ডক্টর শান্তভাবেই বললেন, 'কিন্তু যার মাথায় একাই ঐ আবিষ্কারের পেটেন্ট নেওয়ার দুর্বুদ্ধি ঘুরছে সে তো জানে না, তুমি আমার মেইন অ্যাসিস্ট্যান্ট। ডানহাত যাকে বলে। আমার পরে তোমারই তো সব জানার কথা। পুরোটা না জানলেও অল্পবিস্তর তো জানোই। তোমায় ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি কি সে নেবে?'

এ কথাটা আগে মাথায় আসেনি। ডঃ হিঙ্গোরানি বলার পর মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সত্যিই তো!

'এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না অনুপম।' তিনি সহজ ভাবেই বলেন, 'এটা স্রেফ একটা কো-ইনসিডেন্স, আই হোপ।'

আই হোপ; শব্দটার মধ্যে তেমন জোর পাওয়া গেল না!

উনি যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন, আমি কিন্তু তা পারলাম না।

ওঁর বলা শেষ কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। সত্যিই তো! আমাকেও কি ছাড়বে ঐ অজানা আততায়ী? ডঃ টোডি, ডঃ বসু ও ডঃ হিঙ্গোরানির পর তো আমিই একমাত্র মানুষ যে ক্যামোফ্লেজিয়া সম্পর্কে সামান্য হলেও খবর রাখে। অন্তত ক্যামোফ্লেজিয়াটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি সেটা কীভাবে কাজ করে। তার সাথে এও জানি যে জিনিসটার এফেক্ট মানব শরীরে কী হয়, সিম্পটমগুলো ও মিক্সড ভেনামের নামটাও জানি।

গাড়িতে যেতে যেতেই বারবার কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছিল। বাড়িতে পৌঁছেও দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে গেল না।

আমার বাড়িটা বেশ বাংলোবাড়ির মতো করে সাজিয়েছি। ছোট্ট সুন্দর লাল টালি বসানো দোতলা বাড়ি। লাল টালিগুলো আমারই পছন্দ করে কেনা। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। মালির যত্নে বেশ ঝকঝকে চকচকে হয়ে উঠেছে। বোগেনভিলিয়ার ঝাড়ে, নানান বিদেশি ফুল, লতায়, মশে রঙিন হয়ে উঠেছে! ভেলভেটের মতো ঘাসের সবুজ রঙে পান্নার ঔজ্জ্বল্য! দু-দিকে দুটো ঝাউগাছ মালির যত্নে একদম নিখুঁত আকারে রাজার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রোজ বাড়িতে ঢোকার সময়ে এই বাগানটার দিকে তাকালেই মন ভালো হয়ে যায় আমার। কিন্তু আজ.....

আজ ভয় হল!

boierpathshala.blogspot.com

কে বলতে পারে, এই বাগানেই কেউ একটা ক্যামোফ্লেজিয়া রেখে যায়নি! ডক্টর হিঙ্গোরানির কাছে এও শুনেছি যে এই স্পেসিজটা খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি করে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই সে প্রায় একটা গোটা ব্যাটেলিয়ন তৈরি করে ফেলতে পারে। অসম্ভব শক্তিধর এই আবিষ্কার!

কোনোদিন এত খুঁটিয়ে বাগানটাকে দেখিনি। আজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। নাগকেশরের ঝাড় রীতিমতো ফুলেফেঁপে উঠেছে। পাশে স্পাইনি অ্যাকান্থাস আর ফায়ারস্পাইক ফুটে রয়েছে। ইচ্ছে ছিল অ্যান্থোনিয়ামও রাখব গ্লাসহাউস করে। কিন্তু ফুলগুলো বাঁচেনি।

আমার গোলাপের গন্ধে অ্যালার্জি। তাই গোলাপের কোনো প্রজাতিকেও রাখিনি। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ফুলে, গোলাপি, হলুদে, লালে জমকালো হয়ে উঠেছে আমার বাগান।

আজ ফুলের সৌন্দর্য দেখার মানসিকতা ছিল না। আমার সন্ধানী চোখ আঁতিপাতি করে খুঁজছিল রঙিন ফুলের মধ্যে একটা ছোট্ট বিশেষ ফুলকে। রঙের বিষয়ে সঠিক ভাবে বলা মুশকিল। হয়তো সে পুরোপুরি বেগুনি হয়ে মিশে গেছে ডেজার্ট পিটুনিয়ার ভিড়ে। অথবা গোলাপি হয়ে আইসপ্ল্যান্টের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে বসে আছে। কিচ্ছু বলা যায় না... কিচ্ছু বলা যায় না....! ক্যামোফ্লেজিয়ার পক্ষে সবই সম্ভব!

প্রায় গোরুখোঁজা খুঁজতে খুঁজতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ঘাসের ফাঁকে ছোট ছোট সাদা ফুল!

ঘাসফুল! না....

টের পেলাম হঠাৎ করেই বুকের ভিতরটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। এতগুলো ঘাসফুল কবে আমার বাগানে ফুটল? আগেই ফুটেছিল? না এখন.....? আজকেই...?

'প্রতাপ...প্র-তা-প!'

নিজের কণ্ঠস্বরকেই আর তখন চিনতে পারছি না। গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। তাই চেঁচিয়ে ডাকতে গিয়ে নিজের কানেই নিজের গলা ভীষণ কর্কশ শোনাল!

আমার তারস্বরে চিৎকার শুনে প্রতাপ প্রায় দৌড়তে দৌড়তে আসে। আমায় এইভাবে চেঁচাতে ও আগে কখনও দেখেনি। রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েই সে ছুটে এসেছে।

'স্যার,...' সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। এত ফুলের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তার স্যার কেন অমন আর্তনাদ করছেন তা বোধহয় বুঝে উঠতে পারেনি।

'এগুলো কী?' আমি তখন ঘামছি। কোনোমতে আঙুল তুলে ছোট ছোট সাদা ফুলগুলোকে দেখাই।

সে অবাক, 'ঘাসফুল স্যার!'

'ঘাসফুল!' কী করব ঠিক করতে না পেরে ওর উপরই রেগে যাই, 'এ বাগানে ঘাসফুল কেন?'

'স্যার...' প্রতাপ থতোমতো খেয়ে কিছু বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়েছি, 'এখুনি কেটে ফেলো। এক্ষুনি...ইমিডিয়েটলি...এখানে আর একটাও ঘাসফুল দেখতে চাই না আমি।'

ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে মাথা নাড়ল।

boierpathshala.blogspot.com

'আর...হ্যাঁ...ওগুলো ছেঁটে ফেলার আগে মুখে মাস্ক পরে নেবে। নাকে যেন গন্ধ না যায়। বুঝেছ?'

আমি আর ওখানে দাঁড়াই না। মোরাম বিছানো পথ দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, প্রতাপ কিছুক্ষণের জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এককোণের স্টোররুম থেকে কাটারি নিয়ে এল। আমার কথা অবজ্ঞা করেনি। গামছা দিয়ে নাক-মুখ পেঁচিয়ে বেঁধেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। প্রতাপ কী ভাবল কে জানে। হয়তো ভাবল স্যারের মাথায় ছিট! যাই ভাবুক। ঐ ফুলগুলো তো আর ওখানে থাকবে না!

ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ! সবসময় বন্ধ থাকলে যা হয় আর কী! সকালে চাউমিন খেয়ে বেরিয়েছিলাম। তার সসের গন্ধ এখনও নাকে ঝাপ্টা মারছে।

ভীষণ বিরক্ত লাগল। আমার কাজের লোক, মদন, এক নম্বরের ফাঁকিবাজ! আমিও বেরিয়েছি, অমনি সেও জানলা-দরজা বন্ধ করে পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছে। দিনভর খালি এখানে-ওখানে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য আমার ফেরার আগেই সচরাচর ফিরে আসে।

আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। ফলস্বরূপ মদনের দেখা নেই!

অগত্যা আপনা হাত-জগন্নাথ! প্রথমেই জানলাগুলো সব খুলে দিলাম। তাকের উপর রুমফ্রেশনারটা ছিল। স্প্রে করতে গিয়ে দেখি ফসফস আওয়াজ হচ্ছে! ওটা শেষ!

এমন সময়ই শেষ হতে হল! বাধ্য হয়েই আমার দামি পারফিউমটা স্প্রে করে দিলাম। অন্তত এই অসহ্য ভ্যাপসা গন্ধটা তো যাবে! মনে মনে তখন মদনের পূর্বপুরুষের শ্রাদ্ধ করে চলেছি। আশ্চর্য! রুমফ্রেশনারটা যে শেষ হয়ে গেছে, সেটাও তার খেয়াল নেই। নতুন কিনে আনা তো দূর! এত টাকা দিয়ে ওকে রেখেছি কেন আমি? পরের বাড়ির ঝিয়ের সাথে গল্পগুজব করার জন্য?

মনে মনে গরম হয়ে উঠি। একবার ফিরুক হতভাগা; তারপর ওর হচ্ছে!

ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি কোনোমতে গায়ে দু-মগ জল ঢেলে এলাম। শরীর আর মাথা তো ঠান্ডা হল। কিন্তু পেটের ভিতরে ইঁদুরের রেস চলছে! মদন কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। তাই নিজের হাত পুড়িয়েই কিছু বানিয়ে নিতে হবে। ফ্রিজে হয়তো এক-দু-টুকরো ব্রেড এখনও আছে। তার সাথে ডিমের একটা ওমলেট আর চা যথেষ্ট!

রান্নাঘরে ঢুকে বুঝলাম যে কাজটা যতটা সহজ মনে হচ্ছিল, ঠিক ততটা নয়। ফ্রিজ থেকে পাঁউরুটি আর ডিম উদ্ধার করা গেলেও চায়ের পাতা, চিনি কোথায় রাখা থাকে কিছুই জানি না! তাকের উপর সারিসারি শিশি। তার কোনটায় চিনি, কোনটায় নুন, কোনটায় কি, সেসব সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। নিজের কিচেনের চেয়ে বরং ল্যাবরেটরিটা আমার কাছে অনেক বেশি চেনা!

প্রায় অসহায়ের মতোই তন্ন তন্ন করে খুঁজছি সব উপকরণ। খুঁজতে খুঁজতেই রান্নাঘরের ঠিক জানলাটার সামনে এলাম।

ঠিক তখনই.....

...একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ নাকে এল!

boierpathshala.blogspot.com

অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ!...এমন গন্ধ তো আগে কখনও পাইনি! কেমন যেন নেশা ধরানো সুবাস...।

আমার ইন্দ্রিয়গুলো সব সতর্ক হয়ে উঠল। এটা কীসের গন্ধ?...রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া আসছে। তার সাথে সাথেই গন্ধটা ঝাপ্টা মেরে ঢুকে পড়ছে। খুব তীব্র নয়...কিন্তু...

ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কেমন তা জানি না। ডেমোনস্ট্রেশনের সময়ে নাকে মাস্ক পরেছিলাম। কিন্তু শুনেছি গন্ধটা মিষ্টি।...

গন্ধটা কি এইরকম?...কীসের গন্ধ এটা...?...ক্যামোফ্লেজিয়া...?

'প্রতাপ...প্র— তা— প!'

প্রায় মৃত্যুভয়েই আর্তচিৎকার করে উঠেছি। বুকের ভিতরটা কেমন কেমন করছে। একটা বিরাট টারবাইনের মতো ধপ ধপ করে চলছে! ভীষণ রকমের আকুলিবিকুলি! বোধহয় এখনই হার্টফেল করব...আর সময় নেই...সেই মারাত্মক মারণাস্ত্র আজ আমায় শেষ করেই ছাড়বে!

'স্যার...স্যার...'

প্রতাপ বোধহয় ঘাসফুল পরিষ্কার করতেই ব্যস্ত ছিল। চিৎকার শুনে কাটারি হাতেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

'কী হয়েছে স্যার...?'

ভয়ে গলা কাঁপছে। কোনেমতে বললাম, 'ওটা কীসের গন্ধ?'

প্রতাপ জোরে জোরে বেশ কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে গন্ধটা শুঁকল। আমি প্রায় দমবন্ধ করে রেখেছি। কিছুতেই ওই বিষ নিঃশ্বাস নেব না আমি...কিছুতেই না!

'ওঃ...' সে গন্ধটা অনুধাবন করেই হেসে ফেলেছে, 'এটা তো জুঁই ফুলের গন্ধ।'

'জুঁই ফুল!' 'আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি না। কে বলতে পারে, ক্যামোফ্লেজিয়ার ডি এন এ গঠনে হয়তো জুঁই ফুলের অবদানও আছে! হয়তো তার গন্ধটা জুঁইফুলের মতোই!

'জুঁই ফুলের গন্ধ! এখানে জুঁই ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসবে?'

প্রতাপ আমার অবস্থা দেখে অবাক হয়। আস্তে আস্তে বলে, 'আপনার মনে নেই স্যার? আপনিই তো চারাগাছটা নিয়ে এসেছিলেন। বাগানে জায়গা ছিল না বলে রান্নাঘরের পিছনেই লাগিয়েছিলাম আমি...'

'কেটে ফেলো।'

সে বোধহয় আমার কথার মাথামুন্ডু বুঝতে পারল না। কেমন বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বুঝতে পারছে না যে কী করবে।

'একদম গোড়া থেকে কেটে ফেলো।' আমি জোরালো গলায় বলি, 'জুঁই ফুলের গাছ চাই না আমার। একদম উপড়ে ফেল। এই গন্ধ যেন আর আমি না পাই।'

সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

'ঘাসফুলগুলো সব ছেঁটে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ'।

boierpathshala.blogspot.com

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি; 'ঠিক আছে...এটাকেও...'

'ঠিক আছে স্যার।'

প্রতাপের মুখ বিষণ্ণ। বাগানের প্রত্যেকটা ফুল, গাছ তার বড় প্রিয়। বড় যত্নে, প্রায় সন্তানের মতো করেই সে বড় করে তুলেছে প্রত্যেকটা গাছ। আর আজ তাকেই আমি সেগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছি!

মনে হল ওকে কসাই-এর কাজ দিয়েছি। একবার মনে হল ডেকে বারণ করে দিই। পরক্ষণেই মনকে বোঝাই...। ...কেউ বলতে পারে না...কেউ বলতে পারে না...হয়তো এই নিরীহ ফুলের মধ্যেই নিরীহতর মুখ করে বসে আছে ক্যামোফ্লেজিয়া! আমায় শেষ করার মতলবে বিষ সৌরভ ছড়াচ্ছে!

তখনও হাত-পা কাঁপছিল। কোনোমতে আবার বসার ঘরে ফিরে আসি। আজ আর রান্না করার মতো অবস্থা নেই। কোনোমতে শুকনো পাঁউরুটি আর জল খেয়েই চালাতে হবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল একটু ধাতস্থ হয়েছি। আস্তে আস্তে উঠে ল্যাপটপটাকে নিয়ে এলাম। অনেক কাজ পড়ে আছে। ডঃ হিঙ্গোরানির জন্য কিছু প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। ডক্টর কাজে গাফিলতি একদম বরদাস্ত করেন না।

ফ্রিজে নতুন একটা হুইস্কির বোতল ছিল। আমি সচরাচর খুব টেনসড না হলে ড্রিংক করি না। কিন্তু আজ একটা ড্রিংক নিজেই বানিয়ে নিয়েছি। যে অবস্থায় আছি তাতে একটু অ্যালকোহল পেটে না পড়লে কাজ হবে না।

ল্যাপটপে একমনে কাজ করতে করতে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। কখন যে বাইরে ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে তা খেয়াল নেই। হুইস্কির প্রভাবে হোক, বা অন্য যে কোনো কারণে, ক্যামোফ্লেজিয়ার কথা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হুঁশ ফিরল মদনের ডাকে —

'বাবু!'

আগে ভেবেছিলাম ও এলে একচোট বকাবকি করব। কিন্তু এখন সে ইচ্ছেটা আর টের পেলাম না।

'আপনি আজ তাড়াতাড়ি ফিরেচেন!' সে একহাত জিভ কাটে, 'কিচু খাননি নিচ্চই!'

আমি শান্ত গলায় বলি, 'খেয়েছি।'

সে আবার জিভ কাটল। কার উদ্দেশে কে জানে, 'রাত্তরে কী খাবেন বাবু'?

'রুটি কর'। একটু ভেবে জবাব দিই, 'আর ডিম কষা হলেই চলে যাবে।'

'আচ্চা।' ও চলে যাচ্ছিল। আমি পিছন থেকে ডাকি; 'শোন...'

'হ্যাঁ বাবু।'

'রুমফ্রেশনারটা শেষ হয়ে গেছে। দোকান থেকে একটা নিয়ে আসিস'।

'অকে...।'

'অকে'টা 'ওকে'-এর মদনীয় সংস্করণ। আমাকে প্রায়ই 'ওকে' বলতে শোনে। সেখান থেকেই রপ্ত করেছে।

boierpathshala.blogspot.com

মদন চলে গেল রান্নাঘরে। আমি আবার কাজে মন দিলাম। প্রোজেক্ট রিপোর্ট শেষ করতে করতেই রাত দশটা বাজল। তারপর কয়েকটা ই-মেল পাঠালেই আজকের মতো কাজ শেষ!

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটার ঘণ্টা পড়ছে। আমি প্রায় ল্যাপটপের মধ্যে মাথা গুঁজে ই-মেল টাইপ করছি, ঠিক তখনই মোবাইল ফোনটা তীব্র স্বরে বেজে উঠল।

একটু বিরক্ত হলাম। কাজের সময়ে ফোন বাজলে ভীষণ বিরক্ত লাগে। এখনও সাতটা ই-মেল পাঠাতে হবে আমায় দেশ-বিদেশের নানা বিজ্ঞানীকে। লম্বা লম্বা বয়ানের চিঠি। সময় লাগবে। তার উপর একটাও স্পেলিং মিস্টেক হওয়া চলবে না। একটা বানান ভুল হলেও ডক্টর আমায় বকাবকি করে আস্ত রাখবেন না। যথাসম্ভব সতর্ক হয়ে কাজ করছি।

এমন সময় কে আবার জ্বালাতে ফোন করল?

প্রথমে ভেবেছিলাম ফোন ধরব না। কিন্তু আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ফোনের ডিসপ্লে-তে জ্বলছে নিভছে—'কলিং গৌতম'!

আমার মনে একটা তীব্র আশঙ্কা উন্মত্তের মতো নাচতে শুরু করল। গৌতম এখন ফোন করছে কেন? সচরাচর সে খুব একটা ফোন করে না। যা কথা হওয়ার তা ল্যাবেই হয়। আজও বেরিয়ে আসার আগে ওকে সমস্ত কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। ডঃ হিঙ্গোরানি ল্যাবে আছেন। আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি বলে ওকে ডিউটিতে থাকতে হয়েছে।

কিন্তু সে ফোন করছে কেন? আবার কী হল?

তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরি—

'হ্যালো।'

ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল গৌতমের ভাঙা ভাঙা উত্তেজিত স্বর, 'স্যার?'

'বলছি, বলো।'

ঠিক হাহাকারের মতো শোনাল তার কথাগুলো—

'ডঃ হিঙ্গোরানি ল্যাবে কাজ করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসম্ভব ব্রিদিং ট্রাবল। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। আমি ওঁকে লাইফকেয়ার নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ইমিডিয়েটলি চলে আসুন।'

আমার ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের নখ অবধি যেন বরফ হয়ে গেল! হাতটা ভীষণ অবশ লাগছে। ফোনটা ঠক করে হাত থেকে পড়ে গেল মেঝেতে!

ব্রিদিং ট্রাবল....না...আবার ক্যামোফ্লেজিয়া!!!

৪

লাইফকেয়ারের আই সি ইউ-তে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন ডঃ হিঙ্গোরানি। ভেন্টিলেশন চলছে। ডাক্তারবাবু প্রথমে ভিতরে কাউকে অ্যালাউ করছিলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতির পর আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

boierpathshala.blogspot.com

ডঃ হিঙ্গোরানির পাশের বেডটাতেই ডঃ সুকুমার বসু শুয়ে আছেন। তিনিও কোমায় আছেন। মুখটা বিবর্ণ। কেউ যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে সমস্ত রং শুষে নিয়েছে। চোখ-দুটো আঠা দিয়ে যেন আটকানো। অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ডঃ বসুর। ভারী কাচের চশমার ফাঁক দিয়ে যখন তাকাতেন, তখন মনে হত একেবারে ভিতর অবধি দেখে নিচ্ছেন....

অথচ এই চোখ-দুটো হয়তো আর কখনও খুলবে না।

আর তাঁর পাশেই ডঃ হিঙ্গোরানি...

অমন দাপুটে মানুষটাকে এত অসহায় আগে আর কখনও মনে হয়নি। কী শীতল নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে আছেন বিছানায়। মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া!

কেন জানি না...যদিও আমি...খুব শক্ত...খুব শক্ত মানুষ...আমি আমার বাবার মৃত্যুতেও কাঁদিনি...কিছুতেই আমার চোখে জল আসে না.....।

কিন্তু আজ কেঁদে ফেললাম! ডঃ হিঙ্গোরানির দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে এল। আর নিজেকে সামলাতে পারি না। কোনোমতে আই সি ইউ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছি।

গৌতম বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। আমার অবস্থা দেখে সে ভুলে গেল যে আমি ওর স্যার। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে।

'স্যার...'

ওইটুকু বলারই অপেক্ষা ছিল। ওর বুকে মাথা রেখে ছোট শিশুর মতো হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ওর চোখেও জল। ডঃ হিঙ্গোরানিকে ভালোবাসে না, এমন লোক বোধহয় নেই। ভীষণ মেজাজি লোক ঠিকই, কিন্তু দয়ামায়া কাকে বলে তা বোধহয় ওঁর কাছ থেকেই শিখতে হয়। কী ছিলাম আমি? কতটুকু ছিলাম? বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন ছিল চোখে। কিন্তু সংস্থান ছিল না। বাবার সামান্য রোজগারে স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। সেইসময় ডঃ হিঙ্গোরানিই আমার হাত ধরেছিলেন। ঈশ্বর সকলের জীবনেই একজন না একজন দেবদূত পাঠান।

আমার সেই দেবদূত এখন আই সি ইউ-তে গভীর কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে!

অথচ আমার কিছু করার নেই! কী অসহায় আমি!

গৌতম বিড়বিড় করে যেন আপনমনেই বলে, 'ফুলের বোকেটার জন্যই এ সর্বনাশ!'

আমি ওর কথাটা ঠিক ধরতে পারি না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে আবার বলল, 'আপনি চলে যাওয়ার প্রায় তিনঘণ্টা পরে একটা ফুলের বোকে এসেছিল স্যার।'

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে অসুবিধে হল না যে গৌতমের সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত কোনদিকে।

'ক্যামোফ্লেজিয়া?'

ও আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

'আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার?' ফিসফিস করে বলল গৌতম, 'পরপর ইনসিডেন্টগুলো দেখুন। সবকটা সিম্পটম দেখুন। যখন আমি ডঃ হিঙ্গোরানির চিৎকার শুনে ছুটে যাই তখন ওঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে উনি

boierpathshala.blogspot.com

কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলেন। নার্সিংহোম শব্দটাও ঠিক মতো বলতে পারছিলেন না। একবার জল খেতে চাইছিলেন, কিন্তু যখন জল দিতে গেলাম তখন জলের দিকে এমন করে তাকালেন যেন জিনিসটা কী বুঝতে পারছেন না! এখানে আসার পর ডক্টর বললেন, মেজর কেস অব অ্যাসিস্টল। কোনো কার্ডিয়াক ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটি ছিল না তখন।'

ও চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। বলাই বাহুল্য যে এই হার্ট অ্যাটাক, সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিদমিয়া, কনফিউশন এবং অ্যাসিস্টল; এগুলো সব অ্যাকোনিটামের লক্ষণ! ক্যামোফ্লেজিয়াই যে সব কিছুর মূলে তা বুঝতে আর বাকি রইল না!

'বোকেটা কে পাঠিয়েছিল জানো?'

'নাঃ।' সে বলে, 'বোকেটার উপর কোনো নাম ছিল কি না মনে নেই। একগুচ্ছ নানা রঙের ফুলের বোকে ছিল শুধু এইটুকু মনে আছে। আর যখন ডঃ হিঙ্গোরানি পড়ে গিয়ে ছটফট করছিলেন তখন তাঁর পাশেই পড়েছিল বোকেটা।'

'ফাইন।' আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়াই, 'চলো গৌতম।'

'কোথায়?'

'অফিসে।' অজান্তেই নিজের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, 'বোকেটা কে পাঠিয়েছে দেখা দরকার। লেটস গো।'

গৌতম প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করলেও পরে রাজি হয়ে গেল। ওর গাড়িতেই ফের আমরা ফিরে গেলাম ল্যাবে। ল্যাবরেটরির একটা চাবি সবসময় আমার সাথেই থাকে। সুতরাং ভেতরে ঢুকতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! পুরো ল্যাবরেটরি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না বোকেটা! সেটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! যে ঘরে ডক্টর পড়েছিলেন সে ঘর থেকে শুরু করে ডাস্টবিন পর্যন্ত আমরা সব খুঁজে, ঘেঁটে দেখলাম। কিন্তু ফুলের তোড়াটা অধরাই থেকে গেল!

অনেকক্ষণ খোঁজার পর যখন আমরা হতক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলাম ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গৌতম রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—

'কেউ সরিয়ে নিয়েছে। আমি শিয়োর বোকেটা এখানেই পড়েছিল...কিন্তু কেউ...'

'কে?'

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কী যেন ভাবছে। একটু সময় নিয়ে আবার বলল—

'একটা কথা মনে হচ্ছিল স্যার।'

আমি ল্যাবরেটরির টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল খেতে খেতে বলি,'কি?'

'ডঃ টোডি, ডঃ বসু ও ডঃ হিঙ্গোরানির মতো লোক এতবড় একটা কাঁচা কাজ করলেন কী করে?'

'মানে?'

'মানে কোনো অ্যান্টিডোটের বন্দোবস্ত না করেই ক্যামোফ্লেজিয়ার মতো বিষধর জিনিস আবিষ্কার করবেন, এত বড় মূর্খ কি তাঁরা ছিলেন?'

boierpathshala.blogspot.com

আমি গৌতমের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। এই কথাটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি কেন?

কিন্তু অ্যান্টিডোট যদি থাকে তবে সেটা তাঁরা নিজেরা ব্যবহার করেননি কেন?

গৌতমকে কথাটা বলতেই ওর উত্তর—'হয়তো সুযোগ পাননি। বোঝার আগেই বিষ কাজ করতে শুরু করেছে।'

'হতে পারে।' আমি উত্তেজিত, 'তাহলে সেক্ষেত্রে তার অ্যান্টিডোট এখানেই থাকবে। হয় অ্যান্টিডোট, কিংবা তার ফর্মুলা। যতদূর জানি অ্যাকোনিটামের অ্যান্টিডোট হিসাবে নাক্স ভম কিংবা ক্যার ইউজ হয়। একবার গোটা ফর্মুলাটা পেয়ে গেলে বানিয়ে নিতেও অসুবিধে হবে না।...চিয়ার আপ...খোঁজো গৌতম... খোঁজো...।'

শুরু হল খোঁজাখুঁজি। গৌতম আর আমি দুজনেই বুঝতে পারছিলাম যে ক্যামোফ্লেজিয়ার প্রকোপ এরপর আমাদের উপরই পড়বে। আমাদের অবস্থাও ডঃ টোডি, ডঃ বসু বা ডঃ হিঙ্গোরানির মতো হবে। তাই অ্যান্টিডোট বা তার ফর্মুলাটা পাওয়া আমাদের কাছে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুজনেই মরিয়া হয়ে খুঁজছি! যে কোনো মূল্যেই হোক জিনিসটা পেতেই হবে। নয়তো আমাদেরও শেষ করে ছাড়বে ঐ ছদ্মবেশী ঘাতক!

ডঃ হিঙ্গোরানির প্রাইভেট ল্যাব আজ খোলা ছিল। উনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই দরজা বন্ধ হয়নি। আর কেউ পাসওয়ার্ড জানত না।

মনে হল, হয়তো ডক্টর অ্যান্টিডোটটাও ঐ ঘরেই রেখেছেন।

'গৌতম, তুমি বাইরেটা খোঁজো।' আমি প্রাইভেট ল্যাবের দিকে পা বাড়াই,'আমি ভিতরটা দেখছি।'

ল্যাবের ভিতরে সারি সারি শিশিতে নানারকম কেমিক্যাল। কোনটা সবুজ, আবার কোনটা বা গোলাপি। ছোট ছোট কাচের শিশিতে নানারকম তরল। এত শিশি আর বোতলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল। এর কোনটায় আমাদের ইপ্সিত বস্তু লুকিয়ে আছে? অ্যান্টিডোট ছাড়া ফুলটা তৈরি হল কী করে? যখন এটা তৈরি হচ্ছিল তখন থেকেই নিশ্চয়ই বিজ্ঞানীরা গ্যাস মাস্ক পরে ছিলেন না। ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কখনও না কখনও তাঁদের নাকে গিয়েই থাকবে। মনে আছে ডঃ হিঙ্গোরানি বলেছিলেন, 'গন্ধটা মিষ্টি।' যদি গন্ধ তাদের নাকেই না যায় তবে বুঝলেন কী করে যে গন্ধটা মিষ্টি!

দৃঢ় বিশ্বাস হল, তার মানে অ্যান্টিডোট আছে। গবেষণা চলাকালীন বিজ্ঞানীরা ফুলের গন্ধও পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁদের কিছু হয়নি। অ্যাকোনাইট কাজ করতে বেশি সময় নেয় না। একঘণ্টা দু-ঘণ্টার মধ্যেই কাম তামাম করে ফেলে।

সুতরাং তখন তাঁরা নিশ্চয়ই অ্যান্টিডোট নিয়েছিলেন। ওটা এখানেই কোথাও আছে।

কিন্তু কোথায়?

ল্যাবের ভিতরে একটা মস্তবড় ফ্রিজার। মাইনাস সিক্স ডিগ্রিতে সেট করা আছে। এটাকে মাইনাস ফরটি ডিগ্রি অবধি সেট করা যায়। গ্লাভস পরে ফ্রিজারের দরজা খুলতেই হাড় হিম করা ধোঁয়া বেরিয়ে এল। সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও কিছু ছোট ছোট শিশি। গায়ে লেবেল সাঁটা। সামনের ব্লকে বড় বড় করে লেখা, 'অ্যান্টিডোটস'।

boierpathshala.blogspot.com

এগুলোই অ্যান্টিডোট! নানান বিষ নিয়ে কাজ করেন ডক্টর। তাই প্রত্যেকটা বিষের ওষুধও তৈরি করা থাকে। সারসার শিশির মধ্যে আর্সেনিক অ্যান্টিডোট, থ্যালিয়াম অ্যান্টিডোট, সায়ানাইড অ্যান্টিডোট, নিউরোটক্সিন এলডি ফিফটির অ্যান্টিডোট; সবই চোখে পড়ল।

কিন্তু ক্যামোফ্লেজিয়া নেই!

আশ্চর্য ব্যাপার! ক্যামোফ্লেজিয়ার অ্যান্টিডোট এখানে নেই কেন? তবে কি অন্য কোথাও...?

প্রথমে সবকটা শিশি নামিয়ে নামিয়ে দেখলাম।...নেই! ল্যাবরেটরি প্রায় তছনছ করে খুঁজছি...।...নেই!....কাগজপত্র, ফাইল ঘেঁটে দরকারি-অদরকারি কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একশা করলাম। আমারই তৈরি করা প্রোজেক্ট রিপোর্ট, ডিফেন্স মিনিস্ট্রির চিঠি, ক্যামোফ্লেজিয়ার ইনশিওরেন্স পেপার; সব বেরোল...

কিন্তু ফর্মুলা?

...নেই!

হতক্লান্ত হয়ে মেঝের উপরই বসে পড়েছি। আবার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। ডঃ হিঙ্গোরানির জন্য নয়। নিজের কথা ভেবে! শেষ পর্যন্ত আমাকেও বিষ নিশ্বাস নিয়ে অসহায় গিনিপিগের মতো মরতে হবে! চোখের সামনে দেখলাম—ক্যামোফ্লেজিয়া আমার পিছনে ধাওয়া করছে। নীল বিষাক্ত শরীরে আমি.....

নাঃ। এভাবে, এত সহজে মরব? আমিও বিজ্ঞানী। এই কাগজপত্রের মধ্যে আর কিছু না হোক, কোথাও না কোথাও ক্যামোফ্লেজিয়ার ডি এন এ কোড রয়েছে। যদি একবারও সেটা পাই, তবে নিজেই তার অ্যান্টিডোট তৈরি করতে পারি। শুধু একবার ঠান্ডা মাথায় আমায় কাগজটা দেখতে হবে।

ফাইলের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম প্রাইভেট ল্যাব থেকে। গৌতম ততক্ষণে সমস্ত ডিভিডি, সিডি চালিয়ে দেখে নিয়েছে। কম্পিউটার তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। ডঃ টোডি, ডঃ বসু আর ডঃ হিঙ্গোরানির নিজস্ব কম্পিউটার তাঁদের কেবিনেই থাকে। সবকটা দেখেছে, এমনকি আমার কম্পিউটারও ছাড়েনি। যদি কোনো সিডিতে বা কম্পিউটারে ক্যামোফ্লেজিয়ার প্রেজেন্টেশন থাকে। কিংবা তার অ্যান্টিডোটের প্রেজেন্টেশন। আজকাল বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারেই তাঁদের রেকর্ড বেশি রাখেন। তাই সে তাও দেখতে বাকি রাখেনি।

কিন্তু ডঃ হিঙ্গোরানিকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তিনি কম্পিউটারে কিছু রাখার লোক নন।

দেখা গেল আমার চেনাটাই সঠিক। গৌতম সব কম্পিউটার ঘেঁটেও কিছু পায়নি। হয় সেগুলো কেউ সরিয়ে দিয়েছে। নয়তো ডক্টররা কম্পিউটারে জিনিসটা রাখেননি।

'এখন কি করব স্যার?'

তার কণ্ঠস্বরে হতাশা, 'কিছুই তো পেলাম না।—

'পাওয়া যাবে গৌতম, নিশ্চয়ই পাব আমরা।' ওকে সান্ত্বনা দিই, 'আমি বাড়িতে বসে ঠান্ডা মাথায় এই কাগজপত্রগুলো দেখব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যেই কিছু আছে। যদি

boierpathshala.blogspot.com

ক্যামোফ্লেজিয়ার ডি এন এ কোডও পেয়ে যাই তবে তা থেকে অ্যান্টিডোট বানিয়ে নিতে পারি। শুধু এইমুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার।'

সে ক্লান্তভাবে মাথা নাড়ে।

'এখন তুমি বাড়ি যাও।' আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'সকাল দশটার আগে তো ভিজিট করতে দেবে না। আমিও আসব।'

গৌতম সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ল—'চলুন স্যার, আপনাকে বাড়িতে ড্রপ করে দিই।'

'চলো।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সকাল সাতটা বাজল। সারারাত জেগে, খোঁজাখুঁজি করে দুজনেই ভীষণ অবসন্ন হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম দরকার।

আসার পথে আমাদের দুজনের কোনো কথা হয়নি। কোনো এক ভয় আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছিল। আমি অন্যমনস্ক ভাবে ফাইলের কাগজ উলটেপালটে দেখছিলাম। গৌতম ড্রাইভ করছিল। কোনো কথা বলেনি। আমাদের অমোঘ আশঙ্কা একটা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

আমাকে ড্রপ করার সময়ে গৌতমই প্রথম মুখ খুলল, 'আমার মনে হয় স্যার, কেউ সব রেকর্ড মুছে দিয়েছে। আমাদের মধ্যেই কেউ...আর বোধহয় বাঁচার উপায় নেই।'

দেখলাম ওর উদভ্রান্ত চোখে জল চিকচিক করছে।

আমারও মনে এই সন্দেহটা ঘুরছিল। কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবেই সরিয়ে ফেলেছে অ্যান্টিডোট। হয়তো কাগজপত্রও গায়েব করে দিয়েছে!

বুঝতে পারছিলাম না ওকে কি বলব। কিছু বলার আগেই সে আবার বলল, 'আসছি স্যার, সাবধানে থাকবেন।'

গৌতম চলে গেল। আমি নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াই। একটু বিশ্রাম দরকার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। একটু ঘুম.....

কিন্তু...এ কী!

বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতেই চমকে উঠলাম! কাল প্রতাপকে বলেছিলাম ঘাসফুলগুলো ছেঁটে ফেলতে! ওকে কাটারি দিয়ে ঘাসফুল ছাঁটতেও দেখেছি....

তবে ওগুলো কী!...

বাগান আলো করে ঘাসের মধ্যে ছোট ছোট সাদা ফুল শিশির মেখে ঝলমল করছে! কাল সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু আজ প্রায় গোটা বাগান জুড়েই...!

মনে হল ফুলগুলো বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে! এত তাড়াতাড়ি এত ঘাসফুল কোথা দিয়ে এল! সংখ্যায় প্রচুর! আর সারা বাগানই প্রায় ছেয়ে ফেলেছে! এগুলো কালও ছিল না...।

ঘাসফুল নয়...এ ঘাসফুল হতেই পারে না!

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলাম। পুরো বাগানের ঘাসই উপড়ে ফেলব। ঘাস কাটার মেশিনটা আছে স্টোররুমে। ওটা দিয়েই নিকেশ করবো রক্তবীজের বংশধরদের। ঘাসও থাকবে না...ঘাসফুলও নয়!

boierpathshala.blogspot.com

আজ আর প্রতাপকে ডাকলাম না। এ কাজ নিজের হাতেই করা ফেলা ভালো। ওকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আমিই দেখে নেব...!

গ্রাস কাটার চলতে শুরু করল।

চোখের সামনে দেখলাম ঘাসের গোড়া থেকে উপড়ে যাচ্ছে। সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ছে ছিন্নমূল হয়ে। নাক আগেই ঢেকে নিয়েছিলাম। তাই গন্ধ পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। ঘাস কাটতে কাটতেই একটা পৈশাচিক আনন্দ টের পাই। যেন আমার মাথায় দানব ভর করেছে। সব কেটে ফেলব...সব শেষ করব...সবকটাকে যমের দোরে পাঠাব।

দেখতে দেখতে গোটা বাগান সাফ হয়ে গেল। ঘাসগুলো বিধ্বস্ত হয়ে উপড়ে পড়ে আছে! তার সাথে ঘাসফুলও!

হিংস্র আনন্দে তাকিয়ে দেখলাম আমার বাগান ন্যাড়া হয়ে গেছে! বিবর্ণ হয়ে গেছে! প্রতাপ ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এসে দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছে! বাগানে কোনো ঘাস নেই! সে পাগলের মতো ছুটে আসে। প্রায় হাহাকার করে ওঠে—

'স্যার...একী করছেন!'

আমি রক্তচোখে ওর দিকে তাকাই। নির্ঘুম এক রাত কাটিয়ে, দুশ্চিন্তায় চেহারাটা উন্মাদের মতো লাগছিল। লাল চোখ, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে না কামানো দাড়ি! ও বোধহয় এই রূপ দেখে ঘাবড়ে গেল। কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়।

আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, ছোট ছোট ফুলের ঝাড় জ্বল জ্বল করছে। এত ছোট ছোট নানা রঙের ফুল কবে এল আমার বাগানে! একেবারে গাছ আলো করে থোকায় থোকায় ফুটে আছে।

মনের ভিতরের সন্দেহ আর আশঙ্কা একসাথে দানবের মতো দাপাতে শুরু করে।

ওগুলো কী? কী?...কী?

বলা যায় না...কিচ্ছু বলা যায় না...ও ফুল যেকোনো জায়গায়, যেকোনো রঙে ছদ্মবেশে ফুটে থাকতে পারে।

নাঃ, ফুল চাই না আমি...এ বাগানে কোনো ফুল থাকবে না...কোনো ফুল...কোনো গাছ নয়! বরং বাগানটাই দরকার নেই! বাগানটাই থাকবে না...ওড়াও...সব উড়িয়ে দাও... কিচ্ছু দরকার নেই!...নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি কিছু না...কোনো সৌন্দর্য, কোন সৌরভ —কিচ্ছু না!

ধ্বংস হোক...ধ্বংস হোক সব...

প্রতাপকে দিয়ে কাজটা করালাম না। বলা যায় না, হয়তো মায়ায় পড়ে একটা-দুটো গাছ রেখে দেবে। তাই নিজের হাতেই এক এক করে সব ধ্বংস করলাম। আমার বাগান নিমেষের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোশিমা-নাগাসাকির মতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। যে গাছগুলোকে নিজেই এনেছিলাম, সাজিয়ে তুলেছিলাম বাগান, সেই গাছগুলোকে নির্মম হাতে তুলে ফেলে দিলাম!

ফুল বড় ভালবাসতাম আমি...

আজ সবচেয়ে বেশি ভয় পাই এই ফুলকেই...ঘেন্না করি...ঘেন্না করি...

boierpathshala.blogspot.com

৫

বিকেলের দিকে ভিজিটিং আওয়ারে আরেকবার দেখে এলাম দুই বৈজ্ঞানিককে।

অবস্থার উন্নতি কিছুই হয়নি। বরং ইনটেনসিভ কেয়ারে ডাক্তারদের ব্যস্ততা দেখে মনে হল আজ বোধহয় দুজনেরই অবস্থা খারাপ।

আমরা আজ আর ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম না। বাইরে দাঁড়িয়েই জানলার কাচ দিয়ে দেখলাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত দুই বৈজ্ঞানিককে।

ডঃ হিঙ্গোরানির ছেলে বিদেশে থাকে। খবর পেয়েছে, কিন্তু এসে পৌঁছোতে পারেনি। ডঃ বসুর স্ত্রী আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। কত রাত ঘুমোননি কে জানে। চোখের তলায় কালি পড়েছে। তাঁর দিকে তাকাতেও পারছিলাম না! কথা বলার সাহসও হল না।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির একজন হোমরাচোমরা এসেছিলেন আজ। গম্ভীর মুখ করে বাইরে থেকেই ব্যাপারটা দেখে গেলেন। তাঁর মুখে একটা নিরাশার ছাপ লক্ষ করছিলাম। সেটা আবিষ্কারটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য না দুই বিজ্ঞানীর অবস্থা দেখে, কে জানে!

গোটা ভিজিটিং আওয়ারটাই বাইরে দাঁড়িয়ে কেটে গেল। বিকেলবেলা ফিরে এলাম বাড়িতে। বাগানের জায়গায় এখন মরুভূমির মতো নিষ্ফলা একটুকরো জমি খাঁ খাঁ করছে। অন্য সময় হলে বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠত। কিন্তু আজ আমি নিষ্ঠুর! ভীষণ নিষ্ঠুর!

স্নায়ুর উপর দিয়ে ভীষণ চাপ যাচ্ছিল। এক পেগ হুইস্কি তৈরি করতে করতেই অনুভব করলাম...

গোলাপের গন্ধ! সারা ঘরে হাল্কা গোলাপের গন্ধ ছড়িয়ে আছে!...

কিছুক্ষণের জন্য যেন হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে গেল...। গোলাপের গন্ধ কোথা দিয়ে আসছে? বাগানের ত্রিসীমানায় আগেই কোনো গোলাপ ছিল না। এখন তো বাগানটাই নেই! তবে গোলাপ কোথা দিয়ে এল?

হঠাৎই বুঝতে পারলাম শরীরটা খারাপ লাগছে। হার্টবিট বেড়ে গেছে! আমার গোলাপের গন্ধে অ্যালার্জি।

আমার ড্রয়ারে সবসময়ই নেস্ট্রোমিফিন রাখা থাকে। অ্যালার্জির ওষুধ। ফয়েল থেকে বের করে একটা খেয়ে নিলাম। গোলাপের গন্ধটা তাড়ানো দরকার। কোথা থেকে আসছে কে জানে। জানলা-দরজা বন্ধ করে রুমফ্রেশনার ছড়িয়ে দিই চতুর্দিকে। মদন আজ সকালেই এই নতুন রুমফ্রেশনারটা দোকান থেকে নিয়ে এসেছে বোধহয়।

সব কাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফের কাজে লেগে যাই। ল্যাব থেকে আনা কাগজগুলো খুব মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছি। অদরকারি কাগজপত্রই বেশি। ক্যামোফ্লেজিয়ার কয়েক কোটি টাকার ইনশিওরেন্স আছে। তার কাগজপত্র, ডিফেন্সের চিঠি, কিছু কেমিক্যাল কেনার রসিদের কপি, অ্যাকোনিটাম কেনার রসিদ....

দেখতে দেখতেই চোখে পড়ল একটা কাগজে কী যেন হিজিবিজি লেখা...

কোনো সন্দেহ নেই যে এটা ডক্টর হিঙ্গোরানির হাতের লেখা। তাঁর মতো দুর্বোধ্য হিব্রুর মতো হাতের লেখা আর কারুর নেই।

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু এসব কী হিজিবিজি এঁকেছেন! দেখে মনে হচ্ছে একটা প্ল্যানিং। ডি এন এ কোডের প্ল্যানিং?

উত্তেজনায় শরীর টানটান হয়ে উঠল। এই তবে ক্যামোফ্লেজিয়ার ডি এন এ কোডের ছবি। এত খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল!

কিন্তু একী! এর মধ্যে অ্যাকোনিটামের ডি এন এ তো দেখছি না। বরং কিছু সাপের বিষের সাইকেন দেখা যাচ্ছে! ক্যামোফ্লেজিয়া সাপের বিষে তৈরি! ডক্টর হিঙ্গোরানি কি তবে ভুল বলেছিলেন? বা চেপে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে আসল সত্যিটা?

আমি ভালো করে কাগজটা দেখতে চাইছিলাম। কিন্তু ক্রমশই শরীরটা কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। গোলাপের গন্ধটা আরও তীব্র। ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। চোখে ঝাপসা দেখছি, বুক ধড়ফড় করছে...

সব দরজা-জানলা বন্ধ! তবে গোলাপের গন্ধ আসছে কোথা দিয়ে! মদন কি ঘরে কোথাও গোলাপ এনে রেখেছে নাকি? আমি হুইস্কির গ্লাসে কয়েকটা উত্তেজিত চুমুক লাগাই, তারপর ফয়েল থেকে আরও কয়েকটা নেস্ট্রোমিফিন বের করে টপাটপ খেয়ে ফেলি। অ্যালার্জিটা ক্রমশই বাড়ছে। দেখতে হবে গোলাপ কোথায় রাখা আছে।

অদ্ভুত ব্যাপার; সমস্ত ঘর খুঁজেও কোথাও গোলাপের একটা পাপড়ি তো দূরের কথা, একটা কাঁটাও নজরে এল না! কোত্থাও গোলাপ নেই এ বাড়িতে। তবে?

আবার একটা আশঙ্কা মনের মধ্যে চেপে বসল! ক্যামোফ্লেজিয়ার গন্ধ কি তবে গোলাপের মতো! ক্রমশই মনে হচ্ছে বুকের উপর কীসের যেন একটা ভয়ানক চাপ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে...। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

আমি জোরে জোরে শ্বাস নিতে শুরু করি...। কিন্তু পারছি না! দেহ অবশ হয়ে আসছে। প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে, দরদর করে ঘামছি।

বুঝতে পারছি এ যাত্রা বোধহয় আর বাঁচব না! নার্ভগুলো কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, বুকে ভীষণ কষ্ট! এ ক্যামোফ্লেজিয়ার সিম্পটম! নির্ঘাৎ ক্যামোফ্লেজিয়া...! কিন্তু কোথায়? আমার বাগানে আর কোনো ফুল নেই। আশেপাশে কোনো ফুল চোখে পড়েনি। ভেবেছিলাম ক্যামোফ্লেজিয়াকে আমি অনেক দূরে ফেলে আসতে পেরেছি....

আঃ...অক্সিজেন...একটু অক্সিজেন...আমি ধড়ফড় করছিলাম একটু অক্সিজেনের জন্য... চোখে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে...মৃত্যু যন্ত্রণা কাকে বলে বুঝতে পারছি... বুঝতে পারছি ক্যামোফ্লেজিয়া আমার খুব কাছেই আছে....

জ্ঞান হারাবার আগে শুনতে পেলাম আমার মোবাইল ফোন বাজছে। বাজছে আমার খুব প্রিয় রিংটোন...কারেন কার্পেন্টারের গলা—-

'জাস্ট লাইক মি...দে ওয়ান্ট টু বি...ক্লোজ টু ইউ....'

তারপরই সব অন্ধকার!

৬

মনে হচ্ছিল কোথাও একটা ভেসে বেড়াচ্ছি!

boierpathshala.blogspot.com

না এই জবরজং শরীরটা নিয়ে নয়। বরং বেশ সূক্ষ্ম একটা অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। এত হাল্কা নিজেকে কখনও মনে হয়নি। এত মুক্তও নয়। অনাবিল অন্ধকারের মধ্যে যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছি!

সাঁতরাতে সাঁতরাতেই টের পেলাম যে শরীরটা হঠাৎ করে বড্ড ভারী হয়ে যাচ্ছে। আঃ...অন্ধকারের মধ্যে কে আলো জ্বেলে দিল দুম করে? শান্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে নানারকম আওয়াজ কানে আসছে।

দপ করে যেন চোখের সামনে লক্ষ হ্যালোজেন জ্বলে উঠল। জন্মযন্ত্রণা যেন দ্বিতীয়বার অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল আমি কোনো গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছি; চতুর্দিকে অনেক আওয়াজ, অনেক আলো আমায় কষ্ট দিচ্ছে। অনুভূতিগুলো যেন একটা অদ্ভুত পীড়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল।

কোনোমতে চোখ মেলে তাকাই...কে আমায় এমনভাবে বিরক্ত করছে? কেনই বা করছে? দিব্যি তো ছিলাম একা একা! কে...?

আলোর তীব্রতায় কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে ফেলেছিলাম। আবার তাকানোর চেষ্টা করি...এত আলো!...আমি কোথায়?...

'অ-নু-প-ম!'

কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে! আমার মুখের সামনে দুটো ঝুঁকে পড়া উদ্বিগ্ন মুখ!

কে?... চিনতে পারলাম না...সব ঝাপসা...! শরীরটাকে ভীষণ ভারী মনে হচ্ছিল। কোনমতে উত্তর দিই; 'উঁ'।

'থ্যাঙ্ক গড! জ্ঞান ফিরেছে!' কে যেন সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওঃ ঈশ্বর...হি ইজ ওকে...হি ইজ গেইনিং সেন্স...'

ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ঘুমটা যেন আমায় চেপে ধরল।

আবার অন্ধকার!

কতক্ষণ মড়ার মতো ঘুমিয়েছি জানি না। অনেকক্ষণ একটানা ঘুমোনোর পর আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরে পেলাম। এবার বুঝতে পারি নার্সিংহোমে আছি। এটা আই সি ইউ। আমার নাক থেকে বোধহয় সদ্যই অক্সিজেন মাস্ক খোলা হয়েছে।

'অনুপম, কেমন লাগছে এখন?'

পরিচিত গলার স্বর শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাই। যা দেখি তাতেই চক্ষু চড়কগাছ! আমাকে রাখা হয়েছে ডঃ হিঙ্গোরানি ও ডঃ বসুর নার্সিংহোমেই। ইনফ্যাক্ট তাঁদের পাশেই!

বিস্ময়ের কথা এটা নয়। যা দেখে চমকে উঠলাম, তা হল;....

উপরোক্ত দুজনই আমার বিছানার পাশে বসে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে!

বিস্ময়ের পরই অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে গেল। পারেনি...ক্যামোফ্লেজিয়া এই দুজনকে নিয়ে যেতে পারেনি...ক্যামোফ্লেজিয়া হেরে গেছে...হেরে গেছে...সৃষ্টি স্রষ্টাকে ধ্বংস করতে পারেনি...

আমি প্রায় লাফ মেরে উঠে বসতেই যাচ্ছিলাম, তার আগেই ডঃ হিঙ্গোরানি আমায় ধরে ফেলেছেন। সস্নেহে টেনে নিলেন বুকে, 'ওয়েলকাম ব্যাক অনুপম! যা ভয় দেখিয়েছিলে!

boierpathshala.blogspot.com

সাতদিন ধরে তোমার সেন্স ছিল না। এমন কাণ্ড একজন বিজ্ঞানী হয়ে করলে কি করে?'

আমি বলতে গেলাম, 'ক্যামোফ্লেজিয়া.....'

আমাকে থামিয়ে দিয়েই ডঃ বসু বললেন, 'ক্যামোফ্লেজিয়া নয়। তোমার রোজ এসেন্সে অ্যালার্জি। তার সাথে প্রচুর নেস্ট্রোমিফিন খাওয়া, এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সাথে অ্যালকোহল! তুমি একটা বিজ্ঞানী অনুপম! তোমার মনে ছিল না যে নেস্ট্রোমিফিন যতই নিরীহ অ্যালার্জির ওষুধ হোক না কেন, অ্যালকোহলের সাথে মিষলে মারাত্মক বিষ হয়ে দাঁড়ায়? কটা খেয়েছিলে ট্যাবলেট?'

মনে করার চেষ্টা করি—'চার পাঁচটা হবেই...।'

ডঃ হিঙ্গোরানি শাসনের ভঙ্গিতে বলেন, 'তোমার লজ্জা করে না? উপরে যাওয়ার বন্দোবস্ত তো প্রায় পাকাই করে ফেলেছিলে। তোমার কাজের লোক মদন ঠিক সময়ে উদ্ধার না করলে কোথায় থাকতে তুমি?'

এরপর তাঁদের মুখ থেকেই শুনি মদন আমায় ঐ অবস্থায় দেখে সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করে গৌতমকে। মদন মোটামুটি এসব কাজ করতে পারে। প্রতাপও পারে। গৌতমের কথামতো ওরা দুজনেই আমাকে ঐ অবস্থায় এই নার্সিংহোমে নিয়ে আসে। এই সাতদিন রোজ দু'বেলা গৌতম এসেছে। মদন আমায় দেখতে না পেলেও, আই সি ইউর সামনে থেকে একমুহূর্তও নড়েনি। আজ আমার হুঁশ ফিরেছে শুনে মন্দিরে ছুটেছে পুজো দিতে।

আবেগে চোখে জল এল। এরা সবাই আমায় কত ভালোবাসে! অথচ এ ক'দিন আমি শুধু স্বার্থপরের মতো নিজের কথাই ভেবে গেছি...কী স্বার্থপর আমি...!

মনে একটা প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছিল। থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলি—

'ডক্টর?'

'বলো।'

'গোলাপের গন্ধটা কোথা থেকে এল? আমার ঘরে কোথাও গোলাপ ছিল না। বাগান তো আমি নিজেই উড়িয়েছি। তবে...?'

'সেটার উত্তরও মদন তোমার ডাক্তারকে দিয়েছে।' ডঃ হিঙ্গোরানি হাসলেন,'তুমি ওকে রুমফ্রেশনার আনতে দিয়েছিলে। ও জানত না যে তোমার রোজ এসেন্সে মারাত্মক অ্যালার্জি। বেচারা একটা রোজ এসেন্সের রুমফ্রেশনার এনেছিল।'

এইবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ক্যামোফ্লেজিয়া নয়। আসল ভিলেন ঐ রুমফ্রেশনার। আমি ঘরে ঢোকার আগেই সম্ভবত মদন স্প্রে করে রেখেছিল। ঘরে ঢোকামাত্রই ঐ গন্ধটা পেয়েছি। গন্ধটা কাটাবার জন্য দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে বোকার মতো ঐ রুমফ্রেশনারটাই বারবার স্প্রে করেছিলাম। যার জন্য গোলাপের গন্ধ ক্রমশই বাড়ছিল!

আর তার সাথে বাড়ছিল আমার অ্যালার্জি।

'অ্যান্ড দেন ফাইভ নেস্ট্রোমিফিনস উইদ অ্যালকোহল।' ডঃ হিঙ্গোরানি বললেন, 'আরেকটু হলেই চ্যাপ্টার ক্লোজড হচ্ছিল তোমার। বেঁচে যে আছ এই অনেক।'

আমি আনন্দে গদগদ হয়ে বলি, 'স্যার, আপনাদের দেখে যে কী আনন্দ হল কী বলি... । আমাদের যে কী অবস্থা হয়েছিল....।'

boierpathshala.blogspot.com

'হ্যাঁ জানি।' ডঃ বসু বললেন, 'তুমি তো একেবারে ভেউভেউ করে কাঁদছিলে।'

ওঁর কথা শুনে চমকে উঠলাম! উনি জানলেন কী করে? দুজনেই তো কোমায় ছিলেন!

কথাটা বলতেই উত্তর এল, 'ঘোড়ার ডিম ছিলাম! কিস্যু হয়নি আমাদের। স্রেফ অসুস্থতার অ্যাকটিং করে কয়েকটা দিন ছুটিতে কাটাচ্ছিলাম।'

আমি পুরো হাঁ! তবে? ক্যামোফ্লেজিয়া...? যা ভাবছিলাম...তার সবটাই কী...!

'ক্যামোফ্লেজিয়া।' হেসে ফেললেন ডঃ হিঙ্গোরানি, 'ক্যামোফ্লেজিয়ার ফর্মুলা শুনবে? বেশ, শোন তাহলে...।'

এরপর ডক্টর যা বললেন তাতে আমার আরেকবার হার্টফেল করার মতো দশা হল...

ডক্টর হিঙ্গোরানি, ডঃ বসু ও ডঃ টোডি; তিনজনে মিলে গোপনে ক্যান্সারের উপর রিসার্চ করছিলেন। ক্যান্সারের ওষুধ বের করার চেষ্টা চলছিল। কাজ অনেকটাই গুটিয়ে এসেছে। অথচ এক্সপেরিমেন্ট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মূলধন অপর্যাপ্ত। সরকারি সাহায্য চাইলেন। প্রত্যাখ্যাত হল তাঁদের আবেদন।

এদিকে কাজ এগোনোর জন্য টাকা চাই। কী করণীয়?

এই সময়ে ডক্টর টোডির মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধি জোগাল। তিনি বললেন যে, সরকার জীবনদায়ী ওষুধের পিছনে টাকা খরচ করে না। কিন্তু মারণাস্ত্রের পেছনে করবে। তাই তিনজনে মিলে তৈরি করলেন এই সাইলেন্ট কিলারের পরিকল্পনা! নতুন আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকা হাতানোর জন্য; যাতে তাঁদের গোপন আবিষ্কারের কাজ ঠিকঠাক চলতে পারে।

'তাহলে...আমরা যে দেখলাম...! ক্যামোফ্লেজিয়া শুঁকে গিনিপিগগুলো মরল....?'

ডঃ বসুর সহাস্য উত্তর, 'ওগুলো রোগেভোগে কষ্ট পাচ্ছিল। তাই ভাবলাম মার্সিডেথ দিয়ে দিই। ত্রিশ মিলিগ্রাম অ্যাকোনাইট আগেই ওদের শরীরে পুশ করা ছিল। একদম সঠিক মাত্রায়, সঠিক টেম্পারেচারে। যাতে ঠিক একঘণ্টা পরেই মারা যায়। আর ঠিক একঘণ্টা পরেই তোমরা ডেমো দেখেছিলে।'

আমি হাঁ। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

'তবে...তবে রং পাল্টানোর ব্যাপারটা...?'

'ওটাও প্রযুক্তিবিদ্যার কারিকুরি ডিয়ার।' ডঃ হিঙ্গোরানি হাসছেন, 'যে ডায়াসের উপরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক মাথার উপরই একটা ন্যানো প্রোজেক্টর ছিল। সেটা কন্ট্রোল করছিলেন ডঃ বসু। আমি সারফেসে যে রং রাখছিলাম উনি ঠিক সেইরকম আলোই প্রোজেক্টরের মাধ্যমে ফুলটার উপরে ফেলছিলেন। ওটার অরিজিনাল রং সাদা বলে মনে হচ্ছিল রং পালটে পালটে যাচ্ছে।'

'আর ডক্টর টোডি?'

ডঃ হিঙ্গোরানি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, 'ওনার মৃত্যুটা ওরিজিনাল। বড্ড ড্রিংক করছিলেন আজকাল। ওটা আমাদের প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। কথা ছিল আমি কাচের মধ্যে যে ফুলটা ছিল সেটা একদম নষ্ট করে ফেলব, এবং মাথা ফাটিয়ে ক্যামোফ্লেজিয়া চুরি যাওয়ার নাটক করব। আর সেটা করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যেই। কারণ কয়েকদিন পরেই ডিফেন্স ক্যামোফ্লেজিয়া নিয়ে যাবে। তার আগেই...'

boierpathshala.blogspot.com

'তাহলে ওটাও নাটক!'

'হ্যাঁ।' ডঃ হিঙ্গোরানি বললেন, 'ভেবেছিলাম যে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হতাশ হয়ে এমন জিনিস দ্বিতীয়বার আর তৈরি করার কথা বলবে না। কিন্তু তারা আমাদের উপর চাপ দিতে লাগল দ্বিতীয়বার ক্যামোফ্লেজিয়া তৈরি করার জন্য। কী করে এড়ানো যায় তাই ভাবছিলাম। এর মধ্যেই ডঃ টোডি হার্টফেল করলেন। ওঁর হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল। মৃত্যুটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর মৃত্যুটাই আমাদের রাস্তা দেখিয়ে গেল। ঠিক তখনই দুজনে মিলে ঠিক করলাম এইরকম একটা নাটক করব, যাতে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হাড়ে হাড়ে টের পায় যে এই জাতীয় অস্ত্র কী মারাত্মক হতে পারে।' তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'আশা করি এতদিন কোমায় থাকার পর ওরা আর আমাদের নতুন করে ফের জিনিসটা আবিষ্কার করতে বলবে না। যথেষ্টই ভয় পেয়েছে।'

বিস্ময়ের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম। ব্যাপারটা যত পরিষ্কার হচ্ছিল ততই নিজের গালে চড় মারার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছিল।

তা সত্ত্বেও আমার মনে একটা কিন্তু ছিল।

'ডিফেন্স মিনিস্ট্রির টাকাটার কী হবে?'

'কী আর হবে?' ডক্টর সুন্দর হাসলেন, 'ক্যামোফ্লেজিয়ার একটা মোটা টাকার ইনশিওরেন্স ঐ কথা ভেবেই করিয়ে রাখা হয়েছে। সেই টাকা থেকেই ওদের টাকা ফেরত যাবে। বাকি টাকাটা লাগবে আমাদের ক্যান্সার রিসার্চ প্রোজেক্টে।'

'তার মানে ক্যামোফ্লেজিয়া...?'

'ঐ নামে কিছু কোনোদিন ছিল না, এখনও নেই, আগামীতেও হবে না।' তিনি দুষ্টু বাচ্চার মতো হেসে উঠলেন; 'তোমরা যা দেখেছ সেটা নেহাতই একটা ঘাসফুল। আর বাদবাকি সব মায়া! একথা আগে আমরা তিনজন আর পরে এই নার্সিংহোমের ডক্টর জানতেন। তিনিও চমৎকার অ্যাকটিং করেছেন। আর এখন জানলে তুমি...।'

আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম! তাহলে এতদিন কীসের ভয় পেয়ে এসেছি...!

হঠাৎ করে প্রতাপের মুখটা মনে পড়ল। বড় কষ্ট হল ওর জন্য। বাড়িতে ফিরে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করব নিশ্চয়ই...

কিন্তু ও কি বুঝবে....?

—

boierpathshala.blogspot.com

জীবন্ত প্রস্তর

১

তখন গভীর রাত। যতদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকারের একচ্ছত্র বিস্তৃতি। কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। কোথাও একবিন্দু আলো নেই, কোনো শব্দ নেই! নেই জীবনের বিন্দুমাত্র প্রকাশও! রাতচরা পাখির ডাক, কিংবা কুকুরের ঘেউ ঘেউ এমনকী গাছের পাতা খসে পড়ার খসখস; কোনো জাগতিক আওয়াজই শোনা যায় না! এ কেমন নিস্তব্ধতা! কেমন অন্ধকার! যেন কেউ একটা কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছে সমস্ত দৃশ্য, সমস্ত শব্দ! পর্দার ওপ্রান্তে যা আছে তা যেন প্রকাশ্যে আসতে চায় না।

ডঃ ইথান ওলসেন সতর্কদৃষ্টিতে একবার চতুর্দিকটা দেখে নিলেন। আজ অমাবস্যা। আকাশে জমাট অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। আশেপাশে শুধু হাড়-পাঁজর বের করা ধ্বংসস্তূপের কঙ্কাল! শূন্য চক্ষুকোটরের মতো হাঁ করে আছে জানলাগুলো! বেশির ভাগ বিল্ডিংগুলোই ধসে পড়েছে। বিশেষ কিছুই বাকি নেই। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, বুঝি রস-রূপ-গন্ধ ভরা পৃথিবী থেকে বহুদূরে এসে পড়েছেন তিনি। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে! যেখানে নৈঃশব্দ্যও বড় বিষণ্ণ।

ইথানের মনের মধ্যেও যেন সেই বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বের অন্যতম সেরা প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটর হিসাবে তিনি পৃথিবীখ্যাত। দুনিয়ায় এমন কোনো কুখ্যাত ভৌতিক স্থান নেই, যেখানে তিনি তদন্ত করতে যাননি। অভিশপ্ত অ্যাসাইলাম থেকে শুরু করে রহস্যময় টানেল, মেট্রো স্টেশন, ভূতুড়ে বাড়ি ও ম্যানসন; এমনকি কুখ্যাত ঐতিহাসিক জায়গাগুলোকেও ছাড়েননি। কোথাও প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটির প্রমাণ পেয়েছেন, আবার কোথাও বা পাননি। কিন্তু তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা বলছিল যে এই অভিশপ্ত দুর্গের কাহিনি হয়তো অন্যরকম। আপাতদৃষ্টিতে কোনো কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় না। সঙ্গে আনা সেন্সরগুলোও কোনোরকম অতিলৌকিকের উপস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে না। অথচ তাঁর দেহ ও মন বলছে, এই কেল্লার ছত্রে ছত্রে অস্বাভাবিকতা রয়েছে। এবং যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। শুধু ধরা দিচ্ছে না!

ইথান যখনই প্রথম এই দুর্গের সিঁড়িতে পা রেখেছিলেন, তখনই এক অদ্ভুত শৈত্যে ছ্যাঁত করে উঠেছিল তাঁর দেহ! অথচ এমন হওয়ার কথা নয়! এখন গরমের মরশুম চলছে। ফোর্টের বাইরে যখন দাঁড়িয়েছিলেন, তখনও বেশ গরমই লাগছিল। খণ্ডমুহূর্তের মধ্যেই সেই ভ্যাপসা গরম ভাব এমন অস্বাভাবিক শীতলতায় রূপান্তরিত হতে পারে না! তাঁর দেহ সেই মুহূর্তেই বলে উঠেছিল; 'সামথিং ইজ রং উইথ দিস প্লেস!'

কিন্তু আশ্চর্য বিষয়! তাঁর ইনফ্রারেড থার্মোমিটার এখনও কোনোরকম অস্বাভাবিকতা দেখায়নি! ইথান প্রত্যেকটি জায়গায় গিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করেছেন। তবুও থার্মোমিটার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টরও কোনো অদৃশ্য উপস্থিতির কথা জানায়নি। ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারও ব্যর্থ হয়েছে। ইথান দুর্গের প্রত্যেকটি ভাঙাচোরা ঘরে ঢুকে কোনো অলৌকিক মানুষের উদ্দেশে বারবার প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। যাকে বলে 'ইলেক্ট্রনিক ভয়েস ফেনোমেনা' সেশন। কিন্তু গোটা ইভিপি সেশনেও

boierpathshala.blogspot.com

রেকর্ডারে কিছুই রেকর্ড হয়নি! কোনো কথা তো দূর, সামান্য শব্দও নয়! অর্থাৎ তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি কেউ। দুর্গের প্রতিটি নির্জন কোনায়, সিঁড়িতে, আশেপাশের ফাঁকা ঘরে ছড়িয়ে রেখেছেন 'মোশন অ্যান্ড ভাইব্রেশন ডিটেক্টর'। কোনোরকম অস্বাভাবিক বা আপাতঅদৃশ্য গতিবিধি অনুভব করতে পারলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে! কিন্তু এখনও পর্যন্ত সব চুপচাপই আছে।

অন্য কেউ হলে, হতাশ হয়ে এতক্ষণে হাল ছেড়ে দিত। অথবা ঘোষণা করে দিত 'এই অভিশপ্ত দুর্গে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা নেই।' কিন্তু ইথান সে পথে হাঁটেননি। তাঁর সেন্সর ও গ্যাজেটগুলো বলছে যে এখানে কোনো প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি নেই। কিন্তু তিনি নিজে দেহে ও মনে যা অনুভব করছেন, তাকে অস্বীকার করেন কী করে! যে স্থির শৈত্য তাঁকে ছুঁয়ে আছে, যে নৈঃশব্দ্য তাঁকে নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকুও শুনতে দিচ্ছে না, যে অজ্ঞাত কারণে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে; এক বহু শতাব্দীর পাথরচাপা দীর্ঘশ্বাস গুমরে মরছে বুকে; তা মোটেই স্বাভাবিক নয়। গ্যাজেট ভুল করতে পারে। কিন্তু দেহ ও মন ভুল করে না।

ইথানের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তাঁর সেন্সর ও গ্যাজেটগুলো কি ঠিকমতো কাজ করছে না? নাকি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে গ্যাজেটগুলোকে বিভ্রান্ত করছে? তাদের সঠিক নির্দেশ দিতে কেউ বাধা দিচ্ছে কি? নাকি এখনও সময় হয়নি? তিনি নিজের ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকালেন। রাত্রি তিনটে বেজে তিরিশ মিনিট। সূর্যোদয় হওয়ার আগে তাঁকে সেই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে যা আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান দিয়ে উঠতে পারেনি। খুঁজতে হবে সেই অজানাকে যার জন্য এই দুর্গের কপালে 'মোস্ট হন্টেড প্লেস'-এর তকমা জুটেছে।

আস্তে আস্তে আরও কিছুটা সময় কাটল। অন্ধকার, নিঃশব্দ রাত এখনও মৌনতাভঙ্গ করেনি। ইথানও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুর্গের ভাঙাচোরা সিঁড়িতে বসে কখন যে অজান্তেই দু-চোখের পাতা লেগে এসেছিল তাঁর, তা নিজেও বুঝতে পারেননি। আচমকাই ঘুম ভাঙল একটা তীব্র শব্দে!

তৎক্ষণাৎ লাফ মেরে উঠে বসলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যেই কানে এল 'মোশন অ্যান্ড ভাইব্রেশন ডিটেক্টরের' প্রবল চিৎকার! কোথাও কোনো রহস্যময় গতিবিধি ধরা পড়েছে! অবশেষে! এত প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত একটা ইঙ্গিত এল তবে! কিন্তু আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে! ইথান তড়িৎগতিতে ছুটে গেলেন এম ভি ডিটেক্টরের আওয়াজ লক্ষ্য করে। তাঁর হাতের টর্চ দুর্গের আঁকাবাঁকা পাথুরে রাস্তার ওপর আলো ফেলছে। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে, কখনও হোঁচট খেয়ে, কখনও লাফ মেরে সিঁড়ি টপকে তিনি দৌড়লেন শব্দের উৎসের দিকে।

কিন্তু দৌড়তে দৌড়তেই আচমকা চমকে উঠলেন ইথান। এতক্ষণ মোশন অ্যান্ড ভাইব্রেশন ডিটেক্টর স্বাভাবিক আওয়াজেই অ্যালার্ম দিচ্ছিল। হঠাৎই সেই একঘেয়ে অ্যালার্ম থেমে গিয়ে চতুর্দিক কাঁপিয়ে হাসির শব্দ ভেসে এল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন, সেটা কোনো নারীর হাসি! কোনো নারী যেন তীব্রস্বরে খিলখলিয়ে হেসে উঠেছে। আর সেই হাসি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে দুর্গের প্রতিটি ভাঙা দেওয়ালে! নারীর হাসিই বটে; কিন্তু যেন অসম্ভব নিষ্ঠুর!

সামান্যই এক নারীর হাসি! কিন্তু আসছে মোশন অ্যান্ড ভাইব্রেশন ডিটেক্টরের মধ্য থেকেই! তার স্বাভাবিক অ্যালার্ম টোনের বদলে বাজছে এই ভয়ংকর হাসি! ইথান বুঝতে

boierpathshala.blogspot.com

পারলেন তিনি দরদরিয়ে ঘামছেন! নিস্তব্ধতাকে চিরে আসা সেই তীব্র তীক্ষ্ণ হাসি শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল তাঁর। কোনোমতে স্খলিত স্বরে বললেন—

'ওঃ! ক্রা-ই-স্ট!'

২

'শেষ পর্যন্ত ভানগড় ফোর্ট! ইউ মিন, আলোয়াড়, রাজস্থানের ভানগড়! নো ওয়ে! তুই আর কোনো জায়গা পেলি না?'

সুজনের প্রস্তাবটা শুনে ওর সঙ্গীদের প্রাথমিক অভিব্যক্তি এটাই ছিল। দেবযানী তো প্রায় লম্ফ মেরে উঠে বলেছিল, 'জাস্ট ফরগেট ইট! তোর কোনো ধারণা আছে? তুই ঠিক কী করতে চাইছিস? রাতের বেলা ভানগড় ফোর্টে ঢুকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে আসতে হবে! হালুয়া-পুরি নাকি! আমি এই প্রোজেক্টে নেই!'

সুজন ওর দিকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সে জানত দেবযানী শুরুতেই চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। প্রত্যেকটা কন্ট্র্যাক্টের শুরুতেই ও এরকম তা-না-না-না করে। কিন্তু টাকার অঙ্কটা শুনলে কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজি হয়ে যায়। সুজন তাই একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলল, 'কী করব বল। কাজটা তো দিনের আলোয় করা সম্ভব নয়! তা ছাড়া এরকম অনেক ফোর্টে, অনেক মন্দিরে আমরা গভীর রাতে ঢুকে কাজ করেছি। করিনি কি?'

সুরেশ বেশি কথা বলার মানুষ নয়। সে একটা কিংসাইজ সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'করেছি। কিন্তু ভানগড় ফোর্টের ব্যাপারটা আলাদা।'

'এগজ্যাক্টলি!' দেবযানী চোখ গোলগোল করেছে; 'তুই এমন একটা জায়গার কথা বলছিস যেটা ইন্টারন্যাশনালি কুখ্যাত। শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের অন্যতম অভিশপ্ত জায়গা! ইন্টারনেটে সার্চ করে দ্যাখ। ওয়ার্লডের মোস্ট হন্টেড প্লেসের তালিকায় প্রথম পাঁচটার মধ্যেই ভানগড় ফোর্টের নাম আসবে! আর তুই কিনা সেই জায়গায় গিয়ে মূর্তি কাটার কথা ভাবছিস! তাও আবার রাতে! আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া ওখানে বিরাট নোটিশ বোর্ড টাঙিয়ে রেখেছে। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় অবধি কেউ ওখানে ঢুকতে পারে না। গেটে একটা মস্ত তালা ঝোলে! কোনো নাইটগার্ডও ওখানে থাকতে চায় না! আজ পর্যন্ত যারা ওখানে রাতে ঢুকেছে, বেশির ভাগ লোকই ফেরেনি! আশেপাশের গ্রামগুলোর লোকেরা ভুলেও সন্ধ্যার পর ভানগড়ের ছায়াও মাড়ায় না। এমনকি বিশ্ববিখ্যাত প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটর ইথান ওলসেনের অভিজ্ঞতা পড়েছিস? ভাইরাল হয়ে গিয়েছে তাঁর লেখাটা। দিস ইজ নট আ ম্যাটার অফ জোক সুজন! ভানগড় ফোর্ট এমনি এমনি আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাত হয়নি! ওটা আপাদমস্তক একটা ভৌতিক জায়গা!'

'আই নো!' সুজন হাসল, 'ভানগড় যে অভিশপ্ত ও হন্টেড সেটা পৃথিবীর সবাই জানে। কিন্তু ডেঞ্জারাস বলেই তার দামটাও ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আকাশছোঁওয়া! ভানগড়ের একটা মূর্তি আন্তর্জাতিক বাজারে কীরকম শোরগোল ফেলে দেবে তার ধারণা আছে তোদের? মিঃ ও' কোনরও ভানগড়ের হিস্ট্রি জানেন। ক্রেডিট গোজ টু ইথান। এবং সেইজন্যই তিনি যে টাকা দেবেন তাতে আমরা কেন, আমাদের পরবর্তী চোদ্দপুরুষ ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে বিরিয়ানি- পোলাও খেতে পারবে।'

দেবযানী হাত তুলে দেয়, 'দ্যাখ ভাই, বেঁচে থাকলে তবে তো বিরিয়ানি পোলাও খাবো! আমি নেই!'

boierpathshala.blogspot.com

সুরেশ একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বলল, 'তা ছাড়া ভানগড়ে মূর্তি কোথায়? গোটা ফোর্টটাই তো ভেঙেচুরে গিয়েছে! সেটার কারণও অবশ্য কেউ জানে না। অতবড় শক্তপোক্ত দুর্গটা কী করে একরাতের মধ্যেই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল, ভেতরের লোকগুলোই বা কোথায় গেল; আজ পর্যন্ত কেউ সেটা বলতে পারেনি। গোটা ব্যাপারটাই মিস্টিরিয়াস! আর ঐ ধ্বংসস্তূপের ভেতরে তুই মূর্তি কোথায় পাবি?'

সুজন হেসে ফেলল। সে রিসার্চ না করে কোনো কথাই বলে না। মৃদু হেসে বলল, 'মূর্তি আছে। ভানগড় ফোর্টটা একরাতের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে ফোর্টের ভেতরের মন্দিরগুলোর গায়ে সামান্য আঁচড়ও পড়েনি! মন্দিরগুলো এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। তার ভেতরে বিগ্রহ নেই ঠিকই, তবে মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা আছে সব অসাধারণ মূর্তি! বিশেষ করে পুরোনো গোপীনাথ মন্দিরের দেওয়ালে অপূর্ব সব যক্ষিণী মূর্তি, নানা দেবী ও দেবতার মূর্তিতে ভরা। সবাই বলে, যক্ষিণী মূর্তিগুলো সব তৎকালীন সুন্দরী নর্তকীদের মডেল করে তৈরি করা হয়েছিল। আর তাদের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে বড় যে দেবীমূর্তিটি, সেটি নাকি ভানগড়ের কিংবদন্তি সুন্দরী রাজকন্যা রত্নাবতীর আদলে তৈরি! ভানগড়ের অভিশপ্ত হওয়ার পেছনের গল্পে যে আসল নায়িকা; সেই রত্নাবতী! ঐ মূর্তিটা কাটতে পারলে কী হবে ভাবতে পারছিস?'

সুরেশের ভুরু কুঁচকে যায়। রাজকন্যা রত্নাবতীর গল্পটা সে জানে। রাজকন্যার দাসী যখন বাজারে সুগন্ধি তেল কিনতে যায়, এক দুষ্ট তান্ত্রিক সিঙ্ঘিয়া ছলে- বলে-কৌশলে সেই তেলকে মন্ত্রপূত করে দেয়। কিন্তু রত্নাবতী নিজেও তন্ত্রচর্চা করতেন। চক্রান্তটা বুঝতে পারেন এবং সেই তেল একটি বিরাট পাথরের ওপর ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথর ছুটে যায় সিঙ্ঘিয়ার দিকে। তান্ত্রিক সেই পাথরের নীচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিল যে এই নগর ধ্বংস হবে। মৃত্যুপথযাত্রী তান্ত্রিকের অভিশাপেই নাকি ভানগড় রাতারাতি ধ্বংস হয়ে যায়!

সুজনের কথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ওরা জানে কাজটা নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটাই ওদের পেশা। আসলে ওরা 'ভ্যান্ডালস ভ্যানডালস'! আর যে কাজটা করে, তাকে বলে 'ভ্যান্ডালিজম'। কোনো শিল্পকীর্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া অনৈতিক কাজ। ধরা পড়লে কঠোর থেকে কঠোরতম সাজা হবে। তবু পেটের দায়ে, প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে প্রাচীন মন্দিরের গা থেকে কেটে নিয়ে আসে অপূর্ব সব প্রাচীন মূর্তি। ওরা সে কাজে রীতিমতো এক্সপার্ট। মাখন তোলার মতো পাথুরে দেওয়ালের গা থেকে একদম অবিকৃতভাবে মূর্তি কেটে নেয়। বিদেশের বাজারে সেসব কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয়। আর ওদের এ কাজে সাহায্য করেন মিঃ জেমস ও' কোনর। উনিই ওদের প্রোজেক্ট দেন। যেমন এবার ভানগড়ের কাজটা দিয়েছেন। সুজন যা বলছে তা মিথ্যে নয়। অভিশপ্ত ভানগড়ের ইতিহাসে রাজকন্যা রত্নাবতী 'মিথ'। তাঁর মূর্তির দাম যা হবে সেটা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। তা সত্ত্বেও এবারের প্রোজেক্টটা ঠিক ভালো লাগছে না সুরেশের। এতদিন ধরে ওরা বহু মন্দির বা গুম্ফা থেকে মূর্তি এনেছে। সেক্ষেত্রেও ঝুঁকি ছিল। কিন্তু ভানগড় সম্পর্কে যা শুনেছে, তাতে দিনের বেলাতেই সেখানে ঢুকতে ভয় লাগে! রাতে ঢোকা তো দূর!

সে আস্তে আস্তে বলে, 'তুই যাই বলিস। এবার রিস্ক ফ্যাক্টর অনেক বেশি।'

'রিস্ক ফ্যাক্টর বেশি বলেই তো টাকাটাও কয়েকগুণ বেশি হবে।' সুজন নাছোড়বান্দা, 'তা ছাড়া ঐ অভিশপ্ত হওয়ার বদনাম থাকার ফলে দুর্গের ত্রিসীমানায় রাতে কেউ আসবে

boierpathshala.blogspot.com

না। পাহারাদারও সন্ধে হতে না হতেই কেটে পড়ে। পুরো ফাঁকা মাঠ। আমাদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই!'

'সত্যিই কি কেউ নেই?' সুরেশ অন্যমনস্কভাবে বলে, 'সুজন, ওখানে কিছু তো আছে! সামথিং মিস্টিরিয়াস, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই! তা ছাড়া কারণ যাই হোক, ভূমিকম্প, তান্ত্রিকের অভিশাপ বা মোগল মোঘল আক্রমণ—যেখানে অত মজবুত রাজপ্রাসাদ, দোকান-পাট, রাস্তা-ঘাট সব একরাতের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল; সেখানে মন্দিরগুলোর কিচ্ছু হল না! ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়? তাছাড়া ইথান ওলসেনের লেখাটা পড়েছিস? উনিও কিন্তু স্পষ্ট বলেছেন, মন্দিরের মধ্যেই নেগেটিভ এনার্জি সবচেয়ে বেশি মাত্রায় আছে!'

'তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না...!' দেবযানী ফিসফিস করে বলে, 'কিন্তু অনেকেই বলে যে ভানগড় ফোর্টের মন্দিরের পাথর নাকি জীবন্ত! ওরা নিজেরাই নিজেদের ঠিক করে নিয়েছিল। যার জন্য ঐ শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরগুলোয় আজ পর্যন্ত একটা চিড়ও ধরেনি। মন্দিরগুলোর পাথর নিজেরাই নিজেদের রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারে। কোনোভাবে ভেঙে গেলে বা ফাটল ধরলে নিজেই সেসব সারিয়ে তোলে।'

কথাটা শুনে সুজনেরও দেহে মুহূর্তের মধ্যে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠে সে সজোরে হেসে বলল, 'জীবন্ত মন্দির! কীভাবে একটা পাথরের দেওয়াল নিজেকেই নিজে জোড়া দিতে পারে? অপারেশন করে?'

'তা জানি না।' দেবযানী সন্দিগ্ধভাবেই জানায়, 'কিন্তু কিছু তো রহস্য আছেই। নয়তো ভানগড় ফোর্টকে ইথানের মতো একজন বিখ্যাত বিশারদ 'মোস্ট ডেঞ্জারাস প্লেস' বলতেন না।'

শব্দটা শুনে সুজনের কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়ে। মোস্ট ডেঞ্জারাস প্লেস! সে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'ননসেন্স।'

৩

'ননসেন্স নয় স্যার।'

ছেলেটার চোখ দুটো কোটরাগত। মুখটা চোঁয়াড়ে। একটা ডবল ডেকার বাস বোধহয় ওর নাকের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। কান দুটো ইঁদুরের মতো খাড়া খাড়া! সব মিলিয়ে দেখতে মোটেই ভালো নয়। তবু ওর বিড়ালের মতো পিঙ্গল ক'টা চোখে কী যেন আছে! না, ভুল হল! বলা ভালো, ওর চোখে যা থাকা উচিত তার কোনোটাই নেই! প্রথম প্রথম ওর দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিল সুজন। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর বুঝল যে লোকটার চোখ আছে ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টি নেই! সে চোখ ভীষণ শীতল ও অভিব্যক্তিহীন। ও হাসছে ঠিকই, কিন্তু সে হাসির লেশমাত্রও ছায়া পড়ছে না ওর চোখে। চট করে দেখলে ভ্রান্ত ধারণা হয় যে, ওর চোখ দুটো বুঝি পাথরের! অথচ সে আদৌ অন্ধ নয়! এই ভানগড় ফোর্টের একজন গাইড। ওর নাম অতুল। বেশ হাসিখুশি, আলাপী ছেলে। তা সত্ত্বেও সুজন ওর উপস্থিতিতে অস্বস্তি বোধ করছিল।

'আপনারা আধুনিকমনস্ক মানুষ সাহেব। তাই এসব কথায় বিশ্বাস করেন না। ভাবেন গাঁজাখুরি।' অতুল ভানগড় ফোর্টের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। 'নাচন কী হাভেলি' তথা নর্তকীদের বাড়ি ছাড়িয়ে জহুরিবাজারের জহুরিবাজার বানান স্থানে স্থানে আলাদা। দুটোই ব্যবহার্য। যে কোনো একটায় থাকা উচিত রাস্তায় চলতে চলতে বলল, 'কিন্তু বাই'সা যা শুনেছেন, তা আমরাও সত্যি বলেই জানি। ভানগড়ের মন্দিরগুলোর মধ্যে

boierpathshala.blogspot.com

কোনো অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই আছে। নয়তো একরাতের মধ্যে রীতিমতো মজবুত একটা কেল্লা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল, অথচ মন্দিরগুলো একদম অটুট থাকল কী করে?'

সুজন, সুরেশ এবং দেবযানীর সামনে এখন টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চির-রহস্যময়, অভিশপ্ত ভানগড় দুর্গ। প্রথম দর্শনেই গা ছমছম করে উঠেছিল ওদের। যখন দূর থেকে পাহাড়ের ওপরে ভানগড়ের টানা পাথরের বিরাট পাঁচিল দেখতে পেল, তখনই মনে হয়েছিল যে এক অতিকায় সরীসৃপ বুঝি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে পাহাড়কে পেঁচিয়ে ধরে। যে মুহূর্তে তার ঘুম ভাঙবে, সেই মুহূর্তেই তার শ্লথ, বিরাট দেহ গিলে খাবে সবকিছু। অদ্ভুত এক রহস্যময়তা কুয়াশার মতো ঘিরে আছে দুর্গটাকে। সেই ইতিহাসের কুয়াশা ভেদ করে ভানগড়ের বাস্তবতাকে আজ পর্যন্ত কেউ উদ্ধার করে উঠতে পারেনি। কী ঘটেছিল সেই অভিশপ্ত রাতে! ভূমিকম্প, তান্ত্রিকের অভিশাপ না মোঘল আক্রমণ! কী করে একটা আলোকোজ্জ্বল, অপূর্ব সুন্দর নগর একরাতেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল? তার বাসিন্দাদের পরিণতিই বা কী হয়েছিল; কেউ তা আজও ঠিক করে বলতে পারেনি। আর রাজকন্যা রত্নাবতী? তিনিই বা কোথায় গেলেন?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পায়নি ওরা। গাড়িতে আসার পথে ভানগড়ের নিকটবর্তী গ্রামগুলোয় জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভানগড় ফোর্টের নাম শুনলেই স্থানীয় বাসিন্দারা কোনো কথা না বলে স্রেফ দ্রুত পায়ে কেটে পড়ে। যেন ঐ অভিশপ্ত দুর্গের নামোচ্চারণ করলেই বিপদ অনিবার্য। দু-একজন সাহসী মানুষ অবশ্য ওদের বারবার সতর্ক করেছে। বলেছে, 'ওটা বহুশতাব্দীর অভিশপ্ত 'কিলা' সাহেব। ওর থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

সুজন কৌতুহলী, 'কেন বলুন তো! কী এমন আছে ওখানে!'

'কী আছে, তা দেখিনি সাব। দেখার সাহস কোনোদিন হয়নি।' অত্যন্ত সন্তর্পণে উত্তর এল, 'কিন্তু কিছু তো আছে। ভানগড় দিনে একরকম, রাতে অন্যরকম। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছি যে রাত্রে নাকি ভানগড় জেগে ওঠে। বহু মানুষের চেঁচামেচি শোনা যায়। মেয়েদের খিলখিল হাসি, ঘুঙুরের শব্দ; আরও অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসে 'কিলা'র ভেতর থেকে।'

সুরেশ জানতে চায়; 'এসব গল্প তো তোমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা। কিন্তু নিজের কানে কিছু শুনেছ বা দেখেছ?'

'রাম! রাম!'

'সদিযেঁসে বো সবসে শাপিত কিলা হ্যায় সাব। উসসে দূর রেহেনাই আকল কা কাম হোগা।'

সুজন কৌতূহলী—'কিঁউ? ইতনা ক্যয়া হ্যায় উসমে?'

'ক্যয়া হায় বো দেখনে কী কোশিশ কভি কি নাহি। উতনা সাহস ভী হ্যায় নাহি।' অত্যন্ত সন্তর্পণ উত্তর এল—'লেকিন কুছ তো হ্যায় জরুর। ভানগড় দিন মে কুছ হ্যায়, রাত কো আউর কুছ। হামারা বুজুর্গ সে সুনে হ্যায় কী ভানগড় রাত কো জাগ উঠতি হ্যায়। বহোত সারে আদমীয়োঁ কা একসাথ চিখনে কা আবাজ সুনাই দেতা হ্যায়। ঔরতোঁ কী চিখতি হুই হাসি কী আবাজ, পায়াল কী ঝঙ্কার, অউর ভী সব ভ্যয়ঙ্কর আবাজ সুনাই দেতে হ্যায় কিলে সে।'

boierpathshala.blogspot.com

সুরেশ জানতে চায় 'ইয়ে সব বাতেঁ আপ বুজুর্গ সে সুনে হ্যায়, লেকিন আপ খুদ কভি কুছ দেখে হ্যায় ইয়া সুনে হ্যায় ক্যয়া?'

'রাম! রাম!'

লোকগুলো তৎক্ষণাৎ যেন পালিয়ে বাঁচল! ওরা প্রত্যেকেই বুঝল যে এর বেশি আর কোনো কথা গ্রামবাসীরা বলবে না। অভিশপ্ত দুর্গের ভয় ওদের ভেতরে এতটাই প্রবল যে কোনোমতেই তার সম্পর্কে কিছুই বলতে চায় না। সুজন অবশ্য ওদের ভয় দেখে অনেকটাই আশ্বস্ত হয়েছে। ভালোই হয়েছে। একটা মূর্তিকে কেটে বের করতে গেলে রীতিমতো শব্দ হয়। ম্যানুয়াল হ্যাক শ', চিজেল বা ছেনি-হাতুড়ির আওয়াজ নির্জন দুর্গে বেশ জোরে শোনা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেহেতু রাতে ভানগড়ের ত্রিসীমানায় কেউ আসে না, সুতরাং আওয়াজ হলেও ধরা পড়ার চান্স একেবারেই নেই। যদি দৈবাৎ কেউ শুনেও ফেলে, তবে ভৌতিক শব্দ ভেবে পিটটান দেবে। ফলস্বরূপ ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মতো কাজটা অতি সহজেই হয়ে যাবে।

'এখানে কি একটা বিল্ডিংও আস্ত নেই?'

দেবযানী অতুলের পেছন পেছন হাঁটছিল। চতুর্দিকে খালি হাড়-পাঁজর বের করা ধ্বংসাবশেষ আর পাথুরে দেওয়াল দেখতে দেখতে মেয়েটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। নর্তকীদের 'হাভেলি'তে স্রেফ কয়েকটা মজবুত থাম আর ভাঙা পাথরের চাঁই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। জহুরিবাজার হয়তো কোনোসময়ে জমজমাট কোনো বাজার ছিল। এখন শুধু ভাঙা পাথরের অবশেষ সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। দেবযানী যথারীতি প্রথমে আপত্তি করলেও টাকার অঙ্কটা শুনে রাজি হয়ে গিয়েছে। তবে সুজনকে এ-ও বলে রেখেছে যে এই কাজটা করার পর সে এ পেশা ছেড়ে দেবে। যে টাকাটা ও পাবে, তা দিয়ে কোনো ব্যবসা শুরু করবে। সুরেশেরও প্ল্যানিং তেমনই।

'আছে তো! এই দেখুন, 'মোরোঁ কী হাভেলি।'

ওদের গাইড অতুল সামনের একটি দালান দেখিয়ে বলল, 'রাজকন্যা রত্নাবতী ময়ূর পুষতেন। সেজন্য ময়ূরদের একটা হাভেলিই তৈরি করা হয়েছিল। এখন অবশ্য ওখানে ময়ূর থাকে না। বাদুড়-চামচিকেরা ওখানেই ঘাঁটি বানিয়েছে।'

দেবযানীর ঠিক পেছনেই সুরেশ হাতে হাই ডেফিনিশন ক্যামকর্ডার নিয়ে হাঁটছিল। সে এখন ভানগড়ের দৃশ্য ক্যামেরায় তুলতে ব্যস্ত। কথাটা শুনেই ফোড়ন কাটল, 'রাজকীয় শখ! মানুষের জায়গা হয় না; আবার ময়ূরের জন্য আস্ত হাভেলি!'

'তা বটে স্যার!' বলতে বলতেই অতুল মূল রাজপ্রাসাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, 'ঐটা ছিল রাজপ্রাসাদ। এখন তো দেখছেনই, তেমন কিছুই নেই! শুধু রত্নাবতীর মহলটা কোনোমতে টিকে আছে।'

সুজনের অবশ্য অত মহল-টহল নিয়ে বিশেষ উৎসাহ নেই। সে মন্দিরগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছিল। ভানগড়ের চতুর্দিকে মন্দিরের ছড়াছড়ি! এবং আশ্চর্যভাবে সেগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত! মেইন গেট দিয়ে ঢোকার সময়ই শ্বেতপাথরের তৈরি হনুমান মন্দির দেখেছে। সেখানে একজন পূজারিও আছেন। কিন্তু শ্বেতপাথরের হনুমানের বিগ্রহ তাকে তেমন আকর্ষণ করেনি। এ ছাড়াও দেখেছে সোমেশ্বরের মন্দির, মঙ্গলাদেবী মন্দির, নবীন মন্দির এবং গণেশমন্দির। পরের মন্দিরগুলো এখন ফাঁকা। বিগ্রহও নেই। দেওয়ালে কিছু ভাস্কর্য আছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলো তেমন জাঁকালো কিছু নয়। সে সতর্ক দৃষ্টিতে

boierpathshala.blogspot.com

চতুর্দিকটা দেখছিল। অর্জুনের পাখির চোখের মতো তারও এখন একটাই লক্ষ্য। গোপীনাথ মন্দির ও রত্নাবতীর আদলে তৈরি দেবীমূর্তি!

বেশ কিছু সঙ্কীর্ণ পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে রত্নাবতীর মহলে ঢুকতে না ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা ও চামচিকের চিমসে গন্ধ ওদের ঘিরে ধরল। মহলের ভেতরে কয়েকটি ঘর এখনও অবশিষ্ট আছে। পাথরের মজবুত মহলগুলো কিছু গোপন ইতিহাস বুকে নিয়ে টিকে রয়েছে। বাকিটা ধ্বংসস্তূপ। দেখলেই কেমন যেন অলৌকিক অনুভূতি হয়! হাড়-পাঁজর বের করা দেওয়াল, কালো কালো ছোপওয়ালা ছাত যেন কিছু বলতে চাইছে! সুরেশ দুর্গটাকে যত দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে! আপাদমস্তক পাথরে তৈরি এই দুর্গকে কামানের গোলাও ভাঙতে পারত না। তবে কী এমন শক্তি এই মজবুত দুর্গকে একেবারে আগাপাশতলা দুমড়ে মুচড়ে দিল কে জানে!

দেবযানী লক্ষ করল, রত্নাবতীর ঘরে একটি পাথরের তাকের ওপরে সাজানো রয়েছে প্লাস্টিকের চিরুনি, কাচের চুড়ি, পুঁতির হার আর ঝাঁঝর! অতুল তার কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ করে হাসল।

'ওগুলো স্থানীয় বাসিন্দারা রেখে গিয়েছে বাই'সা। ওদের বিশ্বাস রাজকন্যা রত্নাবতীর আত্মা এখনও এই দুর্গে ঘুরে বেড়ায়। তাই তাঁর শৃঙ্গারের সরঞ্জাম রেখে যায় ওরা।'

সুরেশ ক্যামকর্ডার দিয়ে এতক্ষণ ভিডিও তুলতেই ব্যস্ত ছিল। কথা নেই, বার্তা নেই আচমকা তার নাকের সামনে দেবযানী এসে হাজির! পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে খোলা জানলা দিয়ে কী যেন দেখছে সে! ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়েছে তার অপূর্ব ঘন কালো লম্বা চুল! হাওয়ায় সেই রেশমী চুল অল্প অল্প উড়ছে! বেচারি সুরেশ মন দিয়ে মহলের ভিডিও তুলছিল, এরকম বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'অ্যাই দেবযানী, সামনে থেকে সর! তোর এলোকেশী রূপ তোলার জন্য আমি মোটেও ভিডিও তুলছি না!'

'কীসব ভুলভাল বকছিস!' সুরেশের পেছন থেকে শোনা গেল দেবযানীর শাণিত কণ্ঠস্বর, 'আমি তো তোর পেছনে। তা ছাড়া এলোকেশী মানে? আমি রীতিমতো টপনট বেঁধে রেখেছি।'

'হো-য়া-ট!'

সুরেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো পেছনে ঘোরে! তার দু-চোখে গভীর বিস্ময়! তাই তো! দেবযানী আদৌ তার সামনে নেই, বরং ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যামেরায় ওর ইমেজ আসা সম্ভবই নয়। তবে একটু আগে সে ক্যামেরায় যাকে দেখল, সে মেয়েটি কে! সে তৎক্ষণাৎ সামনের দিকে ফিরল! কই! সামনে কেউ নেই তো! কোথায় সেই এলোকেশী যে একটু আগেই লেন্সের একদম সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল! নেই!

সুরেশ তার বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত ভয় টের পেল। তার বিস্মিত দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল দেবযানীর মাথার চুল। সত্যি! সে একদম শক্ত করে টপনট বেঁধেছে। তবে সেই মেয়েটি কে যে একেবারে কোমর ছাপানো ঘন মেঘের মতো একরাশ কাজলকালো চুল নিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল! অথচ দেবযানী ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোনো নারী এ ঘরে নেই! অন্য ট্যুরিস্ট পার্টির কোনো সদস্যা হতে পারত। কিন্তু সেকেন্ডের ভগ্নাংশে সে তবে গেল কোথায়! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!

সুজন দেখল সুরেশের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সে জানতে চায়, 'কী হল রে! আর ইউ ওকে?'

boierpathshala.blogspot.com

সুরেশ তখন রীতিমতো ঘামছে। সে রিওয়াইন্ড করে একটু আগের তোলা ভিডিও ফুটেজটা দেখল! আশ্চর্য! সেখানে কোনো নারীই নেই! পাগলের মতো ফুটেজের মধ্যে সেই অদেখা মেয়েটিকে খুঁজছে যার শুধু পেছনটাই ধরা পড়েছিল তার চোখে। কিন্তু কোথায়! কেউ নেই! শুধু রত্নাবতীর মহলের দৃশ্যই রয়েছে। আর কেউ নেই! কিছু নেই!

সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই চেপে গেল। যদিও তখন তার বুকের ভেতরে হৃৎস্পন্দন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে, তবু নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে। ঢোঁক গিলে বলল, 'আই অ্যাম ফাইন।'

তার অবস্থা দেখে গাইড অতুল যেন একটু ব্যঙ্গবঙ্কিম হাসল। তার হাসিটা বেশ অর্থপূর্ণ ও রহস্যময়। সে আস্তে আস্তে বলে, 'চলুন স্যার। এবার গোপীনাথ মন্দিরটা দেখে নিন। ওটা অবশ্য তালা দেওয়া থাকে। ভেতরের গর্ভগৃহে যেতে পারবেন না। তবে বাইরে থেকে দেখতে পাবেন। তাছাড়া সন্ধ্যা হয়েও আসছে। আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।'

'ভেতরে কেন যাওয়া যাবে না?' সুজন আগ্রহ চেপে রাখতে পারে না,'অন্যান্য মন্দিরগুলো তো খোলা ছিল।'

অতুল মৃদু হাসে, 'আসলে গোপীনাথ মন্দিরে রাজকন্যা রত্নাবতীর আদলে তৈরি একটি অতুলনীয় দেবীমূর্তি আছে। অনেক মূর্তিচোরের ওর ওপর নজর ছিল। বেশ কয়েকবার মূর্তিটা ভেঙে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। তাই সরকার থেকে মন্দিরটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

'কেউ মূর্তিটাকে চুরি করতে পারেনি?'

'নাঃ!' সে বলল, 'চেষ্টা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বললাম না—এ মন্দিরগুলো সব জাগ্রত! চোরেরা ভাঙার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মন্দিরের পাথরগুলো নিজেই সেইসব ভেঙে যাওয়া অংশ মেরামত করে নিয়েছে। এ পাথর মেরামতি করার ওষুধ জানে স্যার। এ পাথরে প্রাণ আছে।'

সুজন স্থিরদৃষ্টিতে গাইডের দিকে তাকায়। ওর হঠাৎ মনে হল, এই ছেলেটা বোধহয় জানে যে ওরা কী উদ্দেশ্যে এসেছে! ওর ঠোঁটের কোণের হাসিটা ভীষণ রহস্যময়! তা ছাড়া মুখটাও কেমন যেন চেনা চেনা। সে চোখ কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকায়। আগে কোথাও ওকে দেখেছে কি?

'একটা কথা বলব?' অতুল তার পাথরের মতো শীতল চোখ দুটো সুজনের চোখের ওপর রাখল। তারপর গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে অনুরোধের সুরে বলল, 'আর যাই করুন, মূর্তির গায়ে ভুলেও হাত দেবেন না স্যার। প্লিজ, ওটা করবেন না।'

'মানে?'

তিনজনই একসঙ্গে যেন তড়িদাহতের মতো কেঁপে ওঠে। কী বলতে চাইছে অতুল! ও কী অন্তর্যামী! সুজন নিজেকে সামলে নিয়ে রুক্ষ কণ্ঠস্বরে বলে,'কী সব উলটোপালটা বলছ! হাউ ডেয়ার ইউ!'

অতুল তখনও তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দেবযানীর গা শিরশিরিয়ে ওঠে। ও লক্ষ করল, ছেলেটা একবারও চোখের পলক ফেলে না! ওর দৃষ্টি একদম স্থির! অবিকল পাথরের চোখের মতো!

'চলুন। গোপীনাথ মন্দিরটা দেখে নিই।' অতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; 'সন্ধে হয়ে আসছে। রাত হয়ে গেলে আবার কী হয় ঠিক নেই!'

boierpathshala.blogspot.com

ভানগড় ফোর্ট থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ওরা কোনো কথা বলল না। দেবযানী তার স্বভাবগত প্রগলভতা যেন ভুলে গিয়েছে। সুরেশ তখনও বারবার রানি রত্নাবতীর মহলের ভিডিওটা দেখছে। আর সুজনের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ। তার চোখ দুটো অন্যমনস্ক। নিবিষ্ট চিত্তে কী যেন ভেবে চলেছে সে।

ওদের গাড়ির ড্রাইভারের নাম দীননাথ। সে ভানগড় ফোর্ট থেকে তিন কিলোমিটার দূরের একটা গ্রামে থাকে। ওরা তিনজন দীননাথের বাড়িতেই থাকবে। তেমনই ব্যবস্থা হয়েছে। দীননাথও মিঃ ও' কোনরেরই লোক। একরকম এজেন্টই। এমনিতে সাধারণ দর্শন এক যুবকই বটে, কিন্তু অত্যন্ত চটপটে ও বুদ্ধিমান। দুর্গ থেকে ফেরার পথে সে-ই ওদের মধ্যে প্রথম মুখ খুলল। হেঁড়ে গলায় জানাল, 'স্যার, ম্যাডাম; আপনাদের থাকার ব্যবস্থা আমার বাড়িতেই হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হোটেলের আরাম, বিলাস-ব্যসন কিন্তু পাবেন না। জলের অভাব আছে। আর খাওয়াদাওয়া আমার বাড়িতেই হবে, তবে খাওয়ার খরচ আলাদা। আগেই বলে রাখলাম। পরে বাহানা করবেন না।'

সুজন কথাটা শুনেও পাত্তা দিল না। ওরা এখানে বেড়াতে আসেনি। বরং একটা গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজে এসেছে। ফাইভ স্টার হোটেলের অ্যাকোমোডেশন না পেলেও চলবে। সুরেশ কথাটা শুনল কিনা কে জানে! সে তখনও ভিডিও ফুটেজটাই বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে চলেছে। খুব নিস্পৃহভাবে একটা আলগা 'হুঁ' বলে ফের ফুটেজে মন দিল। একমাত্র দেবযানীরই ভুরু অসন্তোষে বেঁকে যায়। সে যথারীতি বিরক্ত, 'কেন? আশেপাশে কোনো ভালো হোটেল নেই?'

'হোটেল?' দীননাথ ফিক করে হাসল, 'এ কী গোয়ার সমুদ্র পেয়েছেন বাই'সা যে হাতের কাছেই হোটেল পাবেন? দিল্লি থেকে দুশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছেন আপনি। এটা ভানগড় ফোর্ট! হোটেল তো দূর;এর ত্রিসীমানায় কোনো গ্রামই নেই! সব শুনশান!'

'সে কী!' দেবযানী অবাক, 'ফোর্টের আশেপাশেই তো কিছু ঘর দেখলাম যেন মনে হল!'

সে বিষণ্ণভাবে মাথা ঝাঁকায়, 'হ্যাঁ। শুধু ঘরই আছে। কিন্তু লোক দেখেছেন কি? দেখবেন না। কারণ লোক নেই। ঘরগুলোও সব ভাঙা ও পরিত্যক্ত!'

'সে কী! কেন?'

দীননাথ একমুহূর্তের জন্য কী বলবে ভেবে পায় না। তারপর একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে, 'কী জানি বাই'সা। বেশ কয়েকবার কিছু মানুষ ফোর্টের ধারেকাছে গ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনোবারই টেঁকেনি। গ্রামের সব ঘর হয় আচমকা ভেঙে পড়ে; নয়তো মহামারিতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়! শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে প্রাণের দায়ে মানুষেরা এখান থেকে চলে গিয়েছে। ঘরগুলো বহুবছর ধরে পরিত্যক্তই পড়ে রয়েছে। ওখানে কেউ থাকে না।'

'কেন?' দেবযানী কৌতূহলী, 'হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, আচমকা ঘর ভেঙে যাবে কেন? ঝড়-টড় বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ...।'

'কিচ্ছু না বাই'সা।' দীননাথ সংশয়ান্বিত; 'বিশ্বাস করুন। আজ পর্যন্ত এখানে কেউ বাস করতে পারেনি। যেমন ভানগড় কী কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল,সেটা আজও অজানা রয়ে

boierpathshala.blogspot.com

গিয়েছে, তেমনি তার আশেপাশের গ্রামগুলোও কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাও কারোর জানা নেই। সবাই বলে যে ভানগড়ের অভিশাপের ছায়া নাকি আজও গ্রামগুলোর ওপর কায়েম আছে।'

'কার অভিশাপ?'

খুব অন্যমনস্কভাবে প্রশ্নটা করল সুজন। তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একঝলক দেখে নিল দীননাথ। আস্তে আস্তে বলল, 'কী বলব স্যার, অনেকরকম কথাই আছে। কিন্তু যত গল্প আছে তার সবক'টার মধ্যে একটা জিনিসই এক। অভিশাপ আর ব্ল্যাক ম্যাজিক। যেটা সবচেয়ে ফেমাস সেটা তো জানেনই। রত্নাবতী আর তান্ত্রিক সিঙ্ঘিয়ার কালোজাদুর গল্প। সিঙ্ঘিয়া পাথর চাপা পড়ে মরেছিল। আর তার অভিশাপেই নাকি ভানগড় ধ্বংস হয়। অনেকেই বলে, সিঙ্ঘিয়া আর রত্নাবতীর আত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায়। এখনও ওঁদের মুক্তি হয়নি। এ ছাড়াও আরেকটা গল্পও আছে।'

'কীরকম?' দেবযানী কৌতূহলী।

দীননাথ আস্তে আস্তে বলে, 'ভানগড়ের প্রতিষ্ঠাতা মাধো সিং যেখানে ভানগড় দুর্গ তৈরি করছিলেন তার একটু কাছেই গুরু বালুনাথ নামের এক সন্ন্যাসী থাকতেন। মাধো সিং গুরু বালুনাথের কাছে ফোর্ট তৈরি করার অনুমতি চান। বালুনাথ অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর একটা শর্ত ছিল। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, দুর্গ তৈরি হলেও রাজপ্রাসাদের ছায়া যেন তাঁর সাধনপীঠে না পড়ে। যদি কোনোভাবে মহলের ছায়া তাঁর ধ্যান করার জায়গায় এসে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ ভানগড় ধুলোয় মিশে যাবে।' বলতে বলতেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'মাধো সিং কথা রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী শাসকেরা গুরু বালুনাথের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। রাজমহল বহরে বাড়তে থাকে। আর যথারীতি তার ছায়া গুরু বালুনাথের সাধনপীঠের ওপর পড়ল। সেই রাতেই নাকি ভানগড় শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

'রিয়েলি?' সুজনের কথায় ব্যঙ্গের সুর মিশল, 'তাহলে আসল অভিশাপের মালিক কে? সিঙ্ঘিয়া না বালুনাথ?'

দীননাথ হাসল, 'সেটা বলা মুশকিল স্যার! লোকে অনেকরকম কথাই বলে। আমি নিজেই ছোটবেলা থেকে অন্তত দু-তিনটে গল্প শুনে এসেছি যার মধ্যে এ দুটোই ফেমাস। গুরু বালুনাথের কথা সত্যি হলেও হতে পারে। কারণ ঐ ভাঙা দুর্গে তাঁর সমাধিও আছে। তবে আরও দুটো কারণ শুনেছি।'

'মোঘল আক্রমণ; রাইট?'

সে মাথা ঝাঁকায়, 'হ্যাঁ স্যার। কেউ কেউ বলে মোঘল আক্রমণের ফলে ভানগড়ের সর্বনাশ হয়। আবার কেউ বলে ভানগড়ের প্রতিবেশী রাজ্য আজবগড়ের সঙ্গে যুদ্ধে ভানগড় বিলুপ্ত হয়। কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক জানি না!'

'থ্যাঙ্ক গড!' সুজন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'অন্তত দুটো কারণ তো পাওয়া গেল যা যুক্তিযুক্ত। নয়তো ব্ল্যাক ম্যাজিক, অভিশাপ আর জ্যান্ত মন্দিরের ঠ্যালাতেই তো চোখে অন্ধকার দেখছিলাম!'

'হাল্কাভাবে নেবেন না স্যার।' দীননাথ চাপাস্বরে বলে, 'আমাদের গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা বলেন, রাত হলেই নাকি ভানগড় জেগে ওঠে। আবার সেই অতীতে ফিরে যায়। যা যা ভেঙে গেছে, সব গড়ে ওঠে। রাজমহল সেজে ওঠে। সেজে ওঠে জহুরিবাজারও।

boierpathshala.blogspot.com

আর প্রেতাত্মারা নাকি ঘুরে বেড়ায়! বাইরে থেকে অনেকেই নাকি মেয়েদের হাসি, গান-বাজনা, ঘুঙুরের আওয়াজ শুনেছে!'

সুজন এককথায় উত্তর দিল, 'রাবিশ!'

'কিন্তু ভানগড়ের সামনে ঐ বোর্ড? আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ঐ বিরাট নিষেধাজ্ঞাটা তবে কেন আছে? কেন সন্ধে না হতেই সরকার ফোর্টের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়?'

দেবযানীর সংশয় তবু কাটে না। সুজন মৃদু হাসল, 'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? ভানগড়ের লোকেশনটা দ্যাখ! ফোর্টটা আরাবল্লির 'সরিস্কা টাইগার রিজার্ভের' বর্ডারে! ফোর্টের চতুর্দিকে এত জঙ্গল যে সেখান থেকে বন্যপ্রাণী যখন-তখন চলে আসতে পারে! আর সন্ধের পরেই সচরাচর বাঘ বা অন্যান্য মাংশাসী প্রাণীরা বেরোয়। সেজন্যই ট্যুরিস্টদের সেফটির কথা ভেবেই বোর্ড আর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ভূতের জন্য নয়! বুঝেছিস? ভানগড়ের আশেপাশের গ্রামগুলোও গড়ে উঠতে পারেনি সম্ভবত ঐ কারণেই। নিরাপত্তার অভাব। কোনো অভিশাপ-টাপ নয়। ওসব স্রেফ গল্প।'

দেবযানী কী বুঝল কে জানে। তবে তার মুখ দেখে খুব আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হল না। সুরেশ এতক্ষণ ভিডিও ফুটেজ দেখতেই ব্যস্ত ছিল। এবার মুখ তুলে বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন?'

'গোলা কা বাস।' দীননাথ উত্তর দেয়, 'আমার গ্রামে। ওখানেই আজকের দিনটা রেস্ট নেবেন। যা করার কাল রাত থেকে শুরু করবেন। তবে আমি আর আপনাদের গাড়ি করে পৌঁছে দিতে পারব না। গোলা কা বাস থেকে পায়ে হেঁটেই আপনাকে ভানগড় দুর্গে আসতে হবে। ট্যুরিস্টরাও বেশিরভাগ তাই-ই আসে।'

'হুঁ।'

একটা আলতো উত্তর দিয়ে ফের চিন্তামগ্ন হয়ে গেল সুরেশ। সে তখনও ভেবে চলেছে; ক্যামেরায় যে মেয়েটাকে সে পেছন থেকে দেখেছিল সে কে! কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেল! আদৌ ঠিক দেখেছে? না পুরোটাই ভ্রান্তি! যদি সত্যিই ওখানে কোনো মেয়ে থাকত তাহলে রেকর্ডেড ফুটেজে তাকে নিশ্চয়ই দেখা যেত। কিন্তু ফুটেজে কেউ নেই! তবে?

দেবযানী আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সুজনের মুখের হাল্কা হাসিটাও মিলিয়ে গিয়েছে। সে ও বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছে। তার মনেও একটা চিন্তাই বারবার ঘাই মেরে উঠছে।

অতুলকে অত চেনা চেনা লাগছিল কেন? আগে কোথাও দেখেছে কি? কোথায়!

৫

আজ পূর্ণিমার রাত। রুপোলি জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভেসে যাচ্ছে। পূর্ণ চাঁদের আলো মায়াবী আভায় ধুইয়ে দিচ্ছে ভানগড় ফোর্ট সংলগ্ন অরণ্যকে। আরাবল্লির পাথুরে দেহও চিকচিক করে ওঠে জ্যোৎস্নার ইশারায়। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। গাঢ় নীল প্রেক্ষাপটে টুপটুপ করে চোখ মেলছে নক্ষত্রের দল। দেখলেই মনে হয়, একরাশ অভ্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আকাশের বুকে। তাদের জ্যোতি যতটা শান্ত, ঠিক ততটাই রহস্যময়! যেন বহু আলোকবর্ষের মন্তব্য, আলোকবর্ষ দূরত্বের মাপ সময়ের নয় অভিজ্ঞতা নিয়ে উদগ্র

boierpathshala.blogspot.com

কৌতূহলে তাকিয়ে আছে! বুকের মধ্যে চাপা আশঙ্কার আগুন জ্বলছে তাদের; কে জানে, কী হয়!

আপাতত চতুর্দিকে ছায়া ছায়া মহিরুহের নিশ্চুপ উপস্থিতি। প্রাচীন গাছগুলো যেন রাজকীয় দম্ভভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখনও কখনও মৃদু হাওয়া শিরশির করে উঠে তাদের পাতায় পাতায় দুর্বোধ্য কিছু সংলাপ বিনিময় করছে। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই! চারিদিক থমথম, নিশ্চুপ! কখনও কখনও মনে হয় গাছের ফাঁক দিয়ে বুঝি কোনো ছায়া সাঁত করে সরে গেল! আশঙ্কা হয়, এই নিঃঝুম রাত্রির পেছনে হয়তো কোনো রহস্যাবৃত অন্ধকার ওঁত পেতে আছে! এখনই সমস্ত নীরবতাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে আসবে! সে এক প্রবীণ অন্ধকার। যে সব কিছু জানে, সব কিছু দেখেছে!

ঠিক তার মাঝখানেই প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মতো বিরাট কলেবর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুখ্যাত ভানগড় ফোর্ট। দাম্ভিক, রহস্যময় অথচ ভীষণ বিষণ্ণ! দুর্গ নয়, ইতিহাসের হাহাকার! ভানগড়ের রাজমহলের ঠিক মাথার ওপরেই রুপোর থালার মতো ষোড়শী চাঁদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু দেখলেই মনে হয়, সে বড় ভয়ে ভয়ে উঁকি মারছে। চাঁদের আলো এসে ছুঁয়েছে ভানগড়ের ভাঙাচোরা দেহ। পেশিবহুল হাতের মতো পাথুরে প্রাচীর এলিয়ে আছে হতাশায়। জ্যোৎস্নাও যেন তার স্বভাবগত চাপল্য হারিয়ে ফেলেছে ভানগড়ের রাজমহলকে স্পর্শ করে। তার উচ্ছ্বাসিত আলো দুর্গের কাছে এসেই বিষণ্ণতায় হারিয়ে গিয়েছে। জ্যোৎস্না নয়, যেন এক ফ্যাকাশে পিঙ্গল বিষণ্ণতা চুঁইয়ে পড়ছে ভানগড় ফোর্টের পাথুরে শরীর থেকে। চতুর্দিকে শুধু খাঁ খাঁ করা শূন্যতা! ধ্বংসস্তূপগুলো এক বিরাট কঙ্কালের হাড়-পাঁজরের মতো পড়ে রয়েছে। পাথরের জানলা, দরজাগুলো হাঁ করে রয়েছে ক্ষুধার্ত মানুষের মতো। অপেক্ষা করছে একবিন্দু সুখের। পেলেই যেন গিলে নেবে গোটা বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত সুখ, সমস্ত আনন্দকে। অথচ শূন্যতা ছাড়া তার পাওয়ার আর কিছুই নেই! সেই শূন্যতাকে পূর্ণতা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে জ্যোৎস্নার আলো! কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে। তার স্তিমিত আভা গিলে নিচ্ছে জমাট অন্ধকার। চতুর্দিকের থমথমে নৈঃশব্দ্য যেন মুখর হয়ে বলে উঠতে চাইছে, 'এ দুনিয়া জীবিত মানুষের জন্য নয়! এ দুনিয়া জাগতিক কোনো অনুভব বা বস্তুর জন্য নয়! এ অন্য পৃথিবী!'

'লুকস ক্রিপি!' সুরেশ একটা শ্বাস টেনে বলল, 'কেমন অদ্ভুত লাগছে না দুর্গটাকে? হরর মুভি শুযট করার জন্য আইডিয়াল!'

ওরা তিনজন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গের মেইন গেটে। দেবযানী একঝলক ভানগড়ের বিরাট বহরটাকে মেপে নিল। দিনের বেলাতেই দুর্গটা দেখলে খুব অস্বস্তি হয়। এখন অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও অনুভব করল সে। এই সেই ভানগড়! সেই কুখ্যাত ঐতিহাসিক স্থল, যেখানে নাকি আজও অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়! এই সেই অভিশপ্ত কেল্লা যার সম্পর্কে স্বয়ং ডঃ ইথান ওলসেন লিখেছেন; 'মোস্ট ডেঞ্জারাস প্লেস!'

সুজনের অনুভূতিটা অবশ্য অন্যরকম। তার বুকের মধ্যে একটা অজ্ঞাত গভীর বেদনা জমেছে। এই বেদনার কোনো উৎস নেই! ভানগড়ের দৃশ্যটা দেখে হঠাৎই তার মনে হল; দুনিয়ায় আনন্দ বলে আসলে কিছুই নেই! 'সুখ', 'আশা', 'স্বপ্ন' নামের কোনো বস্তু আসলে হয় না! ওসব মরীচিকা!

অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়! একটু আগেও সে অর্থপ্রাপ্তির কথা ভেবে উত্তেজিত ছিল। কিন্তু আচমকাই সেই উত্তেজনার বদলে এক অদ্ভুত হতাশা ঘিরে ধরল তাকে। কেন? কারণটা অজ্ঞাত!

boierpathshala.blogspot.com

সুরেশ ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। দেবযানী ও সুজন ভানগড়ের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। লাইটারের আলোর ঝিলিকে সম্বিত ফিরে পেল। সুরেশ আয়েশ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল; 'কাজ শুরু করা যাক।'

'শিওর।'

এতক্ষণে সুজন নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পেয়েছে। সে তার হাতের এমার্জেন্সি লাইটটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে দুর্গের গেটের তালা খুলতে মন দিল। বলাই বাহুল্য যে এই ডুপ্লিকেট চাবিটা ওদের দীননাথ এনে দিয়েছে। এমনকি গোপীনাথ মন্দিরের তালার চাবিও সে দিয়ে দিয়েছে। কোথায় পেল জিজ্ঞাসা করতেই মৃদু হেসেছিল সে। মুচকি হেসে জানিয়েছিল, 'টাকা ছড়ালে বাঘের দুধও পাওয়া যায় স্যার; এ তো সাধারণ কয়েকটা চাবি!'

ওরা আর কথা বাড়ায়নি। স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে মিঃ জেমস ও' কোনর এই প্রোজেক্টের জন্য প্রচুর টাকা ছড়িয়েছেন। দীননাথও সেই হরির লুট থেকে বাদ যায়নি। চাবিগুলো সেই ইনভেস্টমেন্টেরই ফলাফল। তাই নির্বিবাদে দুটো চাবিই নিয়ে নিয়েছিল।

গেটের তালা খুলতে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হল না। সুজন তালায় চাবিটা ঢোকাতে না ঢোকাতেই প্রাচীন ও বিরাট তালাটা সশব্দে কড়াৎ করে খুলে গেল! দেবযানী অবাক হয়ে বলল, 'ওয়াও! সো ফাস্ট! এত তাড়াতাড়ি তো আমার বাড়ির তালাও খোলে না! আর এটা তো বহু পুরোনো তালা! ফ্র্যাকশন অব সেকেন্ডে খুলে গেল!'

এমার্জেন্সি লাইটের আলোয় সুজনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সে নিজেও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। সুরেশ সেটা লক্ষ করেই বলে, 'কী হল? এনিথিং রং?'

সুজন একটু ইতস্তত করে বলল, 'বুঝতে পারছি না তালাটা এত তাড়াতাড়ি খুলল কী করে!'

'মানে!!!'

দেবযানী ও সুরেশ দুজনেই একসঙ্গে শব্দটা বলে ওঠে। ওদের দিকে তাকিয়ে একটু নার্ভাস হাসি হাসল সুজন, 'নট আ বিগ ডিল! কিন্তু আমি সবে চাবিটা ঢুকিয়েছিলাম। ঘোরাইনি। ঘোরানোর আগেই তালাটা এরকম শব্দ করে খুলে গেল! স্ট্রেঞ্জ!'

ওরা তিনজনেই তিনজনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর সুরেশ সশব্দে হেসে ওঠে, 'এর মধ্যে স্ট্রেঞ্জের কিছু নেই। তালাটা দেখেছিস? বহুদিনের মরচে পড়া তালা। দেখতেই অমন জগদ্দল, আসলে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গিয়েছে। ওটার জন্য চাবি লাগে না। আমার ধারণা তুই স্রেফ একটা টান মারলেই ওটা খুলে যেত। চাবির দরকারই ছিল না।'

'হয়তো।'

সুজন আর বিশেষ পাত্তা দিল না। চাবি সমস্যার সমাধান করা ছাড়া তার এখনও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। যে কাজটা ওরা করতে এসেছে সেটাতেই মনোনিবেশ করা ভালো। এমনিতেই এ জাতীয় দুর্গে মূর্তি কাটার কাজটা যথেষ্টই পরিশ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। ড্রিল বিটস বা গ্রাইন্ডিং স্টোনের মতো অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার উপায় নেই। কারণ ওগুলো ব্যবহার করতে হলে ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় পরিত্যক্ত দুর্গে যা সম্ভবই নয়। আর জেনারেটর ঘাড়ে করে নিয়ে মূর্তি

boierpathshala.blogspot.com

কাটতে যাওয়ার কনসেপ্ট নিতান্তই হাস্যকর! সুতরাং ওদের পুরোনো ও সনাতন পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ ছেনি-হাতুড়িই ভরসা।

আপাতত তিনজনের কাঁধেই তিনটে ভারী ব্যাক-প্যাক ঝুলছে। তার মধ্যে রয়েছে চিজেল বা ছেনি, হাতুড়ি, এচিং টুলস, মার্কার, ম্যানুয়াল হ্যাক শ'-এর মতো 'ভ্যান্ডালস টুলস'। এ ছাড়াও আছে টর্চলাইট, মেজারিং টেপ, নাইট ভিশন হাই ডেফিনিশন গগলস, ডাস্ট মাস্ক, সেফটি গগলসের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সুজনের ব্যাকপ্যাকে অবশ্য এসব ছাড়াও একটি লাইসেন্সড গান রয়েছে। রাত্রে কোনো প্রেতাত্মা আসবে কি না জানে না, কিন্তু বন্যপশুর আসার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আজ রাতে ওদের দীননাথ পৌঁছে দেয়নি। গোলা কা বাস থেকে তিন কিলোমিটার হেঁটেই এসেছে ওরা। হেঁটে আসাটা খুব বড় ব্যাপার নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওদের হেঁটেই অপারেশনে যেতে হয়। কিন্তু ভানগড় ফোর্টের পথটা একটু আলাদা। একেই শুনশান পাহাড়ি রাস্তা, তার ওপর বন্যজন্তুর ভয়। তাই লাইসেন্সড রিভলবারটা সঙ্গেই নিয়েছে সুজন।

ভানগড় ফোর্টের পাথুরে রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সুজন। পেছনে সুরেশ আর দেবযানী। সুজনের স্মৃতিশক্তি প্রায় কম্পিউটারের মতো। কোনো জায়গা একবার দেখলে সে ভোলে না। অতুল যখন ওদের গোপীনাথ মন্দিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে গোটা রাস্তাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জরিপ করে নিয়েছে। অবশ্য সঙ্গে ভানগড়ের ম্যাপটাও আছে। অতুল ওদের হনুমান গেট দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। একটু এগোতেই হনুমান মন্দিরটাও চোখে পড়ল। তবে এখন মন্দির বন্ধ। অর্থাৎ পূজারিও অনুপস্থিত। অতুলই জানিয়েছিল, সন্ধে ছ'টার পর এখানে আর কেউ থাকে না। এমনকী গেটকিপারও নয়। তাই ভানগড় এখন সম্পূর্ণ জনশূন্য।

অতুল ওদের একটু ঘুরপথে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুজন সোজা পথটাই ধরল। হনুমান মন্দির একটু ছাড়িয়ে যেতেই ডানদিকে পড়ল সেই ভগ্নস্তূপ। এখানে কী ছিল, ভগবানই জানেন। কোনো মহল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু আগের দিন যেটা তেমন প্রকটভাবে অনুভব করেনি, রাতের বেলায় সেটাই প্রবলভাবে দেখা দিল! একটা চূড়ান্ত দুর্গন্ধ এসে ঝাপ্টা মারল ওদের নাকে! প্রথমদিকে অতটা বোঝা যায়নি, কিন্তু যত এগোচ্ছে, দুর্গন্ধটা ততই বাড়ছে। বাঁ দিকে 'মোরোঁ কী হাভেলি' এসে পড়তেই সেই পচা গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল ওদের। পাকস্থলীর ভেতরটা যেন পাক দিয়ে উঠল!

'ওঃ!' দেবযানী আর থাকতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গেই মুখে রুমাল চাপা দেয়, 'কী জঘন্য গন্ধ! এ তো ক্রমশই বাড়ছে! আগে জানলে পারফিউম নিয়ে আসতাম!'

সুরেশ হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নাক কুঁচকোয়, 'এ কীরকম দুর্গন্ধ রে! কাল দিনের বেলায় তো পাইনি!'

'আশেপাশে কোনো ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণী মরেছে বোধহয়!' সুজন কিন্তু নিস্পৃহ, 'তারই পচা গন্ধ পাচ্ছিস।'

'টেরিব্ল স্মেল! মরা ইঁদুরের গন্ধ এত মারাত্মক!' দেবযানী কোনোমতে নিজেকে সামলায়, 'আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছে।'

সুরেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'উঁহু! কোনো মরা ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণীর পচনের গন্ধ এরকম হয় না। আমি এই গন্ধটা চিনি! মনে হয় যে...!'

'কী মনে হয়?'

boierpathshala.blogspot.com

সুজনের প্রশ্নে সে একটু থমকে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যদিও প্র্যাকটিক্যালি ব্যাপারটা অসম্ভব, তবু মনে হয় যে এক নয়, একাধিক মানুষ মারা গিয়েছে। আর তারই এত দুর্গন্ধ! আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা গোটা ফ্যামিলি আত্মহত্যা করেছিল। প্রথমে কেউ নোটিশ করেনি। তোর মতোই সবাই ভেবেছিল যে কোনো জীব-জন্তু মরেছে। কিন্তু দু-দিন পরেই দুর্গন্ধের চোটে সবার টনক নড়ল। তখন পাশের ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে...!'

'তুই বলতে চাইছিস যে এটা মরা মানুষের পচা গন্ধ?' সুরেশকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বলল সুজন, 'পুরো ইল্লজিক্যাল! এখানে মানুষ কোথা থেকে আসবে!'

সুরেশ চুপ করে যায়। দেবযানী একটু চুপ করে থেকে বলে, 'মানুষ তো ছিল একসময়ে! তাদের কী হয়েছিল কেউ জানে না! ভানগড় যেদিন ধ্বংস হয়েছিল, সেদিন কত মানুষ এই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছিল কে জানে!'

বলতে বলতেই সে সামনের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকায়। রহস্যময় জ্যোৎস্নায় নীলাভ হয়ে আছে সেই ধ্বংসস্তূপ! ইট আর পাথরের পেল্লায় চাঁইগুলো দেখলেই ভয় করে! ওর নীচে কী আছে কে জানে! কয়েকশো বছর কেটে গিয়েছে, কেউ এই পাথরগুলোকে সরায়নি। হয়তো কোনোদিন ওর নীচেই চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল হাজার হাজার হতভাগ্য মানুষ। কেউ তাদের সাহায্য করেনি! কেউ তাদের উদ্ধার করতে আসেনি। কে জানে! আজও হয়তো তারা ওখানেই সমাধিস্থ হয়ে আছে...!

ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল দেবযানী। আচমকা একটা কনকনে ঠান্ডা দমকা হাওয়া তাকে ছুঁয়ে গেল! কেঁপে উঠল সে!

'দেবযানী!' সুজন পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, 'তুই কি ভয় পাচ্ছিস? কাঁপছিস কেন?'

ততক্ষণে এক অদ্ভুত শীতলতা ঘিরে ধরেছে দেবযানীকে। সে নিজেও আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তনে অবাক হল। আশ্চর্য বিষয়! একটু আগেও তো রীতিমতো গরম লাগছিল! প্রচণ্ড ঘামছিল বলেই জ্যাকেটটা খুলে ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তবে হঠাৎ করে এই বরফশীতল হাওয়া এল কোথা থেকে! দেবযানী টের পেল, তার প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। কিন্তু সুজন কোনোরকম দুর্বলতা পছন্দ করে না। না মানসিক, না শারীরিক। তাই কোনোমতে সামলে নিয়ে বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। সামান্য ঠান্ডা লাগছে।'

'ঠা-ন্ডা!' সুজন তাকে এমনভাবে দেখছে যেন দেবযানী এই মুহূর্তে মঙ্গলগ্রহ থেকে এল। অদ্ভুত সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এই ভয়ংকর গরমে তোর ঠান্ডা লাগছে! জ্বর-টর বাঁধাসনি তো? তুই লাস্ট মোমেন্টে ডোবাবি দেখছি!'

'না...না!...' দেবযানী একটু কুণ্ঠিত হয়ে কিছু বলতেই যাচ্ছিল, তার আগেই সুরেশ এগিয়ে এল তার দিকে। কোনো কথা না বলে দেবযানীর পিঠের ব্যাকপ্যাক ঘেঁটে বের করে আনল জ্যাকেটটা। তারপর তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,'এটা পরে নে। আর দুর্গন্ধ বেশি মনে হলে আমার কাছে থ্রি এম সিক্স থাউজ্যান্ড ওয়ান অর্গানিক ভেপার কার্টরিজ আছে, নিয়ে নে। মরা জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ আমারও সহ্য হয় না। সুজন তো সবাইকেই নিজের মতোই ভাবে!'

দেবযানী সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুরেশের দিকে তাকিয়ে জ্যাকেটটা গায়ে পরে নিল। সুরেশ মৃদু হেসে মাস্কটাও এগিয়ে দেয়। সুজন ভ্রূভঙ্গি করে ব্যাপারটা দেখল। মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট যে ব্যাপারটা আদৌ তার পছন্দ হয়নি। যে কোনোরকম দুর্বলতাকে সে অপছন্দ করে।

boierpathshala.blogspot.com

তার মতে 'পাথরের কারবারিকে পাথরের মতোই শক্ত হতে হয়। ঝড়, জল, রোদ— কোনোরকম দুর্যোগই তাকে টলাতে পারে না'। সে নিজেও সেই নিয়মই মেনে চলে। রোগ, প্রতিকূল পরিস্থিতি, ভয়— কোনোকিছুই তাকে আটকাতে পারেনি। এই সামান্য দুর্গন্ধে পিছু হটার পাত্র সে নয়। তাই এবার একটু বিরক্ত হয়েই বলল, 'হয়েছে? তাহলে এগোনো যাক?'

রাতের ভানগড়ের রাস্তা দিয়ে ফের হেঁটে চলল ওরা তিনজন। অন্ধকার গায়ে মেখে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। সুজনের একহাতে টর্চ, অন্যহাতে এমার্জেন্সি লাইট। এমার্জেন্সিটা অবশ্য এখন অফ করা রয়েছে। বেশি আলো জ্বেলে এখন কাজ নেই। মানুষ যদি ভূতের ভয়ে নাও আসে, কোনো বন্যপ্রাণী আসবে না এমন গ্যারান্টি নেই।

সুজনের ঠিক পেছনেই দেবযানী। তার হাতেও টর্চ। সুরেশ যথারীতি তার হাই ডেফিনিশন ক্যামকর্ডার নিয়ে রাতের ভানগড়ের দৃশ্য তুলছে। ওর ক্যামকর্ডারটা আবার নাইট-ভিশন। সে এখন বাঁদিকে জহুরিবাজারের ছবি তুলতে ব্যস্ত। একসময়ে এখানে এক আলো ঝলমলে, জনবহুল ও ব্যস্ত বাজার বসত। এখন শুধুই কতগুলো চৌকো ইট আর পাথরের ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে। প্রাচীন হলেও গাঁথুনি দেখলেই বোঝা যায় ঠিক কতখানি শক্ত-পোক্ত ছিল! কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ হওয়ার দরুন শ্যাওলার কালশিটে পড়েছে শুধু। বাকিটা এখনও মজবুত কাঠামোর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।

সে আস্তে আস্তে দূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধকার রাজমহলের দিকে ক্যামেরা জুম করল! এখনও দেখলে আন্দাজ করা যায় কোনো-সময়ে কী রাজকীয় গরিমা ছিল তার। আজ কিছুই নেই! তবু দেখামাত্রই গা শিরশিরিয়ে ওঠে।

সুরেশ চলতে চলতেই টের পেল, পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দ। ঠিক তার পিছনেই লঘু পায়ের আওয়াজ পেয়ে বুঝল, দেবযানী নির্ঘাৎ পিছিয়ে পড়েছে। সে ক্যামেরা থেকে চোখ না সরিয়েই হাসল, 'দেবযানী, একটু পা চালিয়ে। নয়তো সুজনের ঝাড় তোর কপালে নাচছে!'

'ঝাড় তো তুই খাবি মড়া!'

সুরেশের কিছুটা সামনে থেকেই দেবযানীর হাসিমাখা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সুরেশ চমকে সেদিকেই তাকাল! স্তম্ভিত হয়ে দেখল, দেবযানী তার পেছনে নয়, বরং বেশ খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! সে হাসতে হাসতেই বলল,'ভিডিওর চক্করে তুই-ই আমাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিস! তাড়াতাড়ি আয়।'

'তুই সামনে! তবে...! '

বিদ্যুৎবেগে পিছনদিকে ফিরল সুরেশ। কিন্তু সেখানে শুধুই আবছা অন্ধকার আর শূন্যতা! আর কেউ নেই! এবার বিস্ময়ের ধাক্কাটা এত জোরালো মাত্রার ছিল যে বেশ কয়েক সেকেন্ডের জন্য সে বাকশক্তি হারাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিহ্বলভাবে বলল, 'তবে.... তবে পেছনে কে?'

'স্বপ্ন দেখছিস নাকি?' সুজন এবার রেগে যায়, 'কখনও দেবযানীকে সামনে দেখছিস, কখনও পেছনে! শুরুটা করেছিস কী?'

'কিন্তু আমি স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনেছি!...নিঃশ্বাসের শব্দও পেয়েছি... কেউ ছিল! কেউ পিছনে ছিল!'

boierpathshala.blogspot.com

সুরেশ টের পেল তার স্নায়ুকে কাঁপিয়ে একটা ভয়ের স্রোত উঠে আসছে। সে আরেকবার বিভ্রান্তদৃষ্টিতে পেছনের দিকে তাকায়। সুজন তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে হাতের টর্চ তুলে ধরে সেদিকেই আলো ফেলল। কঠিন গলায় বলল, 'দ্যাখ, আছে কেউ?'

টর্চের আলোয় শুধু ভানগড়ের পাথর বাঁধানো রাস্তা দেখা গেল। আর ভাঙা কালো কালো পাথরের চাঁই! জহুরিবাজারের ছাতহীন দালানগুলো যেন মুন্ডুহীন কবন্ধের মতো কৌতুকে 'হো হো' করে হেসে উঠল!

আর কেউ নেই! কিছু নেই!

৬

গোপীনাথ টেম্পল সম্ভবত ভানগড় ফোর্টের বৃহত্তম মন্দির। অন্যান্য মন্দিরগুলোর তুলনায় অনেকটা জায়গা ছড়িয়েও আছে। দিনের বেলায় আপাদমস্তক হলুদ পাথরে তৈরি মন্দিরটি সূর্যের সোনালি আভায় ঝলমল করে। সামনে অগুনতি পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে মন্দির অবধি। ওরা দিনের বেলায় মন্দিরটিকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিল। যেখানে গোটা দুর্গটাই প্রায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে গিয়েছিল, সেখানে গোপীনাথ মন্দির এখনও সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় আছে! মন্দিরচূড়ার সূক্ষ্ম কারুকার্য ও স্থাপত্যশিল্প দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মন্দিরটির সর্বমোট তিনটি গর্ভগৃহ। যার মধ্যে দুটো গর্ভগৃহ ওরা দেখেছে। তৃতীয়টিই প্রধান ও অভ্যন্তরীণ। সেটাই এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন আর দেখা যায় না। কিন্তু বাইরের দুটো গর্ভগৃহ দেখলেই বোঝা যায় যে সেটি কী বস্তু হবে! সরকার সম্ভবত ভানগড় ফোর্ট সম্বন্ধে উদাসীন। তাই অন্যান্য দুর্গের মতো এই দুর্গটির পুনর্নির্মাণ হয়নি। আর সেই উদাসীনতার কারণেই গোপীনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহগুলির ছাতের সৌন্দর্য ও সৌকর্য খানিকটা নষ্ট হয়েছে। প্রধান স্তম্ভের গায়ে চমৎকার এক নৃত্যরতা যক্ষিণীমূর্তির ভাস্কর্য ছিল। তবে অবহেলায় আর কালের আঘাতে মূর্তিটির মাথা ও দুই হাত ভেঙে গিয়েছে। নষ্ট হয়েছে ভাস্কর্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা রয়েছে, তাও যথেষ্টই বিস্ময়কর! দেবযানী তো দেখেই রীতিমতো উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'ফ্যান্টাস্টিক আর্কিটেকচার! অনেকটা সাউথ ইন্ডিয়ার বিজয়নগরের মন্দিরগুলোর মতো না? এক্সোটিক ওয়ার্ক উইথ রাজপুতানা আর্কিটেক্ট!'

সুজন সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও তার সতর্ক চোখের নিষেধাজ্ঞা পড়তে পেরেছিল দেবযানী। তারা যে মন্দিরের স্থাপত্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে রীতিমতো ওয়াকিবহাল তা সে প্রকাশ করতে চায় না। বিশেষ করে অতুলের সামনে। অগত্যা দেবযানী চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু মনে মনে গোপীনাথ মন্দিরের অভ্যন্তরীণ গর্ভগৃহটি দেখার জন্য আরও বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যা প্রকাশ্যে আছে তাতেই যদি এত কারুকাজ হয়, না জানি অপ্রকাশ্য শিল্পটি আরও কতগুণ সুন্দর হবে! অতুল অবশ্য মৃদু হেসে বলল, 'গোপীনাথ কৃষ্ণের আরেক নাম। আগে শ্রীরাধিকার সঙ্গে বংশীধারী কৃষ্ণের চমৎকার যুগলমূর্তি ছিল শুনেছি। তবে এখন নেই। হয়তো কোনো মূর্তিচোর ফাঁকেতালে সরিয়ে নিয়েছে।'

বলতে বলতেই তার মুখে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ বঙ্কিম হাসি ভেসে উঠল। সুজন দাঁতে দাঁত পিষে চাপা গলায় বলেছিল, 'পারলে এই ব্যাটার মাথাতেই ছেনি আর হাতুড়ি ছুড়ে মারি! অসহ্য!'

এই প্রথম সুজনের কথায় সম্পূর্ণ একমত হয়েছিল দেবযানী। সত্যিই অসহ্য! তার থেকেও অসহ্য ওর এই নিষ্পলক চাউনি! একেবারে মরা মাছের মতো চোখ! সে লক্ষ

boierpathshala.blogspot.com

করে দেখেছে, লোকটা একবারের জন্যও চোখের পলক ফেলে না! আশ্চর্য!

ওরা সেদিন দিনের আলোয় দেখেছিল মন্দিরটাকে। আর আজ, গভীর রাতে...!

নরম জ্যোৎস্না অলৌকিক ইশারায় গলে গলে পড়ছিল গোপীনাথ মন্দিরের চূড়া বেয়ে। দিনের আলোয় এর রহস্যময়তা বোঝা যায়নি। কিন্তু রাতের আলো-আঁধারিতে মন্দিরটাকে দেখে কেমন যেন গা ছমছম করে উঠল দেবযানীর! কোনো এক দৈবীশক্তি যেন মাথা উঁচু করে ঘুমিয়ে আছে! পাথরের স্তম্ভগুলোর কারুকাজ যেন আরও জীবন্ত। চাঁদের আলো ছলকে ছলকে পড়ছে পাথরের মসৃণ গায়ে! ভেতরের অন্ধকার গর্ভগৃহ যেন ইশারায় কাছে ডাকছে ওদের। কী যেন এক অব্যক্ত সম্মোহনী শক্তি চুম্বকের মতো টানছে!

'সুরেশটা আবার কোথায় গেল?'

সুজন একটু বিরক্তিমিশ্রিত গলায় বলল, 'আমাদের পেছন পেছনই তো আসছিল। এখন কোথায় গায়েব হল!'

দেবযানী প্রমাদ গোনে। সুরেশের এই এক বদভ্যাস। একবার ভিডিও তুলতে শুরু করলে তার আর হুঁশ থাকে না। নির্ঘাৎ জ্যোৎস্নালোকিত ভানগড় ফোর্টের ভিডিও তুলতে তুলতে পিছিয়ে পড়েছে! এই প্রথম নয়, এর আগেও সে এরকম কাণ্ড করেছে। একবার এক প্রাচীন গুম্ফায় ঢুকে ঠিক এভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেবযানী আর সুজন যখন তাকে গোরুখোঁজা খুঁজে হতক্লান্ত, তখনই ক্যামেরা হাতে বাবু এসে হাজির! এসেই ভারী নিরীহ গলায় বলেছিল, 'আমায় খুঁজছিলি?'

সেদিন সুজন তাকে মারতে বাকি রেখেছিল। আজও বিরক্ত হয়েই বলল,'এই ছেলেটা কিছুতেই সিরিয়াস হবে না! ওর কী মনে হয়? এইসব জায়গা রাতের বেলা খুব সেফ? ও কি কনডাক্টেড ট্যুরে এসেছে নাকি! সব জোগাড়-যন্ত্র মাটি করবে দেখছি! প্রত্যেকবারই এই এক কেস...!'

রেগেমেগে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সুজন। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে থেমে গেল! ওটা কীসের আওয়াজ! জলের নয়? স্থির নৈঃশব্দের মধ্যে একটা জোরালো ছলছল শব্দ কানে আসতেই চমকে উঠল ওরা! মন্দিরের ডানদিকে একটা ড্রেইন আছে। তাতেই জলের শব্দ হচ্ছে! কিন্তু জলের শব্দ হচ্ছে কেন! যে মন্দির পরিত্যক্ত, যেখানে বিগ্রহ নেই, বিগ্রহকে স্নান করানো হয় না বা পুজো করা হয় না; সেখানে জল যাওয়ার এমন কুলকুল আওয়াজ হতেই পারে না! এক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ভেতরে এত রাত্রে তবে কাকে স্নান করানো হচ্ছে! সে কি কোনো দেবতা? না...!

'শুনলি?'

দেবযানীর কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। তার হৃৎপিণ্ড এখন প্রায় টারবাইনের গতিতে চলতে শুরু করেছে। সুজনের মুখেও এই প্রথম সামান্য ভয়ের আভাস দেখা গেল। সে আস্তে আস্তে বলল, 'শুনলাম!'

'এত রাতে হন্টেড ফোর্টে জলের আওয়াজ! মন্দিরে কেউ আছে!' দেবযানী উত্তেজিত, 'সুজন, আমি তোকে আগেই বলেছিলাম, এটা হন্টেড প্লেস! ইথানও বলেছিলেন....!'

'সে তো দীননাথও বলেছিল যে রাত হলে ভানগড় জেগে ওঠে, প্রাচীন ভগ্নস্তূপ মেরামত হয়ে যায়, ভূতেরা মিটিং করতে আসে, নাচে-গায়; তেমন কিছু দেখেছিস কি?'

সুজনের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে এবার টর্চটা রেখে দিয়ে ফট করে জোরালো এমার্জেন্সি লাইটটা জ্বেলে দিল। দেবযানী ভয়ার্ত ও বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে দেখল তার

boierpathshala.blogspot.com

লাইসেন্সড গানটাও হাতে উঠে এসেছে। তারপরই একদম গটগট করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, 'আমার ধারণা কেউ আমাদের সঙ্গে গেম খেলছে। আমি এর শেষ দেখেই ছাড়ব।'

দেবযানী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'যাস না সুজন। কেউ...কিছু তো আছেই! দাঁড়া!'

সুজন শুনল না। বরং একহাতে এমার্জেন্সি লাইট ও অন্যহাতে উদ্যত বন্দুক নিয়ে একরকম দৌড়েই উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। দেবযানী সভয়ে দেখল, সুজন মিলিয়ে গেল সার সার স্তম্ভের মাঝখান দিয়ে। প্রাথমিকভাবে শুধু তার এমার্জেন্সি লাইটের আলো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ জমাট অন্ধকার বুঝি হাঁ করেই ছিল। সে একেবারে দানবের মতো গ্রাস করতে শুরু করল আলোকে। এমার্জেন্সির আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়েই গেল অন্ধকারের মধ্যে।

দেবযানীর বুকের ভেতরের কাঁপুনিটা আরও বাড়ছে। সুজন কোথায় গেল! এখন তার হাতের আলোটাও আর দেখা যাচ্ছে না। সুরেশও কোথায় কে জানে! অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে, নিঃসঙ্গ মেয়েটির মনের মধ্যে আঁচড় কাটছে ভয়! সে একবার গোপীনাথ মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকাল। এখন এই পাথুরে স্থাপত্যকেও ভীষণ জীবন্ত মনে হচ্ছে। অতুল বলেছিল, মন্দিরগুলো জীবন্ত! তার কথাকে প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল সুজন। কিন্তু এখন সেই কথাটাকেই চরম সত্যি বলে মনে হচ্ছে। দেবযানীর চোখ একবার ছুঁয়ে গেল চতুর্দিকের ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানগুলোকে। চাঁদের আলোয় কেমন যেন রহস্যময় ছায়ামূর্তি মনে হচ্ছে তাদের। এত শক্তিশালী, এত দাম্ভিক দুর্গকে কোন বিধ্বংসী শক্তি এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল! অথচ মন্দিরগুলোর কিছুই হল না! কেন?

হঠাৎই তার মনে পড়ল অতুলের কথা। সে বলেছিল, 'ভানগড়ের মন্দিরগুলোর মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই আছে। নয়তো একরাতের মধ্যে রীতিমতো মজবুত একটা কেল্লা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল, অথচ মন্দিরগুলো একদম অটুট থাকল কী করে?...'

কথাটাকে চিরসত্য বলেই মনে হল দেবযানীর। সে ভয়ার্ত, ব্যাকুলস্বরে ডাকল, 'সু-জ-ন!'

কিন্তু তার ডাকের কোনো প্রত্যুত্তর এল না। মন্দির নিশ্চুপ! দেবযানীর মনের মধ্যে আশঙ্কার মেঘ গুড়গুড়িয়ে ওঠে। তার মনে হল, শীতটা যেন ক্রমশই বাড়ছে। তার সঙ্গে বাড়ছে দুর্গন্ধের প্রকোপও। তার মুখের মাস্কও সে প্রাণান্তিক দুর্গন্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সে সমস্ত শক্তি নিংড়ে দিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'সু-জ-ন!'

তাও কোনো উত্তর নেই! সে নিরুপায় হয়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের সিঁড়ির দিকে। সুজনকে সে এভাবে ছেড়ে যেতে পারে না। ওরা বহুবছর ধরে একসঙ্গে একই কাজ করে আসছে। আজ এই চূড়ান্ত মুহূর্তে তাকে একলা ছেড়ে দেবযানী পালিয়ে যেতে পারে না।

গোপীনাথ মন্দিরের সামনে সারসার পাথরের প্রাচীন সিঁড়ি জ্যোৎস্নায় ঝকমক করছে। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল। সিঁড়ির সংখ্যা খুব বেশি হওয়া উচিত নয়। সর্বসাকুল্যে পঁচিশ কী ত্রিশটি সিঁড়ি রয়েছে। কিন্তু আজ বেশ কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙেই হাঁফ ধরে গেল দেবযানীর! নিজের অবস্থা দেখে সে নিজেই বিস্মিত! এ তো কিছুই নয়; এরকম খাড়া, পাথুরে কয়েকশো সিঁড়ি ভেঙে ওরা কত মন্দিরে ঢুকেছে অনায়াসেই। হাঁফ

boierpathshala.blogspot.com

ধরা তো দূর, সামান্য ক্লান্তিও বোধ করেনি। অথচ আজ মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল!

দেবযানী অপরিসীম জেদে দাঁতে দাঁত পিষল। সে-ও এর শেষ দেখেই ছাড়বে। গোঁয়ারের মতো একের পর এক সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই থাকল মন্দিরের দিকে। দম ধরে আসছে, হাত-পা ভারী হয়ে আসছে, বুকের ওপর একটা প্রচণ্ড ভার টের পাচ্ছে; যেন কেউ একটা পাথর বসিয়ে দিয়েছে বুকের ওপরে; তবু থামছে না। আর তো মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি... তারপরেই....!

কিন্তু সামনের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠল সে! একী! এখনও তো সামনে অদম্য, উদ্ধত সিঁড়ির অগুনতি ধাপ! পঁচিশ কী ত্রিশটা নয়! এ একেবারে সীমাহীন! গোপীনাথ মন্দিরের সামনে এত সিঁড়ি কবে এল! কখনই বা এল! এর যে শেষই দেখা যায় না! কোথায় গিয়ে থেমেছে এ সিঁড়ি? দেখলে তো মনে হয় একেবারে নিরুদ্দেশের পথে চলেছে! কোথায় মন্দিরের কারুকার্যমণ্ডিত চূড়া! কোথায় পাথরের স্তম্ভ! কিছুই দেখা যায় না। সামনে শুধু সারে সারে পাথরকাটা সিঁড়ি যার শেষ নেই! তবে শুরু কোথায়?

নীচের দিকে দেখতেই রক্ত হিম হয়ে যায় দেবযানীর! এ কী! তার পেছনেও তো অগুনতি সিঁড়ি ধাপ কেটে কেটে নেমে গেছে! সে আপ্রাণ নীচের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্থিতি দেখে তার মাথা ঘুরতে শুরু করল! কী সর্বনাশ! এ সিঁড়ির যেন শুরুও নেই! কয়েকশো নয়, অন্তত কয়েকহাজার তো বটেই! এতগুলো সিঁড়ি সে কখন ভাঙল! কখন থেকেই বা হেঁটে চলেছে! নীচের কোনো দৃশ্যই চোখে পড়ছে না! কিচ্ছু নেই! শুধু সামনে আর পেছনে ধাপে ধাপে সিঁড়ির সার ব্যঙ্গ করে চলেছে! না এগোনোর উপায় আছে, না পেছোনোর!

দেবযানীর মনে হচ্ছিল তার হাত-পা ক্রমাগত ভারী হয়ে আসছে! যেন এ তার নিজস্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। ভারি পাথরের তৈরী হাত-পা! বুকের ভিতরে ভীষণ কষ্ট! মনে হয়, হৃৎপিণ্ডটাও ক্রমশ পাথর হয়ে যাচ্ছে! সে যেন আপাদমস্তক পরিণত হচ্ছে এক পাথরের মূর্তিতে যাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব! যত এগোচ্ছে ততই যেন একটু একটু করে তাকে গ্রাস করছে পাষাণ! প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ভারী হয়ে উঠছে তার দেহ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে বুঝতে পারল, তার দেহের তাপমাত্রা ক্রমাগতই কমছে। শিরার মধ্যে রক্তসঞ্চালন ধীর হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। শীত করছে, অসম্ভব শীত করছে তার!

জ্যোৎস্নার আলো একঝলক এসে পড়ল দেবযানীর দুই হাতের ওপর। সেই সামান্য আলোতেও সে ভয়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, তার হাত দুটো আস্তে আস্তে হলুদবর্ণ ধারণ করছে! অবিকল সেই হলুদ পাথরের মতো, যে পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে গোটা গোপীনাথ মন্দির! দেবযানী ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার পা একচুলও নড়ল না! যেন চিরকালের জন্য গেঁথে গিয়েছে পাথরের মধ্যে।

সে ভয়ে চিৎকার করে উঠতে চায়! কিন্তু আশ্চর্য; একটু শব্দও বেরোল না তার মুখ থেকে। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল, সে আস্তে আস্তে পাথরের মতো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে!

পাথরের মতো হিমশীতল!

boierpathshala.blogspot.com

সুরেশ রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল।

এমনিতেই সে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল। সুজনকে সেকথা বারবার বলেছে, বোঝানোর চেষ্টা করেছে, সত্যিই তার পেছনে কেউ ছিল! কোনো মানুষের দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ, হেঁটে আসার আওয়াজ সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে! কোনো সন্দেহই নেই, যে কেউ তাদের ফলো করছে!

কিন্তু সুজন তার একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। উলটে হেসে বলেছে; 'ওসব পাব্লিকের পাবলিকের গাঁজাখুরি গল্পের এফেক্ট! তুই হ্যালুসিনেট করছিস!'

সুরেশের কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়, হয়তো সুজনই ঠিক বলছে। ভানগড় সম্পর্কে নানারকম ভৌতিক ও অলৌকিক গল্প শুনতে শুনতে তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা করছে। হয়তো তার পেছনে সত্যিই কেউ ছিল না। অন্য কোনো প্রাকৃতিক শব্দ শুনে সে খামোখাই চমকে উঠছে। ব্যাপারটার একটা যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে পেয়ে তখনকার মতো সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আশ্বস্তও হয়েছিল।

কিন্তু দেবযানী আর সুজনের পিছনে যেতে যেতেই হঠাৎ থমকে গেল সে! আবার! আবার সেই শব্দ! শুধু পায়ের শব্দই নয়, এবার যেন কারোর পায়ে ধাক্কা লেগে নুড়ি-পাথরের গড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ! শুধু তাই নয়, পোশাকের খসখসও একদম পরিষ্কার শুনতে পেল সে! না, কোনোরকম ভ্রান্তি নয়। পেছনে কেউ আছে! কেউ তাদের অজান্তেই ফলো করছে!

'কে?'

সে তৎক্ষণাৎ সপাটে পিছনে ফিরল। নাঃ, তার সন্দেহ অমূলক নয়! ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে কেউ! তার আবছায়া সিল্যুয়েট রাতের প্রেক্ষাপটে একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সে যেই হোক, এবার আর লুকিয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি।

'কৌন হো আপ? কিউঁ মুঝে ফলো কর রাহে হো?'

হিন্দিতে ধমকে উঠল সুরেশ। কিন্তু ছায়া কোনো উত্তর দিল না। সে চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেশ ক্যামকর্ডারটাকে মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি ব্যাকপ্যাক থেকে নিজের টর্চটা বের করল। সেটা অন করে আলো ফেলতেই আবার একটা বিস্ময়ের ধাক্কা! যেখানে ছায়াটা দাঁড়িয়েছিল, সেখানে এখন কেউ নেই! টর্চের সাদা আলো শুধু পাথুরে পথ আর ইতস্তত ছড়ানো দুর্গের ভাঙাচোরা অবশেষটুকুই দেখাল।

পালিয়ে গেল! সুরেশ রীতিমতো অবাক হল। ক্যামকর্ডার রেখে টর্চটা বের করতে তার এমন কিছু সময় লাগেনি। তার মধ্যেই একটা আস্ত মানুষ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল! দৌড়ে যাওয়ার ধুপধাপ শব্দও তো কানে আসেনি তার! সে টর্চের আলো ইতস্তত ফেলে দেখার চেষ্টা করল যে মানুষটা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই কোথাও লুকিয়েছে কি না। কিন্তু কাউকেই আশেপাশে দেখা গেল না!

সুরেশের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। আস্ত মানুষটা নিমেষে এমন লোপাট হয়ে গেল কী করে! নাকি আবার তারই ভুল হল! ভাবতেই সে মাথা নাড়ে। নাঃ, এতখানি ভুল করতেই পারে না। স্পষ্ট দেখেছে একটা ছায়ামূর্তি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে! কোনো চতুষ্পদ নয়, কোনো বন্যজন্তুও নয়। নিঃসন্দেহে সে মানুষ। আর ও যে তাদের ফলো করছিল, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

boierpathshala.blogspot.com

সুরেশ নিজের অজান্তেই একবার তার জ্যাকেটের পকেটটা স্পর্শ করল। ওখানে একটা ফোল্ডিং নাইফ রয়েছে। ওদের কাজটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আত্মরক্ষার্থে সবসময়ই ছুরিটাকে পকেটে রাখে। সেটার উপস্থিতি টের পেতেই যেন একটু শান্তি পেল। তারপর ক্যামকর্ডারটাকে তুলে নিয়ে ব্যাগে ভরে এগোনোর জন্য পা বাড়াল। আবার যদি সেই আগন্তুক এসে হাজির হয়, তবে দেখা যাবে। এবার ওকে দেখে নেবে সে।

কিন্তু এগোতে গিয়েই ফের চমক! সুজন আর দেবযানী কোথায় গেল! একটু আগেও তো সামনেই হাঁটছিল ওরা দুজন! কিন্তু এখন তার দৃষ্টিপথের মধ্যে ওরা কেউ নেই! সুরেশ বিপন্ন বোধ করল! এতক্ষণ সুজনই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল। ভানগড় ফোর্টের ম্যাপটাও ওরই কাছে। অথচ ওরা কেউ ধারেকাছে নেই! এমনকি ওদের টর্চের আলোও দেখা যাচ্ছে না! সুজন তো কোনোকালেই কেয়ার করে না, কিন্তু দেবযানীও কি ভুলে গেল সুরেশের কথা! একবারও কি পিছু ফিরে দেখেনি যে সে সঙ্গে নেই!

সুজন আর দেবযানীর এরকম ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই রাগ হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু আস্তে আস্তে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন মান-অভিমানের সময় নয়। হয়তো কাজের উত্তেজনায় ওরা লক্ষই করেনি যে সুরেশ ওদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। অনেক সময় লক্ষ করেও না। দুর্গের রাস্তা একদম সোজাই চলে গিয়েছে। নাক বরাবর দ্রুত হাঁটলে হয়তো খুঁজেও পাওয়া যাবে ওদের। খুব বেশিদূর এগিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, এখন উত্তেজিত হওয়ার সময় নয়। বরং ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

সুরেশ এবার নিজের টর্চ জ্বালিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। তার পাশাপাশি চলেছে জহুরিবাজারের কালো ছোপ ছোপ ইট-পাথর! বহুবছরের শ্যাওলা জমে রয়েছে ভগ্নাবশেষের গায়ে। বহুবছরের রহস্যও বটে...!

'খস খখসখখস!'

আবার! আবার সেই আওয়াজ! সূক্ষ্ম রেশমি কাপড় ঘষা খেলে যেমন শব্দ করে ঠিক তেমনই একটা খসখস ধ্বনি! তার সঙ্গে পায়ের শব্দ এবার আরও বেশি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে! ফলো করছে! সে আবার ফলো করছে! সুরেশ টের পেল তার ঠিক ঘাড়ের কাছে কেউ যেন বরফশীতল নিঃশ্বাস ফেলল! অর্থাৎ আগন্তুক এবার আরও কাছে! তার হিমশীতল নিঃশ্বাসে কেঁপে উঠল সে!

'কৌন হ্যায়! হু দ্য হেল আর ইউ...!'

বলতে বলতেই সে অ্যাবাউট টার্ন নিয়ে বিদ্যুৎবেগে টর্চের জোরালো ফোকাস ফেলল ঠিক তার পেছনেই! কিন্তু! ছায়ামূর্তিটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে তার দেহরেখা স্পষ্ট! মাথা, কাঁধের আউটলাইন, দুটো হাতের রেখাও স্পষ্ট দৃশ্যমান! কিন্তু যেখানে টর্চের আলো ফেলেছে সুরেশ সেখানে ছায়ার মালিকের বুক বা পেটের অংশ থাকা উচিত! অথচ সেরকম কিছুই নেই! টর্চের তীব্র আলো যেন ছায়ামূর্তিটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে গিয়ে পড়ল শূন্য দুর্গের চারিদিকে! অথবা কোনো অজ্ঞাত সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গিয়ে আলোটা মিশে গেল শূন্যতায়!

ভয়ে সুরেশের রক্ত হিম হয়ে যায়। সে বুঝতে পেরেছে, ওটা কোনো মানুষ নয়! হাড়-মাংস-পেশিযুক্ত কোনো প্রাণীই নয়। বরং ও শুধুমাত্রই একটা ছায়া! যাকে অনায়াসে ভেদ করে চলে যাচ্ছে টর্চের আলো! এ কী করে সম্ভব! অসম্ভব ব্যাপার! একটা ছায়া তার পেছন পেছন আসছিল! অবিশ্বাস্য!

boierpathshala.blogspot.com

একমুহূর্তের জন্য শ্বাস টানল সুরেশ! পরক্ষণেই প্রবল গতিতে দৌড়তে শুরু করল। যে করেই হোক, এই অলৌকিক ছায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই হবে তাকে! ছুটতে ছুটতেই সে টের পেল পেছনের পায়ের আওয়াজও ক্রমাগত জোরালো হচ্ছে! অর্থাৎ সেই ছায়ামূর্তি যে-ই হোক না কেন, এখনও তাকে দুরন্ত গতিতে ধাওয়া করছে। সেই ছায়াও হাল ছাড়েনি!

সুরেশের মনে হল তার দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে! এ কী অদ্ভুত ছায়া! এর থেকে বরং কোনো দৈত্য তেড়ে এলেও সে এত ভয় পেত না। ভানগড় ফোর্টের কিংবদন্তিতে যেসব ভূত-দর্শনের কথা আছে, তেমন কেউ সামনে এসে দাঁড়ালেও বোধহয় এর চেয়ে ভালোই হত! অন্তত তাদের একটা মূর্তি থাকত; কায়া থাকত। কিন্তু যার কোনো মূর্তিই নেই; যে সম্পূর্ণ কায়াহীন, সেই আতঙ্কের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবে কী করে!

পেছনে ছুটে আসার শব্দ এখন আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। নিরুপায়, বিপন্ন সুরেশ সামনেই যে রাস্তা পেল তাতেই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করল। যে আতঙ্ক তাকে চেজ করে চলেছে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য কোনো উপায় জানা নেই তার। মানুষ হলে ছুরি কাজে আসত। কিন্তু ছায়া...!

দাঁতে দাঁত চেপে সুরেশ তার গতিবেগ বাড়াল। জোরে, আরও জোরে! আরও আরও বেশি জোরে দৌড়ে চলেছে সে। ভাঙা ভাঙা সিঁড়ি টপকে, কখনও চড়াই ভেঙে, কখনও উৎরাই বেয়ে দৌড়চ্ছে। কিন্তু কোথায় চলেছে সে নিজেই জানে না! কখনও পায়ের তলায় পাথুরে রাস্তা, কখনও বা নরম ঘাস দলিত মথিত করে এগোচ্ছে। এই মুহূর্তে তার পাশ দিয়ে সাঁত সাঁত করে চলে যাচ্ছে ভাঙাচোরা মহল, মাথাকাটা ভেঙে পড়া দালান, বিপর্যস্ত ধ্বংসস্তূপ! আর চলেছে ভানগড়ের শক্তিশালী পেশল দেওয়াল! প্রাচীন এক বিরাট সরীসৃপের মতো সেও এঁকেবেকে সুরেশের পাশাপাশি দৌড়চ্ছে। সুরেশের মনে হল, ওগুলো নেহাত ধ্বংসস্তূপ নয়; এ প্রাচীন দেওয়ালও আসলে নিছক দেওয়াল নয়! এরা প্রত্যেকেই এক একটা জীবন্ত ছায়া। যে কোনো মুহূর্তে ওরাও 'রে রে' করে তেড়ে আসবে তার দিকে!

দেহের সব শক্তিটুকু জড়ো করে দৌড়তে দৌড়তেই আচমকা পাথরে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সুরেশ। তার হাত থেকে টর্চ ছিটকে পড়ে গড়গড় শব্দ তুলে কোথায় গড়িয়ে গেল কে জানে! চতুর্দিকে এখন শুধু অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্য! যে ছায়া তার পেছনে আসছিল, তাকেও আর দেখা গেল না! সে যেন অন্ধকারের মধ্যেই আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছে!

পড়ে গিয়েই ভয়ের চোটে চোখ বুজে ফেলেছিল সে! কোনো এক অজানা ও ভয়ংকর পরিণামের জন্য দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু নিঃশব্দ কিছু মুহূর্ত চলে যাওয়ার পরে কিছুটা স্বস্তি পেল সুরেশ। সেই ছায়া হয় তাকে অতিক্রম করে অন্যদিকে চলে গিয়েছে, নয়তো তার পিছু করা ছেড়ে দিয়েছে।

সে এবার কোনোমতে উঠে বসে। হাতের তলায় ঠান্ডা পাথরের স্পর্শ। অর্থাৎ ও পাথরের ওপরেই পড়েছিল। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা! মাথাটা পাথরে ঠুকে গিয়েছে। সুরেশ হাত দিয়ে কপালে একটা চটচটে তরল অনুভব করল! রক্ত পড়ছে! কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এখন সে আছে কোথায়?

boierpathshala.blogspot.com

অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে আসতেই সুরেশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল লোকেশনটা। এবং আবিষ্কার করে হতচকিত হল যে তার ঠিক সামনেই ভানগড়ের রাজপ্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই রত্নাবতীর মহল দেখতে এসেছিল ওরা। কিন্তু যতদূর সে জানে, রয়্যাল প্যালেসটা গোপীনাথ টেম্পল ছাড়িয়ে গেলে দেখা যায়। অর্থাৎ সে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে দৌড়তে দৌড়তে ঘুরপথে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এখান থেকে একটু পিছিয়ে গেলেই গোপীনাথ মন্দিরটা পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে দেবযানী ও সুজনকেও।

সুরেশ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। তার ব্যাকপ্যাকটা একটু দূরেই পড়েছিল। সে সযত্নে সেটাকে তুলে নিল। এই মুহূর্তে ভয়ে তার বুক রীতিমতো কাঁপছে! অসহায় ছেলেটার কাছে টর্চটাও নেই। সেটা কোথায় গেছে কে জানে! সুরেশ বাঁদিকের হিপপকেট থেকে বের করে আনল লাইটার। কাঁপা কাঁপা হাতে লাইটারটাকে জ্বালানোর চেষ্টা করছে। প্রথমবার চেপে ধরতেই নীলাভ শিখা দপ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী! লাইটারের দুর্বল শিখাও কাঁপতে কাঁপতে ঝুপ করে নিভে গেল। ভয়ার্ত মানুষটা বার বার চেষ্টা করল। কিন্তু লাইটার আর জ্বলে না!

ভয়ে সুরেশের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। সে কী করবে, কোথায় যাবে; কিছুই বুঝতে পারছে না। তার প্রায় কান্না পেয়ে গেল! সুজন আর দেবযানী কি এখনও তাকে খুঁজছে না! এই নিঃসঙ্গ দুর্গে কতক্ষণ অলৌকিক শক্তির সঙ্গে একা যুদ্ধ করবে সে? কার সঙ্গেই বা করবে? প্রতিপক্ষ যেখানে অদৃশ্য, সেখানে তার কী করার আছে? এখন তো এক পাও এগোতে ভয় করছে তার!

হঠাৎই একটা প্রবল গড়গড় শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সে! কীসের শব্দ ওটা! কোথা থেকে আসছে? কী প্রচণ্ড আওয়াজ! যেন ভয়ংকর কোনো প্রলয় ছুটে আসছে তারই দিকে! কিন্তু জিনিসটা কী!

শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ল জিনিসটা! একটা বিরাট জমাট অন্ধকার ওপরের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে আসছে নীচের দিকেই! শুধু কি অন্ধকার! না। অন্ধকার নয়; ওটা বিরাট একটা পাথর! দুর্নিবার, অদম্য বেগে ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে!

সেই ক্ষণেই তার একটাই নাম মনে পড়ল! তান্ত্রিক সিঙ্ঘিয়া! যে লোকটা কালো জাদুর মাধ্যমে রাজকন্যা রত্নাবতীর প্রসাধনীকে মন্ত্রপূত করে দিয়েছিল। তার মূল্য সে নিজে দিয়েছিল নিজের প্রাণ দিয়ে! আর সুরেশরাও সেই রত্নাবতীর মূর্তিকেই ভাঙতে এসেছে। আজ আবার সেই পাথর তার প্রতিশোধ নেবে। পাথরের কারবারিদের বিরুদ্ধে স্বয়ং পাথরেরাই রুখে দাঁড়িয়েছে! কেউ বাঁচবে না! সুরেশ, দেবযানী এমনকি সুজনও রক্ষা পাবে না পাথরের প্রতিশোধের হাত থেকে! কেউ বাঁচবে না!

বিশালাকৃতি কালান্তক পাথরটা উল্কার বেগে ছুটে আসছে সুরেশের দিকে। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এসে পড়বে তার ওপরে। সেই অন্তিম মুহূর্তে মনে পড়ে গেল অতুলের কথা। বাক্যটা ভেবেই পাগলের মতো মর্মান্তিকভাবে হেসে উঠল সুরেশ!

'এ পাথরে প্রাণ আছে!'

৮

গোপীনাথ মন্দিরের মূল গর্ভগৃহটা দেখে চমকে গেল সুজন। কী আশ্চর্য ভাস্কর্য! কী অদ্ভুত সব মূর্তি! দেখেই তার চক্ষুস্থির। অতুল ঠিকই বলেছিল। গর্ভগৃহে পাথরের বেদি

boierpathshala.blogspot.com

রয়েছে। কিন্তু কোনো বিগ্রহ নেই। কিন্তু থাকারই বা দরকার কী! যা রয়েছে তার মূল্য বিদেশের বাজারে কয়েকশো কোটি অবধি হতে পারে। এক একটা যক্ষিণী মূর্তিই দেখার মতো। কী তাদের অবয়ব, কী তাদের ভঙ্গিমা! কে জানত যে এই পরিত্যক্ত, ভগ্ন দুর্গের মধ্যে এমন রাজৈশ্বর্য লুকিয়ে আছে!

জল পড়ার আওয়াজ শুনে তার মনে হয়েছিল, হয়তো ভেতরে কেউ আছে! সেজন্যই সে দেবযানীকে ওখানে রেখেই তড়িঘড়ি ভেতরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোনো মানুষের অস্তিত্ব টের পায়নি। এমনকী জলের শব্দটাও আচমকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আর তদন্ত না করে সে সরাসরি ঢুকে গিয়েছে প্রধান ও অভ্যন্তরীণ গর্ভগৃহে। ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে আগেই ছিল। তাই দরজা খুলতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

এমার্জেন্সি লাইটের আলোয় চতুর্দিকটা দেখতে দেখতে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের ঠিক কেন্দ্রে। সেখানে এক নারীমূর্তির ভাস্কর্য! কিন্তু সে ভাস্কর্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করা অসম্ভব! হলুদ পাথরের ওপর ভাস্কর নারীমূর্তি খোদাই করেননি, বরং পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য উজাড় করে দিয়েছেন! নারীটি শৃঙ্গাররতা। পদ্মের মতো দুটি হাত একঢাল চুলে ফুল গুঁজতে ব্যস্ত! দেহবল্লরী যেন চরম লাস্যের মূর্ত প্রকাশ! যদিও মুখটা ঠিক স্পষ্ট নয়! বদ্ধ ঘরে থাকার দরুন ধুলোও জমেছে। তবু তার অভ্যস্ত চোখ দেখামাত্রই বলে দিল—এ মূর্তি ওদের সবাইকে আরবপতি করার ক্ষমতা রাখে! কোনো সন্দেহই নেই যে এটাই রাজকন্যা রত্নাবতীর মূর্তি!

মনে মনে মিঃ ও' কোনরের রুচির প্রশংসা না করে পারল না সুজন। সে আর একমুহূর্তও দেরি করতে চায় না। রত্নাবতীর মূর্তিটাকে যতক্ষণ না কেটে বের করছে, ততক্ষণ শান্তি নেই। সে এমার্জেন্সিটা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। দেবযানী আর সুরেশের সহায়তা ছাড়া এ মূর্তি ভাঙা যাবে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সুরেশও এসে হাজির হয়েছে। এরকম প্রাচীন মূর্তি অবিকৃতভাবে কাটা অসম্ভব যদি না ওদের দুজনের প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হাত না থাকে।

কিন্তু ত্রস্তব্যস্ত পায়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল সুজন। দেবযানী সেখানে নেই! এমনকী সুরেশও এসে উপস্থিত হয়নি! শূন্য মন্দিরপ্রাঙ্গণ যেন তার বোকাটে মুখটা দেখে নিঃশব্দ হাসি হাসল! সুজন মনে মনে একটু বিরক্ত হয়। সুরেশ তো চিরকালীন ভ্যাগাবন্ড। কিন্তু দেবযানী গেল কোথায়! পাঁচমিনিটও হয়নি তাকে রেখে সে মন্দিরে ঢুকেছে। শেষ যতটুকু মনে পড়ছে, দেবযানী মন্দিরের সিঁড়ির নীচেই দাঁড়িয়েছিল। ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু এখন সে গেল কই! সুজন পাঁচমিনিটের জন্য একটু চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই কি সে একা একা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে না কি! এ বেলায় আর ভয় লাগল না!

এক অসহনীয় রাগে মস্তিষ্কের প্রতিটি কোনা উত্তপ্ত হয়ে উঠল সুজনের। এরা পেয়েছেটা কী! শুরু থেকেই দেখছে এই ভানগড়ের অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে দেবযানী ও সুরেশ—দুজনেরই সমান অ্যালার্জি! ভানগড়ে এসে ঐ ইডিয়ট অতুল আর স্টুপিড দীননাথের উলটোপালটা গল্প শুনে দুজনেরই মাথা গেছে! একজন দিনদুপুরে ভুলভাল দেখছে, অন্যজন কথায় কথায় ভয় পাচ্ছে। এদের দিয়ে কাজ হয়? ড্যাম ইট!

সে মন্দিরের ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে ডাকল, 'দেবযানী, অনেক হয়েছে। এখানে আয় বলছি।'

boierpathshala.blogspot.com

কথাগুলো যথারীতি মন্দিরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু কোনো উত্তর এল না।

তার চোয়াল শক্ত হল। নির্ঘাৎ সুরেশ আবার ফিরে এসে দেবযানীকে নিয়ে গোটা ফোর্ট 'এক্সপ্লোর' করতে গিয়েছে! এর আগেও অন্য একটি দুর্গে অবিকল এমনই ঘটেছিল। এসব দুর্গে মোবাইল কাজ করে না কারণ টাওয়ার নেই। যোগাযোগ করার উপায়ও নেই। ওরা কিছুতেই বুঝবে না যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত সুজনের কাছে মূল্যবান। এটা ওদের পেশা, রুজি-রুটি ; ফাজলামি নয়!

কিন্তু পরক্ষণেই দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল সুজনের মুখে। ওরা কি সত্যিই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে? কোনোরকম বিপদ হয়নি তো? দুর্গের অলৌকিক বা ভৌতিক ইতিহাসে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নেই তার। তবে বন্যপ্রাণীকে ভয় আছে। তেমন কিছু অঘটন...!

ভাবতে ভাবতেই মাথা নাড়ল সে। নাঃ, তেমন কিছু হলে দেবযানীর ভয়ার্ত চিৎকার নিশ্চয়ই কানে আসত তার। কিংবা সুরেশের গলা পেত। অথচ তেমন কোনো শব্দই পায়নি! তার মানে দুটোই সম্ভাবনা রয়েছে। হয় সুরেশ এসে দেবযানীকে নিয়ে 'এক্সপ্লোর' করতে গিয়েছে, নয়তো দুটো ভীতুর ডিমই ষড়যন্ত্র করে তাকে একলা রেখে পালিয়েছে। সুজন হতাশা-জনকভাবে মাথা ঝাঁকায়। এর অর্থ, আজ রাতে তাকে একাই কাজ করতে হবে! সুরেশ আর দেবযানী ফিরে এলে ভালো, নয়তো কাল সকালে ওদের দেখে নেবে!

সে বিড়বিড় করে বলল, 'ওয়ার্থলেস পাবলিক পাবলিক!' তারপর ফের ধীরপায়ে হাঁটা দিল মূল গর্ভগৃহের দিকে। তার হাতের এমার্জেন্সির আলো একঝলক পিছলে পড়েছিল মন্দিরের প্রধান স্তম্ভের গায়ে। সেদিকে তাকিয়েই একটু যেন বিস্মিত হল সুজন। আরে! এই নৃত্যরতা যক্ষিণীমূর্তিটা ভাঙা ছিল না? যতদূর মনে পড়ছে, কালকেই এই মূর্তিটা ভালো করে দেখেছিল ওরা। তখন সুন্দরীর মাথা আর দুটি হাত ভাঙা ছিল। অথচ এখন একদম অক্ষত, নতুন ভাস্কর্যের মতো চকচক করছে। যেন রাতারাতিই কেউ মেরামত করে দিয়েছে। এত তাড়াতাড়ি কী করে মেরামত হয়ে গেল মূর্তিটা! কে-ই বা করল!

সুজন একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। যক্ষিণীমূর্তিটা কি আদৌ এরকম ছিল? কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছে না? মাথার চুল চুড়ো চুড়ো করে বাঁধা, মুখের সুডৌল গড়নটাও যেন বড় পরিচিত। এরকম মূর্তি আগে কোথাও দেখেছে কি?

'সু-জ-ন!'

পাথরের ভেতর থেকে ভেসে এল পরিচিত কণ্ঠের বুকফাটা হাহাকার! ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে গিয়ে সুজন লাফিয়ে দু-কদম পিছিয়ে গেল। কী হচ্ছে! এসব কী হচ্ছে! আওয়াজটা কোথা থেকে এল! এই স্তম্ভের ভেতর থেকে কি! ইমপসিবল! অসম্ভব!

সুজনের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে! এইমাত্র যা শুনল তা কি সত্যি? না কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছে! এক অদ্ভুত সন্দেহ তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে এল! অব্যক্ত এক আশঙ্কায় সে এমার্জেন্সি লাইটটার আলো ফেলেছে নৃত্যরতা যক্ষিণীর দিকে। আর যক্ষিণীর মুখ স্পষ্ট হতেই যেন কয়েকহাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক ছ্যাঁকা খেল সুজন! এ তো অবিকল দেবযানীর মূর্তি! নিঃসন্দেহে সে—ই! সেই টপনট, সেই মুখের আদল, এমনকি চিবুকের কাটা দাগটাও হুবহু এক! দেবযানী!

'সুজন!'

boierpathshala.blogspot.com

পাথরের ভেতর থেকে ভেসে এল দেবযানীর কান্না—'আমায় এখান থেকে বের কর! আমার ভয় করছে...!'

'দেবযানী!' সুজন ব্যাকুলভাবে যক্ষিণীমূর্তির ওপর হাত রাখল, 'কোথায় তুই! অ্যাঁ?'

'আমি জানি না।' কান্নাবিকৃত কণ্ঠে জবাব এল—'এখানে ভীষণ অন্ধকার!'

সুজন কী করবে বুঝে পায় না! দেবযানী কোথায় আছে, মূর্তিটা তার মতো দেখতে কী করে হল, কিংবা স্তম্ভের মধ্য থেকে তার কণ্ঠস্বর কীভাবে ভেসে আসছে তা সমস্ত যুক্তি ও বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম সে 'আতঙ্ক' কাকে বলে তা টের পেল! সুজনের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে। সে বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে সেই যক্ষিণীমূর্তির দিকে।

'আমি আগেই বলেছিলাম স্যার, এ মন্দিরগুলো জীবিত! বলেছিলাম, এ পাথরে প্রাণ আছে। আপনারা শোনেননি।'

সারা মন্দির কাঁপিয়ে ভেসে এল শব্দগুলো। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা চিনতে ভুল হল না সুজনের। অতুল!

সে অসহ্য রাগে, ভীষণ অসহায়তায় হিসহিস করে বলল, 'তাহলে এসব তোমার ষড়যন্ত্র! কোথায় রেখেছ দেবযানীকে?'

কণ্ঠস্বর হেসে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'দেবযানীকে যেখানে দেখছেন, ও সেখানেই আছে। এবং চিরদিন সেখানেই থাকবে।'

'বাজে কথা।' সুজন গর্জন করে ওঠে, 'এসব লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের কারিকুরি। নির্ঘাৎ কোনো সাউন্ডবক্স বসানো আছে আশেপাশেই। সব তোমার চক্রান্ত!'

অতুল আবার সজোরে হেসে ওঠে, 'এই ভাঙা দুর্গে কষ্ট করে কে আর লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো করবে স্যার! আর দিনের বেলা আপনি গোটা দুর্গ, গোটা মন্দির দেখেছেন। কোথাও এমনকিছু আপনার চোখে পড়েছে কি?'

সুজন এবার আলো ফেলে গোটা মন্দিরটা দেখে নেয়। কোথা থেকে আসছে এই কণ্ঠস্বর! অতুল কোথা থেকে কথা বলছে? দেবযানীর কান্না এখন আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু এবার অবাক হয়ে আবিষ্কার করল সে, অতুলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে মন্দিরের পাথুরে দেওয়াল থেকে!

'আপনি আমাকে বোধহয় চিনতে পারেননি!' অতুল গম্ভীরভাবে বলল, 'কিন্তু মিঃ ও' কোনর আমাদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। মনে আছে?'

মস্তিষ্কের ভেতরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল সুজনের। এবার পরিষ্কার মনে পড়ল মুহূর্তটা! হ্যাঁ; তাই তো! অতুল মিঃ ও' কোনরের অফিসেই বসেছিল। জেমস ওদের দুজনের আলাপও করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ও হচ্ছে অতুল মেহতা। এখনও পর্যন্ত ওর আনা মূর্তিই নিলামে হায়েস্ট রেট এনেছে। ওর স্টাইলই হচ্ছে বিপজ্জনক জায়গা থেকে মূর্তি তোলা! মেইনলি হন্টেড হাউস অ্যান্ড দ্য ফোর্টস! এমনকী ও পুতুলবাড়ি থেকেও একটা স্কাল্পচার নিয়ে এসেছে! ক্যান ইউ বিলিভ ইট?'

মনে পড়ছে। একদম স্পষ্ট মনে পড়ছে! কিন্তু তখন অতুল যেন একটু অন্যরকম দেখতে ছিল। হ্যাঁ! ওর চোখ দুটো! ওর চোখ দুটো এমন ভয়াবহ ছিল না! বরং

boierpathshala.blogspot.com

স্বাভাবিক গাঢ় বাদামি রঙের চোখ ছিল। কিন্তু এখন তো পিঙ্গল! অবিকল এই মন্দিরের পাথরের মতো...!

'আমি আপনাকে সাবধান করেছিলাম স্যার!'

দেওয়াল থেকে ভেসে এল কথাগুলো, 'বারবার সতর্ক করেছিলাম! আপনারা শুনলেন না!'

'তার মানে তোমাকেও ভানগড়ের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন মিঃ ও' কোনর!' বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল সুজন, 'তুমিও একজন ভ্যান্ডাল!'

'হ্যাঁ'। কণ্ঠস্বর উত্তর দিল, 'যেদিন আপনি অ্যাসাইনমেন্টটা পেয়েছিলেন, তার পনেরো দিন আগে আমিও...!'

'ও!' তার কথা শেষ হওয়ার আগেই উত্তেজিতভাবে বলে উঠল সে, 'তার মানে তুমি আমাদের এভাবে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাও! মিঃ ও' কোনরের অফারের চেয়েও বড় টাকার অফার পেয়েছ, তাই না?'

দেওয়াল বেয়ে একটা জোরালো দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর শোনা গেল একটাই শব্দ, 'না!'

'ড্যাম লায়ার!' উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল সুজন, 'তুমি কীভাবে এসব ট্রিক করছ জানি না! কিন্তু এভাবে আমায় ভয় দেখানো যাবে না! রত্নাবতীর মূর্তি আমিই এখান থেকে নিয়ে যাব! যেভাবেই হোক, নিয়েই ছাড়ব! কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তুমিও না!'

কণ্ঠস্বর নিরুত্তর! দেওয়াল থেকে আর কোনো প্রত্যুত্তর ভেসে এল না। সুজন আর উত্তরের অপেক্ষাও করল না। তার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গিয়েছে। চুলোয় যাক দেবযানী, গোল্লায় যাক সুরেশ। সে কারোর পরোয়া করে না! একজন মূর্তিচোর বা ভ্যান্ডালের কোনো আত্মীয় নেই। কোনো বন্ধু নেই! তার বন্ধুত্ব একমাত্র টাকার সঙ্গে! তার একমাত্র আত্মীয় মোটা অঙ্কের চেক। আর কেউ নয়!

সে নিজের ব্যাকপ্যাক নিয়ে দৌড়ে গেল মূল গর্ভগৃহে। এমার্জেন্সি লাইটটাকে মেঝেতে রেখে দ্রুত হাতে বের করতে শুরু করল ভ্যান্ডালস টুলস! সচরাচর কোনো মূর্তি কাটার আগে সযত্নে সেটাকে ব্রাশ দিয়ে মুছে নিতে হয়। তারপর মেজারিং টেপ দিয়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে নিয়ে মার্কার দিয়ে আউটলাইন এঁকে নেওয়া জরুরি। কিন্তু এতদিনের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত পদ্ধতি ভুলে গেল সুজন। কথা নেই বার্তা নেই, পাগলের মতো ছেনি বসিয়েই হাতুড়ির এক জোরালো ঘা মেরে দিল।

মন্দিরের দেওয়াল থেকে একটুকরো পাথর ভেঙে ছিটকে পড়ল তার সেই ভীষণ আঘাতে! সুজন টের পেল, তার হাত কাঁপছে। তবু সে নিজের জেদে অনড়। পাগলের মতো হাতুড়ির বাড়ি মেরেই যাচ্ছে। ঘা-এর পর ঘা! যেন পণ করেছে, যতক্ষণ না মূর্তিটা খুলে বেরিয়ে আসছে, ততক্ষণ হাল ছাড়বে না! আঘাতে আঘাতে মূর্তিটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে! চলটা উঠে যাচ্ছে। তবু থামছে না সুজন! আজ হয় এই মূর্তি ধ্বংস হবে, নয়তো এটাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবে সে। এসপার কী ওসপার!

হঠাৎ যেন এমার্জেন্সিটা অলৌকিকভাবে একটু সরে গেল! অথবা তার সোজা আলো কীভাবে যেন বক্ররেখায় গিয়ে পড়ল রাজকন্যা রত্নাবতীর মূর্তির মুখে! জোরালো আলোয়

boierpathshala.blogspot.com

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভাস্কর্যের মুখ! সেদিকে চোখ পড়া মাত্রই ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে সুজন। তার হাত থেকে নিমেষে পড়ে যায় ছেনি ও হাতুড়ি!

এই সুন্দরীর দেহে এ কার মুখ! এই মুখ পরমাসুন্দরী রাজকন্যা রত্নাবতীর হতেই পারে না! আদতে এ কোনো নারীর মুখই নয়! এ এক পুরুষের মুখ! কোটরাগত চোখে পিঙ্গল আভা, চোয়াড়ে মুখ! নাকটা যেন আধখানা বসে গিয়েছে! এই মুখের মালিক তার পরিচিত! এই মূর্তির মুখ হুবহু অতুলের মতো!

ঠিক তখনই দপ করে নিভে গেল এমার্জেন্সিটা! অন্ধকার গর্ভগৃহ কাঁপিয়ে খলখলিয়ে হেসে উঠল এক নারী! তার হাসির দমকে লাস্য আছে। তার চেয়েও বেশি আছে নিষ্ঠুরতা!

এ সেই হাসি যা এক অন্ধকার রাত্রে ইথান ওলসেন শুনেছিলেন! নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর!

৯

ভানগড় ফোর্টের মূল প্রবেশপথে দাঁড়িয়েছিল দুই যুবক। সূর্যের প্রখর রশ্মিতে ভানগড় ফোর্টের ধ্বংসস্তূপ দেখে বেড়াচ্ছে কৌতূহলী পর্যটকেরা। যুবক দুটি একটু সন্তর্পণে মেপে নেয় চারদিক। সতর্কতা তাদের চোখের চাউনিতেই স্পষ্ট। ইতিউতি তাকিয়ে কিছু যেন খুঁজছে! সম্ভবত গাইডের সন্ধানে আছে।

একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল একটি একলা মানুষ। তার দৃষ্টিও যুবক দুটির ওপরেই নিবদ্ধ। একটু ইতস্তত করে অবশেষে সে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। ইংরেজিতে জানতে চাইল, 'আপনারা কি গাইড খুঁজছেন?'

যুবকেরা তাকে একটু বিস্মিতদৃষ্টিতে দেখল। মানুষটাকে কী অদ্ভুত দেখতে! আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু ওর চোখ দুটো অদ্ভুত! পিঙ্গল কটা চোখ, নিষ্পলক দৃষ্টি! মানুষটি হাসছে ঠিকই, কিন্তু তার চোখে সে হাসির আভাসমাত্রও নেই। যেন ওর চোখ দুটো পাথরের তৈরি!

একজন যুবক একটু আমতা আমতা করে বলল, 'হ্যাঁ। গাইডই খুঁজছি। আপনি?'

মানুষটি আবার রহস্যময় হাসল। মাছের মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমি সুজন। আপনাদের গাইড।'

সমাপ্ত

boierpathshala.blogspot.com